Contents

খৃষ্টধর্মের স্বরূপ

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দামাত বারাকাতুহুম

খৃষ্টধর্মের স্বরূপ

মূল ঃ শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

অনুবাদ ঃ মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

প্রকাশক

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

মাকতাবাতুল আশরাফ

[অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-৫

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

প্রকাশকাল

জিলহজ্ব ১৪৩২ হিজরী

নভেম্বর ২০১১ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায

গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স

(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)

৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN :978-984-8950-10-4

মূল্য ঃ একশত বিশ টাকা মাত্র

KHRISHTODHORMER SORUP

By: Shaikhul Islam Mufti Muhammad Taqi Usmani

Translated by: Mawlana Abul Bashar Muhammad Saiful Islam

Price: Tk. 120.00 US$ 6.00

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকাশকের কথা

কুরআন নাযিল হওয়ার পর পূর্ববর্তি সকল আসমানী কিতাব রহিত হয়ে গেছে। এখন কেবলমাত্র কুরআনের বিধানই অনুসরণীয়, অন্য কোন বিধান অবশ্য পালনীয় নয়। তদ্রূপ আল্লাহপাক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুয়ত দান করে, ইসলামকে পূর্ণতা দান করেছেন, ইসলামকেই একমাত্র জীবনবিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন। ফলে পূর্ববর্তী সকল ঐশী ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং এখন যদি কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মকে ধর্ম হিসেবে অনুসরণ করে তাহলে আল্লাহপাক তা গ্রহণ করবেন না। আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই তার জীবন ব্যর্থ হবে।

একজন মানুষের ঈমানদার হওয়ার জন্য যেরূপ ইসলামের সকল বিশ্বাস্য বিষয় তথা ঈমান-আকীদার সবকিছু অন্তরের অন্তস্থল থেকে মেনে নিতে হয়, মুখে তা স্বীকার করতে হয় এবং ঈমানের দাবী অনুযায়ী আমল করতে হয়, তদ্রূপ প্রচলিত-অপ্রচলিত অন্য সকল ধর্মকেই বাতিল বলে মনে করতে হয়। সুতরাং একজন ঈমানদারের জন্য ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মকে ইসলামের বর্তমানে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম বলে স্বীকার করার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে আমাদের সমাজের অনেকেই অতি উদারতা দেখাতে গিয়ে একথা দিব্যি ভুলে যান। ফলে এমন মারাত্মক ঈমান বিধ্বংসী আচরণ ও উচ্চারণ তাদের থেকে প্রকাশ পায় যে, তাতে আর যাই হোক ঈমান আর অক্ষুন্ন থাকে না। এ পরিস্থিতিতে তাদের অবস্থা জানিয়ে যখন উলামায়ে কেরামের নিকট মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তাঁরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ঈমান বিধ্বংসী আচরণ ও উচ্চারণের ফলে ঈমানহারা হওয়ার কথা বললে আরেক শ্রেণীর অপরিনামদর্শী অতি দরদী উলামায়ে কেরামের প্রতি বিষোদগার করে বলতে থাকে আলেমদের কাজই হলো মুসলমানকে কাফের বানানো।

এদিকে লক্ষ করেই হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেছেন, 'উলামায়ে কেরাম কাউকে কাফের বানান না, বরং তাঁরা কাফের বাতান।' অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজ আচরণ বা উচ্চারণের ফলে নিজেই কাফের হয়ে গেছেন। উলামায়ে কেরাম শরয়ী দলীলের ভিত্তিতে তার অবস্থান ব্যাখ্যা করেন মাত্র।

বর্তমান পৃথিবীতে কোন ঐশী ধর্মই অবিকৃত থাকেনি। সকল ধর্মকেই বিকৃত করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি বিকৃতির শিকার হয়েছে খৃষ্টধর্ম। কারণ এ ধর্মের যারা চরম বিরোধী ছিলো, যারা এ ধর্মকে সমূলে ধ্বংস করতে চেয়েছিল তারাই এক সময় দাবী করে বসলো তারাই এ ধর্মের প্রকৃত অনুসারী ও ব্যাখ্যাতা। তাদের ব্যাখ্যা যদিও হযরত ঈসা আ.-এর আনিত দ্বীনের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলো। হযরত ঈসা আ. কখনো তাওহীদ পরিপন্থী ত্রিত্ববাদের প্রবক্তা ছিলেন না। প্রথম প্রথম এই বিপরীতপন্থী লোকেরা বিপুল বাধার সম্মুখীন হলেও পরবর্তীতে তাদের বিপরীত ও বিকৃত মতই খৃষ্টধর্মরূপে প্রচার লাভ করে।

এ কথাটিই খৃষ্টধর্মের পণ্ডিতদের রচনা থেকে সুন্দর গোছালোভাবে উপস্থাপন করেছেন এ যুগের বিখ্যাত আলেমে দ্বীন উস্তাযে মুহাতারাম শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম। তাঁর সে ঐতিহাসিক কীর্তি 'ঈসাইয়্যাত ক্যায়া হ্যায়' শীর্ষক বইখানি পাঠক সমাজে বিপুল সমাদৃত। এ জটিল ও কঠিন গ্রন্থটির সহজ-সাবলীল, ঝরঝরে অনুবাদ করেছেন এ সময়ের সেরা কলম সৈনিক শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম। আল্লাহপাক উম্মতের দ্বীনী খেদমতের জন্য তাঁকে হায়াতে তাইয়্যেবা দান করুন, সুস্থতার সাথে তাঁকে দীর্ঘদিন জীবিত রাখুন এবং এ ধরনের প্রয়োজনীয় দ্বীনী গ্রন্থ জাতিকে উপহার দেয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আমরা আমাদের সাধ্যমত বইটিকে সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি, তারপরও যদি কারো দৃষ্টিতে কোন ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবগত করার অনুরোধ করছি, যাতে পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধন করা যায়। আল্লাহপাক বইটিকে কবুল করে লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও পাঠক সবার জন্য নাজাতের উসীলা বানান। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

তারিখ
২২ যিলহজ্জ ১৪৩২ হিজরী
মোতাবেক ১৯ নভেম্বর ২০১১ ঈসায়ী

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
১৩৬, আজীমপুর, ঢাকা-১২০৫

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

প্রচলিত খৃষ্টবাদ কী? কে এর প্রকৃত জনক? মহান পয়গম্বর হযরত ঈসা মাসীহ আলাইহিস-সালাম কি এ ধর্মই প্রচার করেছিলেন? বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রত্যেক সচেতন মুসলিমের এসব প্রশ্নের উত্তর জানা জরুরি। কেননা আরও অনেক গরীব মুসলিম রাষ্ট্রের মত আমাদের এ প্রিয় মাতৃভূমিও আজ খৃষ্টান মিশনারীদের বহুমুখী তৎপরতার শিকার। বিভিন্ন রকমের এনজিও'র ছদ্মাবরণে তারা বহুদিন থেকেই এদেশে মূলত তথাকথিত খৃষ্টধর্মের প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে এবং সে তৎপরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতোমধ্যে তাদের কথিত সেবার ফাঁদে পড়ে কত লোক যে ঈমানহারা হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। এ রকম নবদিক্ষীত খৃষ্টানদের নিয়ে তারা বিভিন্ন স্থানে বড় বড় খৃষ্টান পাড়া গড়ে তুলেছে, যা কোথাও কোথাও ঠিক দুর্গের মত সুরক্ষিত। সেসব দুর্গের ভেতর তারা কোন নীলনকশা বাস্তবায়নের কী গোপন প্রস্তুতি গ্রহণ করছে, সচেতন মহলের সেদিকে দৃষ্টি দেয়া দরকার। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় এবং বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশও বটে যে, তাদের নীলনকশা অতি সুদুরপ্রসারী। মুসলিম অধ্যুষিত এ জনপদকে তারা একটি খৃষ্টান রাষ্ট্রে পরিণত করার পরিকল্পনা নিয়েই মাঠে নেমেছে। তাদের এ তৎপরতা আমাদেরকে ইংরেজ দুঃশাসন-পূর্ব ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী আমলের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সুতরাং আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব আজ অতি বড় হুমকির সম্মুখীন। সচেতন আলেম সমাজ বহুদিন থেকেই এ বিষয়ে নিজেদের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছেন। আম-জনতাকে তো বটেই, এ যাবৎকালের সকল ক্ষমতাসীন মহলকেও তাঁরা বার বার সতর্ক করেছেন। তাঁদের উদ্বিগ্ন হওয়ার আরও বড় কারণ হল আখিরাতের মুক্তির প্রশ্ন। আখিরাতে মুক্তি কেবল ইসলামের অনুসরণের মধ্যেই নিহিত। ইসলামই আল্লাহ তা'আলার কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯)। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন তাঁর

কাছে গ্রহণযোগ্য নয় (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৮৫)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এসে গেছেন, তাঁর শরীআত যখন প্রচার হয়ে গেছে, তখন আর ইহুদীধর্ম, খৃষ্টধর্ম, কোন ধর্মই চলবার নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট ঘোষণা- 'মূসা যদি আজ জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর গত্যান্তর ছিল না'।

সুতরাং প্রচলিত খৃষ্টবাদ যদি বাস্তবিকপক্ষেও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রচারিত আসল ধর্ম হত, তবুও তো শেষনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর তা প্রচার করার কোন বৈধতা থাকত না। সেখানে খৃষ্টান মিশনারীরা বিশ্বব্যাপী এমনই এক ধর্মের ফেরি করে বেড়াচ্ছে, যা আদৌ হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের রেখে যাওয়া ধর্ম নয়; বরং এর সবটাই পৌলের মস্তিস্কপ্রসূত এক অভিনব মতবাদ। মহামতি মাসীহ আলাইহিস সালামের শিক্ষার সাথে এর বিন্দু-বিসর্গ সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক যে বিলকুল নেই, সে কথা এখন প্রত্যেক ঈমানদার মুসলিমের জানা দরকার ও প্রচার করা দরকার, যাতে পৌলবাদী ফড়িয়ার দল অন্তত হযরত যিশুখৃষ্ট আলাইহিস সালামের নাম ভাঙিয়ে আর কোন মুমিনের ঈমান হরণ করতে না পারে।

বিশ্ববরেণ্য ইসলামী মনীষী হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী - আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সিহ্হাত ও আফিয়াতের সাথে দীর্ঘজীবী করুন - কিভাবে খৃষ্টধর্ম পৌলবাদে রূপান্তরিত হল, 'ঈসাইয়্যাত কিয়া হ্যায়' শীর্ষক রচনায় সে আখ্যানই তুলে ধরেছেন। পুস্তকখানি তাঁর বিস্তর পড়াশোনার নির্যাস। সারা বিশ্বের মিশনারী-আক্রান্ত অঞ্চলসমুহের জন্য বইখানি খুবই উপযোগী। তথাকথিত খৃষ্টবাদ যে কত অসাড় ধর্ম, এ বই পড়লে সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বইখানি খুব বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। তাই আমার কোন কোন বন্ধু, বিশেষত মুহাক্কিক আলেম ও যশস্বী মুহাদ্দিছ শায়খ আব্দুল মতীন সাহেব বইখানি বাংলায় অনুবাদ করার জন্য আমাকে উৎসাহিত করেন; বরং জোর তাগিদ দেন। সেই সঙ্গে উলামা সমাজের গৌরব হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেবও কাজটি করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিবেচনায় আমি তাতে আগ্রহের সাথেই সাড়া দেই। উভয় হযরতই এ কাজে আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতাও করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে জাযায়ে খায়র দান করুন। মাকতাবাতুল আশরাফ-এর স্বত্বাধিকারী মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান বইটির প্রকাশনার

দায়িত্ব নিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে দীনের খাদেম হিসেবে কবূল করে নিন।

উল্লেখ্য বেশ ক'বছর আগে আমার প্রিয় ছাত্র মাওলানা আব্দুল মজীদ বইখানির বাংলা অনুবাদ করেছিল। ছাত্রজীবনে করা তার সে অনুবাদের একটি কপি আমাকে হাদিয়াও দিয়েছিল। তাই পুণঃঅনুবাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে আমার খানিকটা সময় লেগেছিল এবং সত্য বলতে কি আমি একটু কুণ্ঠাও বোধ করছিলাম। কিন্তু আলোচনা-পর্যালোচনায় যে বিষয়টি সামনে উঠে এসেছে তা হল, কোন উপকারী গ্রন্থের একাধিক অনুবাদ দূষণীয় নয়। পূর্বে এর বহু দৃষ্টান্ত আছে। বস্তুত উপকারী গ্রন্থের বহু অনুবাদ দ্বারা সে গ্রন্থের উপকারিতা অধিকতর বিস্তার লাভ করে এবং তা দ্বারা প্রথমে কৃত অনুবাদের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় না। তাছাড়া কোনও কাজ যেজন আগে করে, তার সে অগ্রগামিতার মহিমা তো একান্তই তার। তা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। এসব বিবেচনার পর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় বইখানির অনুবাদে হাত দেই, যা এখন পাঠকের হাতে পৌঁছার অপেক্ষায়। আল্লাহ তা'আলা আমার প্রিয় ছাত্রের কলমে শক্তি দান করুন ও তাঁর কলমকে 'পুর-নূর' করে দিন। সেই সঙ্গে আমার এ প্রচেষ্টাকে উম্মতে মুসলিমার ঈমান হেফাজতের অছিলা বানিয়ে দিন এবং একে আমার ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাতের উপায় হিসেবে কবুল করে নিন - আমীন।

বিনীত
আবুল বাশার
২৩.১০.৩২ হিঃ

পূর্ব কথা

আম লোকজনকে খ্রিস্টধর্মের ভ্রান্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য যেমন সংক্ষিপ্ত ও সহজ বই-পুস্তকের প্রয়োজন আছে, তেমনি শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে এ ধর্মের প্রমাণসিদ্ধ তত্ত্বাবলী সরবরাহ করার জন্য গবেষণামূলক ও তথ্যসমৃদ্ধ রচনাবলী প্রকাশ করাও অতীব জরুরী। বিশেষত যারা বক্তৃতা ও লেখার মাধ্যমে খ্রিস্টানদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করবে তাদের তো আগেই খ্রিস্টবাদের আসল চেহারা পুরোপুরি চিনে নিতে হবে। অন্যথায় অপূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে যে কাজ করা হবে, তা উল্টো ফল সৃষ্টিরও কারণ হতে পারে এবং অনেক সময় তা হয়ও বৈকি!

এ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য হযরত মাওলানা রহমাতুল্লাহ কীরানবী (রহ.) রচিত 'ইজহারুল হক' গ্রন্থখানি খুবই উপযোগী। তাই অধম বান্দার নিজ তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনীর সাথে গ্রন্থখানির উর্দূ তরজমা করা হয়েছে, যা দারুল উলূমের প্রকাশনা বিভাগ তিন খণ্ডে প্রকাশ করেছে। প্রিয়পুত্র মওলবী তাকী উসমানী (সাল্লামাহুল্লাহু তাআলা) টীকা-টিপ্পনী ছাড়াও গ্রন্থখানির একটি বিশদ ভূমিকা লিখেছিল। মানুষ যাতে ব্যাপকভাবে উপকৃত হতে পারে সেই বিবেচনায় ভূমিকাটিকে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করা যাচ্ছে।

বাস্তবিকপক্ষে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ, তথ্যবহুল ও অসামান্য রচনা। এতে খোদ খ্রিস্টানদেরই প্রাচীন ও আধুনিক রচনাবলীর সাহায্যে খ্রিস্টবাদের স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত ইংরেজি ভাষায় রচিত বই-পুস্তকেই বেশি ছিল। আল্লাহ তাআলা প্রিয় পুত্রকে দ্বীনী ইলমে ব্যুৎপত্তির পাশাপাশি ইংরেজী ভাষা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানেও বিশেষ যোগ্যতা দান করেছেন। এম. এ, এল. এল. বি-এর পরীক্ষাসমূহে সে কৃতিত্বপূর্ণ ডিগ্রী অর্জন করেছে। কাজেই এ রচনায় সে এ সংক্রান্ত ইংরেজি রচনাবলীর বিশেষ সাহায্য নিতে পেরেছে। ইনশা আল্লাহ প্রচলিত খ্রিস্টবাদ সম্পর্কে বইখানি একটি স্বচ্ছ দর্পণের কাজ দেবে। এ রচনা যেমন সারগর্ভ, তেমনি ন্যায়নিষ্ঠও বটে। এটি পড়লে খ্রিস্টধর্ম সংক্রান্ত প্রমাণসিদ্ধ, জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী সুবিন্যস্ত ও শৃঙ্খলিতভাবে জানা যাবে।

খ্রিস্টধর্ম বোঝার পক্ষে এ পুস্তকটি যে কতখানি সহায়ক– একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা তা পরিষ্কার করা যেতে পারে। এ ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে কাফফারা বা

'প্রায়শ্চিত্ত'-এর বিশ্বাসের উপর। কিন্তু এ বিশ্বাসের যে ধারণা সাধারণ্যে প্রচলিত, তা বাস্তবভিত্তিক নয়। ফলে একদিকে এক শ্রেণীর খ্রিস্টান পাদ্রী এ বিশ্বাসকে এক সস্তা প্রেসক্রিপশন বানিয়ে সরলমতি মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পাচ্ছে, অন্যদিকে এ বিশ্বাসটির যেসব সমালোচনা করা হয়ে থাকে, প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে অনবহিত থাকার কারণে তা ফলদায়ক হয় না এবং তা সত্যের যথাযথ প্রতিনিধিত্বও করতে পারে না।

এ পুস্তকে পটভূমিসহ 'কাফফারা' সংক্রান্ত আকীদাটির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে অতঃপর এর সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ ও বলিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পুস্তকটির দ্বিতীয় অধ্যায় সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যা খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে মীমাংসকের মর্যাদা রাখে। এতে খোদ খ্রিস্টান পণ্ডিতবর্গ ও তাদের রচনাবলীর বরাত দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনার সাথে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে যে, প্রচলিত খ্রিস্টধর্ম কি বাস্তবিকই হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত? যদি তা না হয় এবং নয় তো বটেই, তবে এতে রদবদল ও কাটা-ছেঁড়ার ধারাবাহিকতা কখন থেকে শুরু হয়েছে। কে এটা বিকৃত করে প্রচলিত রূপ দান করেছে? যদিও আরও অনেকেই পৌলকে প্রচলিত খ্রিস্টবাদের আদি রূপকার সাব্যস্ত করেছেন, কিন্তু বিষয়টাকে এ নিবন্ধে যেভাবে প্রমাণ করা হয়েছে, অন্য কারও রচনায় সে রকমটা অন্তত এ অধমের চোখে পড়েনি। এর ছত্রে ছত্রে রয়েছে গভীর অনুসন্ধিৎসা ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের ছাপ। এর দলিল-প্রমাণ অত্যন্ত বলিষ্ঠ। উপস্থাপিত হয়েছে বহু ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ। সেই সঙ্গে আছে খ্রিস্ট সম্প্রদায়েরই বড়-বড় পণ্ডিতের স্বীকারোক্তি।

এ বইয়ের শেষভাগে আছে বার্নাবাসের ইনজীল সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা। এ ইনজীলে পরিষ্কার শব্দে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া এতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং পৌলকে ঈসায়ী দ্বীনের বিকৃতি সাধনকারী সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু সাধারণত খ্রিস্টানগণ একে জাল ইনজীল বলে দাবি করে থাকে। নিবন্ধের এ অংশে শক্তিশালী দলিল-প্রমাণ দ্বারা দেখানো হয়েছে যে, খ্রিস্টানদের অনুসৃত সমীক্ষা-নীতি অনুযায়ী বার্নাবাসের ইনজীলও ততটুকুই বিশ্বস্ত, যতটুকু তাদের প্রসিদ্ধ ইনজীল চতুষ্টয়। পর্যালোচনাটি খুবই মনোজ্ঞ ও তথ্যসমৃদ্ধ।

আমি আশা করি, ইনশাআল্লাহ খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে সত্য-সন্ধানী পাঠককে সঠিক পথ দেখানোর জন্য এ বইটি যথেষ্ট ফলপ্রসূ হবে এবং এর মাধ্যমে মুসলিমদের ঈমান ও বিশ্বাসে উৎকর্ষ সাধিত হবে। আল্লাহ তাআলা এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং এর দ্বারা নিজ বান্দাদের কল্যাণ সাধন করুন– আমীন।

বান্দা মুহাম্মাদ শফী

২২ রবিউল আউয়াল ১৩৯২ হিজরী

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

পাঁচ বছর আগের কথা। হযরত মাওলানা রহমাতুল্লাহ কীরানবী (রহ.) রচিত 'ইজহারুল হক' শীর্ষক গ্রন্থখানির উর্দূ তরজমা যখন অধম বান্দার টীকা-টিপ্পনীসহ 'বাইবেল সে কুরআন তাক' নামে প্রকাশ করা হয়, তখন তার একটি বিশদ ভূমিকা লেখা হয়েছিল। বান্দা তাতে খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে তার দীর্ঘ চার বছরব্যাপী পড়াশুনার নির্যাস তুলে ধরার চেষ্টা করেছিল। ভূমিকাটি উপর্যুক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের শুরুতে মুদ্রিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার ফযল ও করমে আমার সে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা বিজ্ঞ মহলে আশাতীত সমাদর লাভ করেছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সে সম্পর্কে প্রণোদনামূলক সমীক্ষা ছাপা হয়েছে। উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম তার অনুকূলে নিজেদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে অসামান্য সাহস জুগিয়েছেন। গুরুজন ও বন্ধুবর্গের অনেকেরই অভিমত, নিবন্ধটি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করলে মানুষের অনেক বেশি উপকার হবে। সত্য বলতে কি তিন খণ্ডে সমাপ্ত 'বাইবেল সে কুরআন তাক'-এর মত এত বড় গ্রন্থ সকলের জন্য উপযোগীও নয়। প্রত্যেকের পক্ষে এর দ্বারা উপকৃত হওয়া কঠিন ব্যাপার। সুতরাং শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মুহাম্মাদ রাফী উছমানী সাহেব অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন, 'দারুল ইশাআত' থেকে এ নিবন্ধটি স্বতন্ত্র পুস্তকরূপে প্রকাশ করবেন। এই অবকাশে আমি নিবন্ধটির সাদামাঠা সম্পাদনা করে দিয়েছি। কোথাও মামুলি সংশোধনও করেছি। 'বার্নাবাসের ইনজীল' সম্পর্কে এ নগণ্যের একটি পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধও এ পুস্তকের শেষে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যা 'বাইবেল সে কুরআন তাক'-এর তৃতীয় খণ্ডে একটি টীকারূপে মুদ্রিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি সংযোজন করা হয়েছে এ কারণে যে, এ বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এমন কিছু বিষয় আছে, যা এ প্রবন্ধের আলোকে অধিকতর স্পষ্ট হতে পারে।

এই মামুলি সংশোধন ও সংযোজনের সাথে বইখানি এখন আপনার সামনে বর্তমান। আল্লাহ তাআলা এই নগণ্য শ্রমটুকু কবুল করে নিন এবং একে লেখক ও প্রকাশক উভয়ের জন্য আখেরাতের পুঁজি বানিয়ে দিন– আমীন।

উদ্ধৃতি সম্পর্কে তিনটি জ্ঞাতব্য

এক. এ কিতাবে বাইবেলের যে সব উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, তা উর্দূ বাইবেলের সম্পাদিত সংস্করণ থেকে গৃহীত, যা ১৯৫৯ খ্রি. লিও এন্ড ব্রাইডোন প্রিন্টার্স থেকে মুদ্রিত ও পাকিস্তান বাইবেল সোসাইটি লাহোর থেকে প্রকাশিত। [বাংলা অনুবাদে উদ্ধৃতিসমূহ নেওয়া হয়েছে বি. বি. এস (বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি), ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'কিতাবুল মোকাদ্দাস' থেকে]।

দুই. বাইবেলের স্তবকসমূহের উদ্ধৃতিতে প্রথমে পরিচ্ছেদ নং, তারপর আয়াত নং উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন মতি ৭ : ১২। অর্থাৎ মথির ইনজীলের ৭ম পরিচ্ছেদের ১২ শ আয়াত।

তিন. আপনি মাঝে-মধ্যেই এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার উদ্ধৃতি পাবেন। এ বই লেখার সময় আমার সামনে ছিল ১৯৫০ খ্রি. মুদ্রিত সংস্করণ।

সবশেষে বিনীত আরজ, যারা এ বই পড়ে কিছুমাত্রও উপকৃত হবেন, তারা নিজ দুআয় এ নগণ্যকেও যেন স্মরণ রাখেন।

وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ

মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
১২ই রবিউল আউয়াল ১৩৯২ হিজরী
দারুল উলূম করাচি

সূচিপত্র

Contents

দ্বিতীয় অধ্যায়

Contents

খ্রিস্টবাদ কী?

আমি এ বইতে সংক্ষেপে খ্রিস্টধর্মের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ইতিহাস বর্ণনা করব। আমাদের দৃষ্টিতে কোন ধর্মমত সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভের সঠিক পন্থা হল সরাসরি সেই ধর্মাবলম্বীদের শরণাপন্ন হওয়া। কাজেই এ ধর্ম সম্পর্কে খ্রিস্টান ধর্মগুরুগণ কী বলেন, আমরা তা খুঁজে দেখার চেষ্টা করব এবং প্রতিটি কথা তাদেরই বরাতে পেশ করব। সতর্ক থাকব যাতে বিনা বরাতে কোন বিষয়কে খ্রিস্টধর্মের সাথে যুক্ত করা না হয়।

খ্রিস্টধর্মকে বোঝানোই যেহেতু এ রচনার মূল উদ্দেশ্য তাই এতে এ ধর্মের কোন আকীদা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হবে না। 'ইজহারুল হক' গ্রন্থে প্রায় প্রতিটি আকীদারই বিস্তারিত সমালোচনা করা হয়েছে। তবে সে গ্রন্থে সমালোচনা করা হয়নি– এমন কোন বিষয় যখন আসবে তার উপর টীকায় সংক্ষেপে আলোকপাতের চেষ্টা করব।

খ্রিস্টধর্মের পরিচয়

'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'য় খ্রিস্টধর্মের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এ রকম, 'এটা সেই ধর্ম, যা তার মৌলিকত্বকে নাসিরাবাসী 'ইয়াসূ'র' সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে থাকে এবং তাঁকে আল্লাহর মনোনীত (মাসীহ) বলে বিশ্বাস করে (ব্রিটানিকা, CHRISATIANITY, ৫ম খণ্ড, ৬৯৩ পৃষ্ঠা)

খ্রিস্টবাদের এ সংজ্ঞা খুবই অস্পষ্ট। আলফ্রেড এ. গারভে এ সংজ্ঞাটিকেই একটু খুলে বলেছেন, যা দ্বারা বিষয়টা খানিক স্পষ্ট হয়। এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজয়ন এন্ড এথিক্স্-এর 'ক্রিশ্চিয়ানিটি' নিবন্ধে তিনি লেখেন, খ্রিস্টবাদের সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া যেতে পারে যে, এটা এমন এক নৈতিক, ঐতিহাসিক ও একেশ্বরবাদী সার্বজনীন ধর্ম, যা প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করে এবং যাতে প্রভু ইয়াসূ মাসীহের ব্যক্তিত্ব ও কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্ককে পরিপক্ক করে তোলা হয়েছে।

উপরিউক্ত সংজ্ঞা বর্ণনার পর মিস্টার গারভে আলাদাভাবে এর প্রতিটি অংশের ব্যাখ্যা দান করেছেন, যথা–

'নৈতিক ধর্ম' বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, যে ধর্মে ইবাদত-বন্দেগী ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে কোন পার্থিব স্বার্থ চরিতার্থ করার শিক্ষা দেওয়া হয়নি; বরং এ সবের উদ্দেশ্য হবে কেবল আত্মিক উৎকর্ষ লাভ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান।

'ঐতিহাসিক ধর্ম'-এর ব্যাখ্যা করেছেন, এ ধর্মের যাবতীয় চিন্তা ও কর্ম এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। আর তিনি হচ্ছেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম। এ ধর্মে তাঁরই কথা ও কর্মকে চূড়ান্ত অথরিটি মনে করা হয়ে থাকে।

এ ধর্মকে তিনি সার্বজনীন বলেছেন এ অর্থে যে, এ ধর্ম বিশেষ কোন বর্ণ ও গোষ্ঠীর জন্য নয়; বরং এর আহ্বান বিশ্বের সকল মানুষের জন্য।

তিনি খ্রিস্টধর্মকে একেশ্বরবাদী (Montheist) সাব্যস্ত করেছেন এ কারণে যে, এ ধর্মে তিন সত্তা (Persons)-এর অস্তিত্ব মানা সত্ত্বেও আল্লাহকে একই বলা হয়েছে। তিনি লেখেন,

'যদিও খ্রিস্টানদের 'ত্রিত্ববাদ' বা অধিকতর বিশুদ্ধ শব্দে 'ত্রিত্ববাদের ভেতর একত্ববাদ'-এর বিশ্বাস সম্পর্কে সাধারণভাবে মনে করা হয় এবং বলা হয়, তারা বিপজ্জনকভাবে তিন খোদায় বিশ্বাসের একদম কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, কিন্তু আপন সত্তাসারের দিক থেকে খ্রিস্টবাদ অবশ্যই একেশ্বরবাদী এবং এ ধর্ম চার্চীয় বিশ্বাস হিসেবে খোদাকে একই মনে করে।'

উপরে বর্ণিত সংজ্ঞায় খ্রিস্টবাদের শেষ বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে, এ ধর্ম 'প্রায়শ্চিত্ত' –এ বিশ্বাস পোষণ করে। এর ব্যাখ্যায় গারভে বলেন,

'আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে যে সম্পর্ক থাকা উচিত, খ্রিস্টবাদের ধারণা অনুযায়ী সে সম্পর্ক মানুষের পাপের কারণে ত্রুটিপূর্ণ হয়ে গেছে। ফলে সে সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা জরুরি। আর এ কাজ কেবল মাসীহকে মাঝখানে রাখার দ্বারাই সম্ভব।'[১]

এই হল খ্রিস্টধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন ধর্মের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ না সে ধর্মের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা লাভ হবে। সুতরাং এখন এক-একটি করে আমরা এ ধর্মের মৌল আকীদার ব্যাখ্যা দান করব।

খ্রিস্টধর্মে 'আল্লাহ'-এর ধারণা

আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের যে বিষয়টা, সে সম্পর্কে খ্রিস্টধর্মের ধারণা অন্যান্য ধর্ম থেকে ভিন্ন নয়। অন্যান্য ধর্মে যেমন বর্ণিত হয়ে থাকে, এ ধর্মও

---

১. এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজয়ন এন্ড এথিক্স, ৩য় খণ্ড, ৫৮১ পৃষ্ঠা নিবন্ধ Christianity

আল্লাহ তাআলাকে সেই সব গুণাবলীর সাথেই স্বীকার করে থাকে। মরিস রিলটন লেখেন,

আল্লাহ সম্পর্কে খ্রিস্টবাদের ধারণা হল– তিনি এক ও চিরঞ্জীব সত্তা। সম্ভাব্য সকল উৎকৃষ্ট গুণের অধিকারী। তাকে অনুভব করা যায় বটে, কিন্তু পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায় না। সুতরাং তাঁর স্বরূপ সম্পর্কে যথাযথ বিশ্লেষণ দান আমাদের ধী-শক্তির অতীত। তাঁর স্বরূপ যে কী তা আমরা জানি না। তিনি নিজে ওহী মারফত মানুষকে যতটুকু জানিয়েছেন আমরা কেবল ততটুকুই জানতে পারি।[১]

ত্রিত্ববাদ ঃ আল্লাহ সম্পর্কে যে ধারণা উপরে বর্ণিত হল, এ পর্যন্ত তো কথা পরিষ্কার। কিন্তু এরপর এ ধর্ম আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণার যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন, তা বড় ঘোলাটে। তা বুঝে ওঠা সহজ নয়। সাধারণ-বিশিষ্ট সকলেরই জানা যে, খ্রিস্টধর্মে আল্লাহ হলেন তিন সত্তা (Persons)-এর সমষ্টি– পিতা, পুত্র ও রূহুল কুদ্‌স (পাক রূহ)। এ বিশ্বাসকেই ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস (Trinitarian Doctrine) বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এ বিশ্বাসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে খ্রিস্টান ধর্মগুরুদের বক্তব্যসমূহ এতটাই পরস্পর-বিরোধী ও বিপ্রতীপ যে, তা থেকে নিশ্চিতভাবে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুরূহ। এমনকি যে ত্রয়ের সমষ্টিকে খোদা বলা হয়, তারা কে কে, এ ব্যাপারেও মতভিন্নতা আছে। কেউ বলেন, খোদা হলেন পিতা, পুত্র ও রূহুল কুদ্‌স –এই তিনের সমষ্টি।[২]

কেউ বলেন, পিতা, পুত্র ও কুমারী মারয়াম –এই তিনের সমষ্টিই হলেন খোদা।[৩]

তারপর আবার পৃথকভাবে এই তিনের প্রত্যেকের অবস্থান (Position) কী? সমষ্টিগত খোদার সাথে তার সম্পর্কই কী? এ প্রশ্নের উত্তরেও খ্রিস্টানদের মধ্যে ভীষণ মতবিরোধ। এক দলের কথা হল, সমষ্টিগতভাবে যেমন, আলাদাভাবেও প্রত্যেকে সেই রকমেরই খোদা।[৪] অপর এক দলের কথা, এ ত্রয়ের প্রত্যেকে আলাদাভাবে খোদা বটে, তবে সমষ্টি অপেক্ষা নিম্নস্তরের। প্রতিটি সত্তাকে খোদা

---

১. H. Maurice Relton : Studies in Christian Doctrine

২ অধিকাংশ খ্রিস্টানদের মত এটাই। দেখুন ব্রিটানিকা ২২ খণ্ড, ৪৭৯ নিবন্ধ, Trinity.

৩. আরব এলাকায় খ্রিস্টানদের একটি উপদল ছিল। এটা তাদের বিশ্বাস। বর্তমানে এ দলের কোন অস্তিত্ব নেই। জর্জ সেল Collyridians নামে তাদের কথা উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া নিকিয়া কাউন্সিলেও কেউ কেউ হযরত মারয়াম (আ.)-কে খোদা সাব্যস্ত করেছিল। তাদেরকে Mariamites বলা হয় (জর্জ সেল, কুরআনের ভূমিকা, সেকশন ২)।

৪. Hibbert Journal XXIV No. 1. as quoted by the Eneyclopaedia Britannica 1950 P. 419 V. 22 'Trinity'.

বলা হয় কিছুটা বিস্তৃত অর্থে।[১] তৃতীয় এক দলের মতে তিনের কেউ স্বতন্ত্রভাবে খোদা নয়! খোদা কেবল তাদের সমষ্টিরই নাম।[২]

ত্রিত্ববাদের ভেতর একত্ববাদ

মোদ্দাকথা ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী এ রকম অসংখ্য ব্যাখ্যা আছে। ফলে ত্রিত্ববাদের বিশ্বাসটি একটি দুর্ভেদ্য রহস্য হয়ে আছে। এ বিশ্বাসটির যে ব্যাখ্যা খ্রিস্টানদের কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়, আমরা এখানে তা পেশ করছি। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় ব্যাখ্যাটি নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে,

ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে খ্রিস্টবাদ যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, তার সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হতে পারে এ রকম, পিতা হলেন খোদা, পুত্রও খোদা এবং রূহুল-কুদ্সও খোদা। তবে এরা আলাদা তিন খোদা নন। সকলে মিলে একই খোদা। কেননা খ্রিস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আমরা এ তিনের প্রত্যেককে যেমন খোদা ও প্রভু স্বীকার করতে বাধ্য, তেমনি ক্যাথলিক ধর্ম এদেরকে স্বতন্ত্র তিন খোদা বা তিন প্রভু মনে করতেও নিষেধ করে দিয়েছে।

খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের বিখ্যাত খ্রিস্টান পণ্ডিত ও দার্শনিক সেন্ট অগাস্টাইন (St. Augustine) তার প্রসিদ্ধ On the Trinity গ্রন্থে উপরিউক্ত কথাটিকেই আরেকটু খুলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

প্রাচীন ও আধুনিক কালের যত ক্যাথলিক ধর্মজ্ঞকে আমার পড়ার সুযোগ হয়েছে এবং যারা আমার আগে ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে কলম ধরেছেন, তাদের সকলেই পবিত্র গ্রন্থাবলীর আলোকে এই দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষা দিতে চান যে, পিতা, পুত্র ও পাক রূহ মিলে ঈশ্বরের একত্বই সম্পন্ন করে, যা নিজ স্বরূপ ও সত্তাসারের দিক থেকে এক ও অবিভাজ্য। এ কারণেই তারা তিন খোদা নয়; বরং একই খোদা। পিতা পুত্রকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যিনি পিতা তিনি পুত্র নন। এমনিভাবে পুত্র পিতা হতে সৃষ্ট। কাজেই যিনি পুত্র তিনি পিতা নন। আর পাক রূহও পিতা-পুত্র কিছুই নন; বরং তিনি পিতা ও পুত্রের আত্মা, যা উভয়ের জন্য সমপর্যায়ভুক্ত এবং ত্রিত্বিক একত্বে তাদের অংশীদার।

কিন্তু একথা মনে করা ঠিক হবে না যে, এই ত্রিত্বিক একত্বই কুমারী মারয়ামের উদর থেকে সৃষ্টি হয়েছে, যাকে পানতিয়ুস পীলাত ফাঁসি দিয়েছে, তারপর তাঁকে

---

১. St. Thoms Aquinas Basic Wrethings of : p. 327 V. 1.

২. এ বিশ্বাস মারকূলিয়া দলের। (আল-খুতাতুল মাকরীযিয়্যাহ, ৩ খণ্ড, ৪০৮ পৃ.। লেবানন ১৯৫৯ খ্রি.।

দাফন করা হয়েছে এবং তৃতীয় দিন জীবিত হয়ে জান্নাতে চলে গেছে। কেননা এসব ঘটনা ত্রিত্বিক একত্বের সঙ্গে নয়; বরং শুধুমাত্র পুত্রের সঙ্গে ঘটেছিল। এমনিভাবে একথা মনে করারও সুযোগ নেই যে, এই ত্রিত্বিক একত্বই একটি কবুতরের আকৃতিতে ইয়াসূ মাসীহের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন তাঁকে ব্যাপ্টাইজ (তরিকাবন্দী) করা হচ্ছিল।[১]

বরং এটা কেবলই পাক রূহের ঘটনা। এমনিভাবে এরূপ বোঝাও সঙ্গত হবে না যে, যখন ইয়াসূ মাসীহকে তরিকাবন্দী করা হচ্ছিল বা যখন তিনি তাঁর তিনজন শিষ্যসহ পাহাড়ে দাঁড়ানো ছিলেন, তখন ত্রিত্বিক একত্ব তাঁকে ডেকে বলেছিল 'তুমি আমার পুত্র'।[২] কেননা এটা ছিল কেবল পিতারই কথা, যা পুত্রকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছিল, যদিও পিতা, পুত্র ও পাক রূহ যেমন অবিভাজ্য, তেমনি তাঁরা কাজও করে থাকেন অবিভাজ্যভাবে। এটাই আমার বিশ্বাস, যেহেতু এটা ক্যাথলিক বিশ্বাস।[৩]

'তিন'-কে এক এবং 'এক'-কে তিন সাব্যস্ত করা কিভাবে বৈধ হতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর শোনার আগে খ্রিস্টধর্মে পিতা, পুত্র ও পাক রূহ দ্বারা কী বোঝানো হয় তা জেনে নেওয়া দরকার।

পিতা

খ্রিস্টানদের কাছে 'পিতা' দ্বারা কালাম (Word of god) ও জীবন গুণ থেকে বিযুক্ত শুধুমাত্র আল্লাহর সত্তাকে বোঝায়। পুত্রের অস্তিত্বের জন্য এ সত্তা মূল (Principle)-এর মর্যাদা রাখে। প্রসিদ্ধ খ্রিস্টান দার্শনিক সেন্ট একুইনাসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'পিতা'-এর অর্থ এ নয় যে, তিনি কারও জন্ম দান করেছেন এবং এমন একটা সময় ছিল যখন পিতা তো ছিলেন, কিন্তু পুত্র ছিলেন না। বরং এটা ঈশ্বর সংক্রান্ত একটি পরিভাষা, যা দ্বারা কেবল এতটুকু বোঝানোই উদ্দেশ্য যে, পিতা হলেন পুত্রের মূল, যেমন সত্তা গুণের মূল। অন্যথায় যখন থেকে পিতা আছেন, তখন থেকেই পুত্রও আছেন; কাল হিসেবে তাদের একজন অন্যজন অপেক্ষা পূর্বেকার নন।[৪]

---

১. মথি (৩ : ১৬) বর্ণিত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত।
২. ইশারা মথি (১৭ : ৫)-এ বর্ণিত তাজাল্লীর ঘটনার প্রতি।
৩. Basic Writings of st. Augustine. Trans. by. A. W. Haddan and edited by Whitney J-oats. New jork 1948 P. 672 V. 2.
৪. Basic Writings of st. Trams Aquinas. edited by A. C. pegis pp 324. 26 V. 1. New york 1945.

ঈশ্বরের সত্তাকে কেন পিতা বলা হয়? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আলফ্রেড গারভে বলেন,

এর দ্বারা কয়েকটি বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য। এক তো ইশারা করা হয়েছে যে, সকল সৃষ্টি তাদের অস্তিত্বের জন্য তাঁর মুখাপেক্ষী, যেমন পুত্র পিতার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত বোঝানো হয়েছে, পিতা যেমন নিজ পুত্রের প্রতি মমতাবান ও দয়ালু হয়ে থাকে খোদাও তেমনি নিজ বান্দাদের প্রতি অশেষ দয়ালু (এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন এন্ড এথিক্স, ৩ খ., ৫৮৫ পৃ.)।

পুত্র

খ্রিস্টানদের নিকট 'পুত্র' দ্বারা খোদার কালাম গুণ (Word of God) বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু তার এ গুণ মানুষের কথার মত নয়। মানুষের 'বাক-গুণ'ও আল্লাহর 'কালাম-গুণ'-এর মধ্যকার পার্থক্য কী? একুইনাস লেখেন, মানব প্রকৃতিতে 'কালাম' গুণের কোন বস্তুগত অস্তিত্ব নেই। এ কারণেই তাকে মানুষের পুত্র বা জাতক বলা যায় না। কিন্তু আল্লাহর 'কালাম' গুণ হচ্ছে বস্তু, যা আল্লাহর সত্তার ভেতর অস্তিমান। এ কারণেই তাকে প্রতীকী নয়; বরং প্রকৃত অর্থেই 'পুত্র' বলা হয় আর তার মূলকে বলা হয় পিতা।[১]

খ্রিস্টীয় বিশ্বাস মতে খোদা যে সমস্ত জ্ঞান লাভ করেন, তা এই 'কালাম' গুণের মাধ্যমেই করেন আর এ গুণের মাধ্যমেই বস্তুনিচয় সৃষ্টি করা হয়েছে। পিতার মত এ গুণও নিত্য ও চিরন্তন।[২] খোদার এ গুণই ইয়াসূ মাসীহের মানব-অস্তিত্বে আত্মপ্রকাশ করেছিল, যে কারণে ইয়াসূ মাসীহকে খোদার পুত্র বলা হয়। খোদার কোন গুণের জীবাকৃতি ধারণ (হুলূল)-এর এ আকীদা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই ইনশাআল্লাহ আমরা সামনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

পাক রূহ

রূহুল-কুদ্স বা পাক রূহ (Holy Spirit) দ্বারা বোঝানো হয় পিতা ও পুত্রের জীবন ও ভালোবাসার গুণকে। অর্থাৎ এ গুণের মাধ্যমে পিতা (খোদার সত্তা) পুত্র ('জ্ঞান'-গুণ)-কে এবং পুত্র পিতাকে ভালোবাসে। এ গুণটিও 'কালাম' গুণের মত বস্তুগতভাবে অস্তিমান এবং পিতা-পুত্রের মত নিত্য ও চিরন্তন। এ কারণেই তা স্বতন্ত্র একক সত্তা (Person)-এর মর্যাদা রাখে।[৩]

---

১. Aquimas The Summa Theologice Q. 33 Art 206. 3.

২. Augustine, The City of God, Book XI ch XXIV.

৩. The City of God. P. 168 V. 2.

খ্রিস্টানদের বিশ্বাস হল হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামকে যখন তরিকাবন্দী দেওয়া হচ্ছিল, তখন এ গুণই কবুতর আকৃতিতে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর সত্তায় মিশে গিয়েছিল। (দেখুন মথি ৩ : ১৬ এবং অগাস্টাইনের সেই উদ্ধৃতি, যা ত্রিত্ববাদের ব্যাখ্যায় গত হয়েছে)। পরবর্তীতে হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামকে যখন আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছিল তখন পঞ্চাশত্তমী ঈদের দিন এই পাক রূহই আগুনের জিহ্বা আকারে এসে হযরত মাসীহ (আ.)-এর শিষ্যবর্গের উপর বসেছিল (প্রেরিত ২ : ১–২২; অগাস্টাইন, ২য় খণ্ড, ৬৭২ পৃষ্ঠা)।

উপরের আলোচনা দ্বারা 'ত্রিত্ববাদের ভেতর একত্ববাদ' (Tri-unity)-এর যে সারমর্ম বুঝে আসে তা হল, খোদা তিনটি সত্তার সমন্বিত রূপ। (এক) খোদার নিজ সত্তা, যাকে পিতা বলা হয়। (দুই) খোদার কালাম-গুণ, যাকে পুত্র বলা হয় এবং (তিন) খোদার জীবন ও ভালোবাসা-গুণ, যাকে পাক রূহ বলা হয়। এ তিনের প্রত্যেকেই খোদা, তবে স্বতন্ত্রভাবে তারা তিন খোদা নন; বরং তিন মিলে একই খোদা।

তিন ও একের ঐক্য

এখানেই প্রশ্ন দেখা দেয়, যখন পিতা, পুত্র ও পাক রূহ –এ তিনের প্রত্যেককে খোদা মেনে নেওয়া হল, তখন খোদা এক থাকল কোথায়? অবধারিতভাবেই খোদা তিন হয়ে গেল না কি?

এটা এমনই এক প্রশ্ন, যা শুরু থেকেই খ্রিস্টধর্মের এক হেয়ালি-রূপে চলে আসছে। আজ অবধি এর কোন কিনারা হয়নি। খ্রিস্টানদের বড়-বড় চিন্তাবিদেরা নতুন-নতুন পন্থায় এ রহস্যের সমাধান করতে চেষ্টা করেছেন। এর উপর ভিত্তি করে এ ধর্মের অসংখ্য শাখা-প্রশাখাও গড়ে ওঠেছে। বছরের পর বছর এর উপর আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব কথা হল, এ প্রশ্নের যুক্তিগ্রাহ্য কোন জবাব আজও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। বিশেষভাবে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দির শেষ ও তৃতীয় শতাব্দির শুরু দিকে বিভিন্ন ফের্কা এ প্রশ্নের যেসব সমাধান উপস্থাপন করেছে প্রফেসর মরিস রিল্টন তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ Studies in Christian Doctrine শীর্ষক গ্রন্থে তার মজাদার চিত্র তুলে ধরেছেন।

ইবিওনী শাখা (Ebionites) তো এ প্রশ্নের সমাধান করতে যেয়ে প্রথম যাত্রাতেই অস্ত্র সমর্পণ করেছে। তারা সাফ বলে দিয়েছে, আমরা হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামকে খোদা মেনে একত্ববাদের বিশ্বাসকে অক্ষত রাখতে পারব না। কাজেই আমাদের স্বীকার করতে হবে, তিনি পূর্ণাঙ্গ খোদা ছিলেন না। বলা

যেতে পারে তিনি খোদাতুল্য ছিলেন কিংবা খোদার গুণাবলীর প্রতিচ্ছবি ছিলেন। কিন্তু একথা বলার কোন সুযোগ নেই যে, পিতার মত স্বরূপ ও সত্তাসারের দিক থেকেও তিনি খোদা ছিলেন।

এ দলটি জটিলতার সমাধান দিয়েছিল খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের মৌল ভিত্তির উপর আঘাত করে, যে কারণে গীর্জা থেকে এর জোর প্রতিবাদ করা হয় এবং এ বিশ্বাসের লোকদেরকে বিদআতী ও ধর্মদ্রোহী সাব্যস্ত করা হয়। সুতরাং তাদের প্রদত্ত এ সমাধান খ্রিস্ট সমাজে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।

ইবিওনী সম্প্রদায়েরই কিছু লোক বিষয়টাকে অন্যভাবে সমাধান করতে চেয়েছিল। তাদের বক্তব্য হল, মাসীহ আলাইহিস সালামের ঈশ্বরত্বকে এমন সোজাসাপ্টা অস্বীকার না করে বরং বলা হোক, তিনি খোদা ছিলেন, তবে মুশরিক বা অংশীবাদী হওয়ার অভিযোগ থেকে বাঁচার জন্য বলুন, সত্তাগতভাবে খোদা কেবল পিতা, তবে তিনি তাঁর ঈশ্বরত্বের গুণ যেহেতু পিতা ও পাক রূহকেও দান করেছেন, তাই ত্রিত্ববাদের বিশ্বাসও ভুল নয়।

এই দ্বিতীয় সমাধানও গীর্জার সাধারণ বিশ্বাসের পরিপন্থী ছিল। কেননা গীর্জার বিশ্বাস অনুযায়ী পুত্র সত্তাগতভাবেই খোদা, যেমন পিতা। কাজেই গীর্জা কর্তৃক এ বিশ্বাস পোষণকারীগণও ধর্মত্যাগী সাব্যস্ত হল। সুতরাং কথা সেটাই থেকে গেল।

তাদের তৃতীয় একটি দল হল প্যাট্রি প্যাশিয়ান। (Patripassian) এ দলের প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন নাইটস, প্রাক্সিম (Praxeas), ক্যালিসটাস (Calistus) ও জেফাইরিনাস (Zephyrinus)। তারা এ জটিলতার সুরাহা কল্পে একটি নতুন দর্শন পেশ করেন। তাদের কথা হল, পিতা ও পুত্র আলাদা-আলাদা ব্যক্তিসত্তা নন; বরং একই ব্যক্তিসত্তার ভিন্ন-ভিন্ন রূপ। সেই রূপেরই পৃথক-পৃথক নাম রেখে দেওয়া হয়েছে। পিতাই প্রকৃত খোদা। সত্তাগতভাবে তিনি নিত্য ও চিরন্তন। তাঁর কোন লয়-ক্ষয় নেই। মানব দৃষ্টি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না এবং মানবীয় অবস্থাসমূহ তাঁর সাথে যুক্ত হতে পারে না। কিন্তু তিনি যেহেতু খোদা এবং খোদার ইচ্ছার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা সম্ভব নয়, তাই কখনও মর্জি হলে তিনি নিজের উপর মানবীয় অবস্থাদির অধ্যাস ঘটাতে পারেন। তিনি চাইলে নিজেকে মানব রূপে প্রকাশ করতে পারেন। এমনকি ইচ্ছা হলে মানুষের সামনে মৃত্যুও বরণ করতে পারেন। সুতরাং একবার খোদার মর্জি হল তিনি মানবরূপে আত্মপ্রকাশ করবেন। ফলে তিনি ইয়াসূ মাসীহের রূপ ধারণ করে জগতে আবির্ভূত হলেন। মানুষ তাকে দেখতে পেল। ইয়াহুদীরা তাঁকে দুঃখ-কষ্ট দিল। এমনকি

তাকে শূলে পর্যন্ত চড়াল। সুতরাং ইয়াসূ মাসীহ বা পুত্র মূলত পৃথক কোন সত্তা (Person) নয়; বরং সেই পিতাই, যিনি রূপ বদল করে নিজেকে পুত্র নামে অভিহিত করেছেন।[১]

কিন্তু এ দর্শন 'এক ও তিন'-এর ঐক্য সংক্রান্ত প্রশ্নটির এক রকম সমাধান দিলেও অপর দিকে এর দ্বারা এমন কয়েকটি জটিল প্রশ্ন সামনে এসে যায়, যার কোন সমাধান নেই। তাছাড়া এ দলটিও গীর্জার এই দৃষ্টিভঙ্গি যে, 'পিতা' ও 'পুত্র' স্বতন্ত্র দুই সত্তা –এর কোন রকম সমর্থন করেনি। ফলে গীর্জা কর্তৃক এ দলটিও বিদআতী বা মূলত্যাগী একটি অভিনব ধর্মমতের প্রবক্তা নামে আখ্যায়িত হল। ফলে প্রশ্নটি যেই কে সেই থেকে গেল।

বিদআতী বা নব্য দলসমূহের পক্ষ হতে এ প্রশ্নের সমাধানে আরও বিভিন্ন কসরত করা হয়েছে, কিন্তু তার ফলে যেহেতু গীর্জার সর্বস্বীকৃত দৃষ্টিভঙ্গি কোনও না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাই তার কোনওটিই খৃষ্টসমাজে গৃহীত হয়নি।

প্রশ্ন হচ্ছে খোদ রোমান ক্যাথলিক চার্চের দায়িত্বশীলগণ এ প্রশ্নটির কী সমাধান পেশ করেছেন? আমার যতদূর পড়াশোনা, সে অনুযায়ী রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই এমন, যারা এ গেরো খোলারই পক্ষে নন। তারা এর সমাধান দিতে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তাদের বক্তব্য হল, 'তিন'-এর 'এক' হওয়া এবং 'এক'-এর 'তিন' হওয়ার বিষয়টা এমনই এক নিগূঢ় রহস্য যা বোঝার মত ক্ষমতাই আমাদের নেই।[২]

---

১. এখানে আমরা খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়সমূহের প্রদত্ত ব্যাখ্যার সারমর্ম পেশ করলাম। বিস্তারিত জ্ঞাতার্থে দেখুন মরিস রিল্টন, Studie in Christian Doctorine P. P. 61, 74

২. কোন কোন ভারতীয় পাদ্রী এ কথাটিকেই এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, 'ত্রিত্ববাদ'-এর বিশ্বাস একটি মুতাশাবিহ অর্থাৎ এমন বিষয়, যার প্রকৃত মর্ম আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। মুতাশাবিহ হওয়ার কারণে যেমন কুরআন মাজীদের আল-হুরূফুল মুকাত্তাআত (বিচ্ছিন্ন হরফসমূহ) কিংবা اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى -এর মত আয়াতসমূহের মর্ম উপলব্ধি করা যায় না, তেমনি 'ত্রিত্ববাদ'-এর বিশ্বাসটিও আমাদের বুঝ-সমঝের অতীত।

'মুতাশাবিহ' কাকে বলে?

আমাদের এতদঞ্চলের পাদ্রী সাহেবগণ সাধারণত উপরিউক্ত কথার দ্বারা মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে থাকেন। তাই এ কথার উত্তর বিস্তারিতভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। এ ব্যাপারে প্রথম কথা হল, মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের ভেতর যেসব মর্ম নিহিত থাকে এবং যা বুঝতে আমরা অক্ষম, তা কখনও দ্বীনের এমন মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত নয়, যার উপর ঈমান আনা আখেরাতের মুক্তির জন্য অপরিহার্য শর্ত। আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য যে সকল আকীদা-বিশ্বাসের উপর ঈমান আনা বাধ্যতামূলক করেছেন, সেগুলো তিনি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। এ রকম প্রতিটি আকীদাই এমন যে, কোন যৌক্তিক দলিল-প্রমাণ দ্বারা তা বাতিল করা সম্ভব নয়। বস্তুত 'মুতাশাবিহ'

আবার কোন কোন পাদ্রী এ বিশ্বাসটির বিভিন্ন যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেওয়ারও চেষ্টা করেছেন। তাদের মধ্যে এই উপমহাদেশীয় পাদ্রীগণ উল্লেখযোগ্য, যারা

এমন বিষয়ই হয়ে থাকে যা বুঝতে না পারলে আখেরাতের মুক্তি লাভ ব্যাহত হবে না এবং যা জানার উপর মৌলিক আকীদা বা কর্মগত কোন বিধান নির্ভরশীল নয়। বলাবাহুল্য ত্রিত্ববাদের বিষয়টি এ রকম নয়। এটা তো খ্রিস্টবাদের এমন এক বিশ্বাস, যার উপর ঈমান আনা ছাড়া তাদের মতে আখেরাতে মুক্তি সম্ভব নয়। যদি এ বিশ্বাসটিকে মুতাশাবিহ গণ্য করা হয়, তবে তার অর্থ দাঁড়াবে, আল্লাহ তাআলা এমন একটি বিষয় বোঝা ও মানা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন, যা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত। কিংবা বলতে পারেন, খ্রিস্টীয় বিশ্বাস মতে মানুষের ঈমান ও নাজাত এমন একটি আকীদার উপর নির্ভরশীল, যা বুঝে উঠতে মানুষ সম্পূর্ণ অক্ষম। কুরআন মাজীদের মুতাশাবিহ বিষয়গুলো তো আদৌ এমন নয়। তা জানা ও বোঝার উপর ঈমান ও ইসলাম নির্ভরশীল নয়। কোন ব্যক্তি যদি সারাটা জীবনও 'মুতাশাবিহ' বিষয়সমূহ সম্পর্কে অনবগত থাকে, তাতে তার ঈমান প্রশ্নবিদ্ধ হয় না।
দ্বিতীয়ত ত্রিত্ববাদের বিশ্বাসকে মুতাশাবিহ সাব্যস্ত করলে সেটা হয় 'মুতাশাবিহ' সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক হবে অথবা খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয় বলে প্রমাণ করবে। কেননা মুতাশাবিহ বলতে এমন বিষয়কে বোঝানো হয়, যার প্রকৃত মর্ম কোন মানুষ বুঝতে সক্ষম নয়, এমন নয় যে, তা মানব বুদ্ধির বিরুদ্ধ। অর্থাৎ মুতাশাবিহ বিষয়গুলো বুদ্ধির অতীত বটে, কিন্তু বুদ্ধির বিপরীত নয়।
ইসলামে মুতাশাবিহ দু'প্রকার। (ক) এমন মুতাশাবিহ যার কোন অর্থই বোঝা যায় না, যেমন الم প্রভৃতি 'আল-হুরূফুল মুকাত্তাআত'। এসব হরফের নিশ্চিত কোন অর্থ আজ পর্যন্ত কেউ বর্ণনা করতে পারেনি। (খ) দ্বিতীয় প্রকারের মুতাশাবিহ এমন, যার শব্দাবলী দ্বারা বাহ্যত একটা অর্থ বুঝে আসে কিন্তু সে অর্থ বুদ্ধির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এরূপ ক্ষেত্রে বলা হয়, এই বাহ্য অর্থ কিছুতেই বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। এর দ্বারা আসলে কী বোঝানো উদ্দেশ্য তা কেবল আল্লাহ তাআলাই জানেন। আমরা জানি না। উদাহরণত কুরআন মাজীদে আছে, اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى এর বাহ্য অর্থ হচ্ছে, রহমান আরশে সমাসীন হয়েছেন।' কিন্তু এই যে বাহ্য অর্থ, এটা সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধির পরিপন্থী। কেননা আল্লাহ তাআলার সত্তা অসীম। কোন স্থান বা আধার তাকে ধারণ করতে পারে না। তাই জুমহূর বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের মত হল, এ আয়াতের বাহ্য অর্থ বোঝানো আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য নয়। আরশে সমাসীন হওয়া দ্বারা তাঁর অন্য কিছু বোঝানো উদ্দেশ্য, যা আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না।
সুতরাং পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ত্রিত্ববাদের বিষয়টি মুতাশাবিহ-এর প্রকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণ, এ বিষয়ে যে শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়, তার বাহ্যিক অর্থ আমরা বুঝতে পারি। আর দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত নয় এ কারণে যে, খ্রিস্টানগণ যদি বলত, ত্রিত্ববাদের বাহ্যিক অর্থ-বুদ্ধির বিপরীত, তাই সে অর্থ এ বিশ্বাসের উদ্দিষ্ট বস্তু নয়, বরং উদ্দিষ্ট বস্তু অন্য কিছু, যা আমরা জানি না, তবে তো একটা কিছু হত। কিন্তু খ্রিস্টধর্মের কথা হল, ত্রিত্ববাদের শব্দাবলী দ্বারা বাহ্যত যা বোঝা যায়, সেটাই উদ্দিষ্ট বস্তু। অর্থাৎ প্রত্যেক খ্রিস্টানকে স্বীকার করতে হবে, খোদা হচ্ছে তিন সত্তা আর তারা তিন মিলে এক। এভাবে তারা বুদ্ধি বিরুদ্ধ কথাকে আকীদা বানাচ্ছে এবং বলছে, এর প্রকৃত মর্ম আমাদের জানা নেই।
বিষয়টাকে এভাবেও ব্যক্ত করা যায় যে, মুসলিমগণ কুরআনের যেসব আয়াতকে 'মুতাশাবিহ' সাব্যস্ত করে সে সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস হল, এসব আয়াতে প্রকৃতপক্ষে যে দাবি করা হয়েছে, তা আমরা বুঝতে সক্ষম নই। তবে দাবি যা-ই করা হোক, তা বুদ্ধি ও প্রমাণসম্মত। পক্ষান্তরে ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে খ্রিস্টানদের বিশ্বাস হল, এতে যে দাবি করা হয়েছে, তা আমাদের জ্ঞাত ও সুনির্দিষ্ট, কিন্তু তার দলিল-প্রমাণ আমাদের বোধগম্য নয়। সুতরাং ত্রিত্ববাদের বিশ্বাসকে কিছুতেই মুতাশাবিহের সাথে তুলনা করা চলে না।

বিগত এক শতাব্দীকাল এতদঞ্চলে খ্রিস্ট ধর্মের প্রচারকার্য চালিয়ে গেছেন। কিন্তু তারা এ বিশ্বাসটির যে ব্যাখ্যা ও তার পক্ষে যেসব দলিল-প্রমাণ পেশ করেছেন, তা গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলে অনুমান করা যায় যে, খ্রিস্টবাদের মূল কেন্দ্র থেকে বহু দূরে থাকার কারণে তারা এ ধর্মের আকীদা-বিশ্বাস ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারেননি। এখানে আমরা একটা দৃষ্টান্ত পেশ করছি, যা দ্বারা অনুমান করা যাবে তারা এ ধর্ম কতটুকু বুঝতে পেরেছেন।

পাদ্রী কায়েমুদ্দীন ত্রিত্ববাদের ব্যাখ্যা দানের লক্ষ্যে 'তাকশীফুত তাছলীছ' নামে একখানি পুস্তিকা লিখেছেন, যা ১৯৭২ খ্রি. লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ পুস্তিকায় তিনি 'ত্রিত্ববাদের ভেতর একত্ববাদ' কিভাবে সম্ভব, একটি উদাহরণের মাধ্যমে তা বোঝাতে গিয়ে লেখেন,

'মানুষের দৈহিক গঠনের প্রতি লক্ষ্য করলেও দেখা যায়, তা সমজাতীয় বিভিন্ন বস্তুগত অংশ দ্বারা গঠিত সত্তা, যার সমন্বিত রূপকে আমরা ইন্দ্রিয় দৃষ্টি দ্বারা দেখতে পাই। যেমন অস্থি, মাংস ও রক্ত –এ তিনের পারস্পরিক মিলনের ফলে মানবদেহ অস্তিত্ব লাভ করেছে। এ তিনটির মধ্য হতে কোনও একটি না থাকলে মানব দেহের পূর্ণতা বিধান সম্ভব নয়। (তাকশীফুত তাছলীছ, পৃষ্ঠা ২৪, লাহোর ১৯২৭ খ্রি.)

পাদ্রী সাহেব উপরিউক্ত বক্তব্য দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, মানব অস্তিত্ব যেমন রক্ত-মাংস-অস্থি –এ তিন অংশ দ্বারা গঠিত, তেমনি আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বও তিন সত্তা দ্বারা গঠিত (নাউযুবিল্লাহ)। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, পাদ্রী সাহেবের বুঝমতে খ্রিস্টধর্মে তিন সত্তা দ্বারা তিন অংশ বোঝানো হয় এবং বহু অংশ দ্বারা গঠিত কোন বস্তু যেমন সমষ্টিগতভাবে একটিই হয়ে থাকে, তেমনি আল্লাহর সত্তাও তিন সত্তা দ্বারা গঠিত হওয়া সত্ত্বেও একটি মাত্র সত্তাই। অথচ খ্রিস্টধর্ম তিন সত্তাকে তিন অংশ স্বীকার করে না; বরং স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ তিন সত্তা সাব্যস্ত করে। পূর্বে সেন্ট অগস্টাইনের যবানীতে এর ব্যাখ্যা গত হয়েছে। এ কারণেই পিতা, পুত্র ও পাক রূহ-এর জন্য 'অংশ' শব্দ ব্যবহার না করে সত্তা (Person) শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

একথা তো সত্য যে, মানবদেহ রক্ত-মাংস ও অস্থি দ্বারা গঠিত, কিন্তু শুধু মাংস বা শুধু অস্থিকে কেউ মানুষ বলে না; বরং মানুষের একটা অংশ বলে। পক্ষান্তরে খ্রিস্ট ধর্মে পিতা, পুত্র ও পাক রূহ –এ তিনের প্রত্যেককে খোদা বলা হয়ে থাকে, খোদার অংশ নয়।[১]

---

১. খ্রিস্টধর্ম যদি তিন সত্তার প্রত্যেকটিকে খোদার অংশ বলে স্বীকার করত, তবে পাদ্রী কায়েমুদ্দীনের ব্যাখ্যা সঠিক হত। এটা ভিন্ন কথা যে, আল্লাহর সত্তাকে বিভিন্ন অংশ দ্বারা গঠিত বলার কোন সুযোগ নেই। কেননা দলির-প্রমাণের আলোকে তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও বুদ্ধিবিরোধী এবং তা তাঁর নিত্যতা ও চিরন্তনতারও পরিপন্থী।

এ দৃষ্টান্তটি পেশ করার উদ্দেশ্য ছিল কেবল দেখানো যে, এতদঞ্চলের খ্রিস্টান পাদ্রীগণ যখন ত্রিত্ববাদের আকীদাকে দলিল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তখন তাদের ধর্ম এ বিষয়ে যে ব্যাখ্যা দিয়েছে, তা তাদের দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায়। কাজেই এ রচনায় আমরা তাদের প্রদত্ত দলিল-প্রমাণের দিকে না তাকিয়ে বরং অনুসন্ধান করে দেখব, এ ধর্মের প্রাচীন আলেমগণ এ বিষয়ে কী বলেছেন? আমরা যতদূর তালাশ করেছি, সেমতে এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনা করেছেন খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর বিখ্যাত ধর্মযাজক ও দার্শনিক সেন্ট অগাস্টাইন। পরবর্তী কালের সকলে তার গ্রন্থকে অবলম্বন করেই কলম ধরেছেন। এ. ডাব্লিউ হেডন তাঁর গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন, যা On the Trinity নামে প্রকাশ করা হয়েছে। এটা 'বেসিক রাইটিংস অব সেন্ট অগাস্টাইন' নামে মুদ্রিত অগাস্টাইনের রচনা সমগ্রের একটি অংশ, যা ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[১]

গ্রন্থখানির সিংহভাগই বর্ণনানির্ভর হলেও শেষ দিকের পৃষ্ঠাগুলোতে অগাস্টাইন 'তিন ও একের ঐক্য'-কে যুক্তির নিরিখে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন এবং এর সপক্ষে কয়েকটি উদাহরণও পেশ করেছেন। আমরা এখানে উদাহরণগুলির সারমর্ম পেশ করছি।

ত্রিত্ববাদের সপক্ষে মস্তিষ্কের উদাহরণ

অগস্টাইন প্রথম উদাহরণ দিয়েছেন এই যে, মস্তিষ্ক মানুষের জ্ঞান আহরণের একটি মাধ্যম। জ্ঞান আহরণকারী, জ্ঞেয় বিষয় ও জ্ঞানের মাধ্যম– এ তিনটি সাধারণত পৃথক পৃথক বস্তু হয়ে থাকে। আপনি যদি যায়েদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে থাকেন, তবে আপনি জ্ঞানী, যায়েদ জ্ঞাত বিষয় এবং আপনার মস্তিষ্ক জ্ঞান লাভের মাধ্যম। অর্থাৎ

জ্ঞানী – আপনি

জ্ঞাতবিষয় – যায়েদ

জ্ঞানের মাধ্যম – মস্তিষ্ক

এভাবে এ তিনটি আলাদা আলাদা জিনিস। কিন্তু একই সাথে আপনার মস্তিষ্কের তার নিজ অস্তিত্ব সম্পর্কেও জানা রয়েছে। এ অবস্থায় মস্তিষ্ক যেমন জ্ঞানের মাধ্যম, তেমনি স্বয়ং জ্ঞানীও বটে। কেননা সে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কিত জ্ঞান নিজেরই মাধ্যমে লাভ করেছে। এ হিসেবে ব্যাপারটা দাঁড়াল এ রকম

১. আমরা এ রচনার যেখানেই অগাস্টাইনের উদ্ধৃতি দেব, তা দ্বারা মূলত তাঁর উল্লেখিত রচনা সমগ্রকেই বোঝানো হবে।

জ্ঞানী – মস্তিষ্ক

জ্ঞাত – মস্তিষ্ক

জ্ঞান-মাধ্যম – মস্তিষ্ক

আপনি এ উদাহরণে দেখলেন জ্ঞানী, জ্ঞাত ও জ্ঞান-মাধ্যম, যা প্রকৃতপক্ষে পৃথক তিনটি বস্তু, কিভাবে 'এক'-এ পরিণত হল। জ্ঞানী ছিল পৃথক এক সত্তা, জ্ঞানও ছিল পৃথক এবং তেমনি জ্ঞান-মাধ্যমও। দ্বিতীয় উদাহরণে সেই তারাই এক হয়ে গেল। এখন কেউ যদি জিজ্ঞেস করে জ্ঞানী কে? উত্তর হবে মস্তিষ্ক। যদি জিজ্ঞেস করে জ্ঞাত কে? বলা হবে মস্তিষ্ক। আবার যদি জিজ্ঞেস করে জ্ঞান-মাধ্যম কী? তখনও উত্তর দেওয়া হবে মস্তিষ্ক। অথচ মস্তিষ্ক একই। ব্যাপার কেবল এই যে, মস্তিষ্ক তিনটি গুণের অধিকারী। তিনটি গুণের প্রত্যেকটির ধারককেই মস্তিষ্ক বলা হয়। কিন্তু তাই বলে একথা বলার সুযোগ নেই যে, মস্তিষ্ক তিনটি।

এ উদাহরণ দিয়ে অগাস্টাইন বলছেন, এভাবেই খোদা তিন সত্তার নাম। সে তিনের প্রত্যেকেই খোদা। কিন্তু তা দ্বারা এটা প্রমাণ হয় না যে, খোদা তিনজন। বরং খোদা একই।[১]

অগাস্টাইন এ উদাহরণ দিয়ে যেন বেশ ধীমানতা প্রদর্শন করেছেন! কিন্তু একটু সতর্কতার সাথে চিন্তা করলে এর ভেতর যে শুভঙ্করের ফাঁকি রয়েছে তা বুঝতে কোন কষ্ট হয় না। কেননা উপরিউক্ত উদাহরণে মস্তিষ্ক তো মূলত একই। তাতে তিনের ব্যাপারটা কেবলই আপেক্ষিক। প্রকৃতপক্ষে এখানে আলাদা তিনটি সত্তা নেই। পক্ষান্তরে খ্রিস্টধর্মে একত্বকে যেমন প্রকৃত অর্থে গণ্য করা হয় তেমনি ত্রিত্বকেও।

বিষয়টা আরও পরিষ্কার করার জন্য বলছি, উপরের উদাহরণে মস্তিষ্কের তিনটি অবস্থা। এক হিসেবে সে জ্ঞানী, দ্বিতীয় হিসেবে জ্ঞাত এবং তৃতীয় হিসেবে জ্ঞান-মাধ্যম। কিন্তু বাস্তব অস্তিত্বের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তিনওটি একই। অর্থাৎ বাস্তবে জ্ঞানী বলে সেই মস্তিষ্ককেই বোঝানো হয়েছে, যে একই সঙ্গে জ্ঞাতও এবং জ্ঞান-মাধ্যমও। এমন নয় যে, যে মস্তিষ্ক জ্ঞানী বাস্তবে তার এক পৃথক অস্তিত্ব আছে এবং যে মস্তিষ্ক জ্ঞান-মাধ্যম তারও। আর এভাবে তারা স্বতন্ত্র তিন অস্তিত্বমান সত্তা। কিন্তু খ্রিস্টধর্মে পিতা, পুত্র ও পাক রূহ খোদার কেবল আপেক্ষিক তিন অবস্থা নয়; বরং এরা স্বতন্ত্র তিন অস্তিত্বমান সত্তা। পিতার বাস্তব অস্তিত্ব আলাদা, পুত্রের বাস্তব অস্তিত্বও আলাদা এবং পাক রূহেরও বাস্তব অস্তিত্ব

---

১. অগাস্টাইন, ২য় খণ্ড, ৭২৯ পৃষ্ঠা।

আলাদা। আপন-আপন ক্রিয়াকলাপ ও বিধানাদির ব্যাপারেও এ অস্তিত্বত্রয় আলাদা-আলাদা মর্যাদা রাখে। স্বয়ং অগাষ্টাইন তার গ্রন্থের শুরুতে লেখেন,

এরূপ মনে করা ঠিক হবে না যে, এই ত্রিত্বিক একত্বই কুমারী মারয়ামের উদরে জন্মগ্রহণ করেছে। যাকে পানতিয়ূস পীলাত ফাঁসি দিয়েছে, তারপর তাকে দাফন করা হয়েছে এবং তারপর তৃতীয় দিনে জীবিত হয়ে জান্নাতে চলে গিয়েছে। কেননা এসব ঘটনা ত্রিত্বিক একত্বের সাথে নয়; বরং কেবল পুত্রের সাথে সম্পৃক্ত। এমনিভাবে এমনও যেন মনে করা না হয় যে, এই ত্রিত্বিক একত্বই ঈসা মাসীহের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন তাকে ব্যাপ্টাইজ (তরীকাবান্দী) করা হচ্ছিল। বস্তুত এটা ছিল পাক রূহের ঘটনা। এমনিভাবে এরূপ মনে করাও বৈধ নয় যে, যখন ঈসা মাসীহকে তরীকাবন্দী করা হচ্ছিল, তখন ত্রিত্বিক একত্ব তাকে ডেকে বলেছিল, তুমি আমার পুত্র। বরং এটা ছিল কেবল পিতার কথা, যা পুত্রকে লক্ষ করে বলা হয়েছিল (অগাষ্টাইন, ২য় খণ্ড, ৬৭২ পৃষ্ঠা)।

অগাষ্টাইনের উল্লিখিত বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, খ্রিস্টধর্ম পিতা, পুত্র ও পাক রূহের মধ্যে কেবল আপেক্ষিক স্বাতন্ত্রের বিশ্বাস পোষণ করে না; বরং তাদেরকে আলাদা আলাদা তিনটি সত্তা মনে করে। অথচ উপরে মস্তিষ্কের যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তাতে জ্ঞানী, জ্ঞাত ও জ্ঞান-মাধ্যম আলাদা তিন সত্তা নয়। বরং একই বাস্তব সত্তার আপেক্ষিক তিন অবস্থা। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলতে পারে না যে, জ্ঞানী মস্তিষ্ক এক পৃথক সত্তা, জ্ঞাত মস্তিষ্কও এক পৃথক সত্তা এবং জ্ঞান-মাধ্যমও অনুরূপ পৃথক সত্তা। আর তা সত্ত্বেও তারা তিন মিলে এক। কিন্তু ত্রিত্ববাদের বিশ্বাসে পিতার অস্তিত্ব আলাদা, পুত্রের অস্তিত্বও আলাদা এবং পাক রূহেরও তাই। আর তা সত্ত্বেও তারা তিন মিলে এক।

মোদ্দাকথা খ্রিস্টধর্মের দাবি হল, খোদার একত্ব যেমন প্রকৃত অর্থে, তেমনি বহুত্ব (ত্রিত্ব)-ও। কিন্তু অগাষ্টাইন যে উদাহরণ দিয়েছেন, তাতে একত্ব তো প্রকৃত অর্থে, কিন্তু বহুত্ব প্রকৃত অর্থে নয়; বরং তা কেবলই আপেক্ষিক। কাজেই তা দ্বারা তিন ও একের প্রকৃত একত্ব প্রমাণিত হয় না। আর আল্লাহ তাআলার এক অস্তিত্বের সাথে যে বহু গুণের সম্পর্ক, তা নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। কেননা সকল ধর্মই তা স্বীকার করে। সকলেরই বিশ্বাস আল্লাহ এক হওয়া সত্ত্বেও বহু গুণের অধিকারী। তিনি যেমন রাহীম (পরম দয়ালু), তেমনি কাহ্হার (পরাক্রমশালী), আলিমুল গায়েব (অদৃশ্যের জ্ঞাতা), কাদির (সর্বশক্তিমান) ইত্যাদি। বহু গুণের কারণে তার একত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হয় না। কেননা গুণাবলীর কারণে কেউ বলে না, রাহীম খোদা এক, কাহ্হার আরেক এবং কাদীর অন্য কেউ। অথচ খ্রিস্টধর্মের দাবি হল, পিতা

Contents

এক পৃথক খোদা, পুত্রও আলাদা খোদা এবং পাক রূহও স্বতন্ত্র আরেক খোদা আর তা সত্ত্বেও তারা তিন খোদা নয়; বরং একই খোদা।

দ্বিতীয় উদাহরণ

অগাষ্টাইন এ রকমেরই আরেকটি উদাহরণ পেশ করেছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেকের মস্তিষ্ক নিজ জ্ঞানকে ভালোবাসে এবং এ ভালোবাসা সম্পর্কে তার জ্ঞানও আছে। সুতরাং ফলাফল দাঁড়াল মস্তিষ্ক নিজ জ্ঞানের প্রতি অনুরাগী এবং অনুরাগ সম্পর্কে জ্ঞানী, অতএব

মস্তিষ্ক নিজ জ্ঞানের জন্য অনুরাগী

মস্তিষ্ক সেই অনুরাগের জন্য জ্ঞানী।

তাহলে এখানে তিনটি জিনিস পাওয়া গেল। মস্তিষ্ক, অনুরাগী ও জ্ঞানী। আর তিনওটি বস্তু একই। কেননা যে মস্তিষ্ক, সে-ই অনুরাগী এবং সে-ই জ্ঞানী। এভাবে তিন মিলে এক হল। ত্রিত্ববাদের বিষয়টাও এ রকমই। খোদার তিন সত্তা। এক তো তার নিজ সত্তা (পিতা), দ্বিতীয় তার কালাম (পুত্র), তৃতীয় তার ভালোবাসা (পাক রূহ)। এই তিন মিলে এক খোদা।

এখানেও একই বিভ্রান্তি। উপমান ও উপমেয়র মধ্যে বৈসাদৃশ্য স্পষ্ট। কেননা মস্তিষ্ক হল একটি সত্তা আর অনুরাগী ও জ্ঞানী হওয়াটা সেই সত্তার দু'টি গুণ, যাদের কোন পৃথক সত্তা ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। অপর দিকে খ্রিস্টধর্মে পিতা এক স্বতন্ত্র সত্তা এবং কালাম (পুত্র) ও ভালোবাসা (পাক রূহ) তার এমন দু'টি গুণ, যারা বস্তুগত স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী। সুতরাং মস্তিষ্কের উদাহরণে একত্ব হল বাস্তবিক এবং বহুত্ব আপেক্ষিক, যা যৌক্তিকভাবে বিলকুল সম্ভব। অপর দিকে ত্রিত্ববাদের বিশ্বাসে বহুত্ব বাস্তবিক এবং তা সত্ত্বেও বাস্তবিক একত্বের দাবি করা হয়েছে, যা যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

খ্রিস্টধর্ম যদি এই বিশ্বাস করত যে, খোদা একক সত্তা এবং কালাম ও মহব্বত তাঁর কেবলই গুণ, যাদের স্বতন্ত্র ও বস্তুগত কোন অস্তিত্ব নেই, তবে মস্তিষ্কের এ উদাহরণ সঠিক হত এবং তখন আর এ বিষয়টা ইসলাম ও খ্রিস্টবাদের মধ্যে বিতর্কিত থাকত না। জটিলতা তো দেখা দিয়েছে এখান থেকেই যে, খ্রিস্টধর্ম এ গুণ দু'টিকে স্বতন্ত্র বস্তুগত অস্তিত্বের অধিকারী বলে বিশ্বাস করে এবং এর প্রত্যেকটিকে খোদা গণ্য করে আবার তাদের দাবি এরা তিন খোদা নয়; বরং তিন মিলে এক খোদা। ত্রিত্ববাদের এ ব্যাখ্যা কিছুতেই মস্তিষ্কের উদাহরণের সাথে খাপ খায় না।

কেননা এ উদাহরণে অনুরাগী ও জ্ঞানীর স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই; বরং তা মস্তিষ্কের দু'টি গুণ মাত্র। অথচ খ্রিস্টধর্মে পুত্র ও পাক রূহ পিতা হতে আলাদা স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী দু'টি সত্তা।

অগাস্টাইন তাঁর গ্রন্থে এ দু'টি উদাহরণকে কেন্দ্র করেই যাবতীয় বৌদ্ধিক আলোচনার ঘোড়া ছুটিয়েছেন, কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন মূল দাবির সাথে এ উদাহরণ দু'টির কোন মিল নেই।

হযরত মাসীহ (আ.) সম্পর্কে খ্রিস্টীয় বিশ্বাস

হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে খ্রিস্টধর্ম যে বিশ্বাসের কথা বলে, তার সারমর্ম হল, খোদার কালাম গুণ (অর্থাৎ পুত্রের সত্তা) মানুষের মুক্তির জন্য হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের মানবীয় দেহ ধারণ করেছিল। হযরত মাসীহ (আ.) যত দিন ইহজগতে ছিলেন এ খোদায়ী সত্তা তার দেহে অধিষ্ঠিত থেকেছিল। পরিশেষে যখন ইয়াহুদীরা তাকে শূলে চড়াল তখন এ খোদায়ী সত্তা তার দেহ থেকে পৃথক হয়ে গেল। কবরে সমাহিত হওয়ার তিন দিন পর তিনি পুনরায় জীবিত হয়ে শিষ্যদেরকে দেখা দিলেন এবং তাদেরকে কিছু উপদেশ দিয়ে আসমানে চলে গেলেন। ইয়াহুদীরা তাকে শূলে চড়ালে তা দ্বারা খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাসী সকলের সেই আদি পাপ মোচন হয়ে গেল, যা তারা হযরত আদম আলাইহিস সালামের ভুলের কারণে জন্মগতভাবে বহন করে আসছিল।

এ বিশ্বাসের মৌলিক ধারা চারটি

(ক) অবতারত্ব ও মনুষ্য দেহধারণে বিশ্বাস (Incarnation)

(খ) ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার বিশ্বাস (Crucifixion)

(গ) পুনর্জীবিত হওয়ার বিশ্বাস (Resurrection)

(ঘ) পাপ মোচনের বিশ্বাস (Redemption)

আমরা এর প্রতিটি ধারা সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করছি।

অবতারত্ব ও দেহ ধারণের বিশ্বাস

অবতারত্ব, অর্থাৎ আল্লাহর কালাম-গুণ যে হযরত ঈসা মাসীহের দেহ-ধারণ করে জগতে এসেছে এ বিশ্বাসটি সর্বপ্রথম পাওয়া যায় ইউহোন্নার ইনজীলে। এ ইনজীলের রচয়িতা হযরত মাসীহ (আ.)-এর জীবনীর সূচনা করেছেন এভাবে যে,

প্রথমেই কালাম ছিলেন। কালাম আল্লাহর সঙ্গে ছিলেন এবং কালাম নিজেই আল্লাহ ছিলেন। আর প্রথমেই তিনি আল্লাহর সঙ্গে ছিলেন (ইওহোন্না ১ : ১-২)।

আরও পরে লেখেন,

সেই কালামই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন। পিতার একমাত্র পুত্র হিসেবে তার যে মহিমা, সেই মহিমা আমরা দেখেছি (ইউহোন্না ১ : ১৪)।

আমরা পূর্বেই বলে এসেছি, খ্রিস্টধর্মে 'কালাম' দ্বারা আল্লাহর 'পুত্র' সত্তাকে বোঝনো হয়, যে নিজেই আল্লাহ। কাজেই ইউহোন্না যা বলেছেন, তার অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহর কালাম গুণ অর্থাৎ তার পুত্র-সত্তা দেহধারণ করে হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। মরিস রিল্টন এ বিশ্বাসটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখেন, ক্যাথলিক বিশ্বাস মতে খোদার সত্তা খোদায়ী বৈশিষ্টাবলীসহই মানুষ হয়ে গেল। অর্থাৎ তিনি আমাদেরই মত অস্তিত্বের গুণাবলী অবলম্বন করলেন, যা স্থান-কালের বন্ধনে আবদ্ধ এবং তিনি একটা কাল পর্যন্ত আমাদের মধ্যে অবস্থান করলেন।[১]

কোন সে শক্তি, যা পুত্র-সত্তাকে ঈসা মাসীহ আলাইহিস সালামের মানব-অস্তিত্বে একীভূত করে দিল? খ্রিস্টানদের মতে সে শক্তি হল পাক রূহ (রূহুল কুদ্স)। পূর্বে বলা হয়েছে, খ্রিস্টধর্মে পাক রূহ দ্বারা আল্লাহর মহব্বত গুণকে বোঝানো হয়। সুতরাং এ বিশ্বাসটির অর্থ দাঁড়াল, নিজ বান্দাদের প্রতি আল্লাহর যেহেতু ভালোবাসা ছিল, তাই তিনি নিজ ভালোবাসা-গুণের মাধ্যমে পুত্র-সত্তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে তিনি মানুষের মূল পাপের প্রায়শ্চিত্ত বনতে পারেন।[২]

মনে রাখতে হবে, খ্রিস্টানদের নিকট হযরত মাসীহ রূপে পুত্র-সত্তার আত্মপ্রকাশের অর্থ এ নয় যে, পুত্র ঈশ্বরত্ব ত্যাগ করে মানুষে পরিণত হয়েছিল। বরং এর অর্থ, পূর্বে তিনি কেবল ঈশ্বর ছিলেন, এখন সেই সাথে মানুষও হলেন। সুতরাং এ আকীদা অনুযায়ী হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম একই সঙ্গে ঈশ্বরও ছিলেন এবং মানুষও। আলফ্রেড এ. গারভে এ কথাটিকেই নিম্নরূপ ব্যক্ত করেন,

তিনি (হযরত মাসীহ) প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরও ছিলেন এবং মানুষও। তাঁর এ দুই অবস্থার কোনও একটিকে অস্বীকার বা তাঁর অস্তিত্বে উভয় অবস্থার সম্মিলন হওয়াকে অস্বীকার করার ফলেই বিভিন্ন বিদআত ও নব্য চিন্তাধারার উদ্ভব হয়েছে। আরিউসের বিরুদ্ধে এথনাশীস এ মতের জোরালো সমর্থন জানিয়েছিলেন। সুতরাং অনুমোদিত বিশ্বাস এটাই যে, হযরত মাসীহের একই ব্যক্তিত্বের মধ্যে দুটি সত্তার সম্মিলন ঘটেছিল।[৩]

---

১. Studies in Christiam Doctrine P. 28

২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৪।

৩. এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন এন্ড এথিক্স ৩য় খণ্ড, ৫৮৬ পৃষ্ঠা, নিবন্ধ Christianity.

একই সঙ্গে মানুষ হওয়ার কারণে হযরত মাসীহ (আ.)-এর মর্যাদা আল্লাহর নিচে ছিল। এ কারণেই তিনি বলেছিলেন,

পিতা আমার চেয়ে বড় (ইওহোন্না ১৪ : ২৮)। আর মানুষ ছিলেন বলেই তাঁর মধ্যে যাবতীয় মানবিক অবস্থা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ঈশ্বর হিসেবে তিনি পিতার সমমর্যাদার ছিলেন, যে কারণে ইনজীলে তাঁর উক্তি বিধৃত হয়েছে,

আমি ও পিতা একই (ইউহোন্না ১০ : ৩১)।

অগাষ্টাইন লেখেন, খোদা হিসেবে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন আবার মানুষ ছিলেন বিধায় তিনি নিজে সৃষ্ট ছিলেন।[১]

বরং অগাষ্টাইন তো এ পর্যন্ত লেখেন যে,

বান্দার রূপ ধারণ করতে গিয়ে ঈশ্বর যেহেতু নিজ ঈশ্বরত্বের মর্যাদা বিলোপ করেননি, যে মর্যাদায় তিনি পিতার সমান, সেহেতু প্রত্যেকেই ধারণা করতে পারে, ঈসা মাসীহ ঈশ্বর রূপে আপনি আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আবার মানব হিসেবে তিনি আপনি আপনা অপেক্ষা নিম্ন মর্যাদার।[২]

এখানে প্রশ্ন জাগে, এটা কি করে সম্ভব যে, এক ব্যক্তি খোদাও হবেন আবার মানুষও? স্রষ্টাও হবেন এবং সৃষ্টিও? উত্তমও হবেন আবার অধমও? ত্রিত্ববাদের মত এ প্রশ্নও শত-শত বছর আলোচনা-পর্যালোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে। এ প্রশ্নের উত্তরে এত বেশি বই-পুস্তক লেখা হয়েছে যে, এক পর্যায়ে খ্রিস্টবিদ্যা (Christology) নামে স্বতন্ত্র এক বিদ্যাই গড়ে ওঠেছে।

এ ব্যাপারে রোমান ক্যাথলিক চার্চের অবস্থান হল এই যে, তারা এ প্রশ্নের উত্তরে সাধারণত ইউহোন্নার ইনজীল থেকে বিভিন্ন উক্তি উদ্ধৃত করেন এবং সেগুলোকেই দলিল হিসেবে পেশ করেন। যেন এ আকীদাটি নকলী (বর্ণনা নির্ভর) দলিল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। আর যুক্তি-বুদ্ধির ক্ষেত্রে তারা যা করে, তা এই যে, অবতারত্বের বিষয়টাকে মানুষের বুঝ-সমঝের নিকটবর্তী করে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন রকমের উদাহরণ পেশ করে। কেউ বলেন, খোদা ও মানুষের এই একীভবন আংটি ও তাতে অঙ্কিত নকশার একীভবনের মত।[৩]

কেউ বলেন, এর উদাহরণ এ রকম, যেমন আরশিতে কোন ব্যক্তির আকৃতি প্রতিবিম্বিত হয়।

---

১. অগাস্টাইন, ২য় খণ্ড, ৬৭৮ পৃষ্ঠা।
২. অগাস্টাইন, ২য় খণ্ড, ৬৭৮ পৃষ্ঠা।
৩. দেখুন এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ২২ খণ্ড, ৪৭৯ পৃষ্ঠা, নিবন্ধ (Trenity), মুদ্রণ ১৯৫০ খ্রি.।

অর্থাৎ আংটি ও তাতে অঙ্কিত নকশা যেমন দুই বস্তু হওয়া সত্ত্বেও একই অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যেভাবে আরশিতে কোন আকৃতি প্রতিবিম্বিত হওয়ার দ্বারা একই অস্তিত্বে আরশি ও প্রতিবিম্ব এ দুইয়ের সম্মিলিন ঘটে, ঠিক এভাবেই পুত্র-সত্তা হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের মানবীয় অস্তিত্বে একীভূত হয়ে গিয়েছিল এবং এ কারণে তাঁর অস্তিত্বেও একই সঙ্গে দুই বস্তু মিলিত হয়েছিল। এক তো ঐশ্বরিক সত্তা এবং দ্বিতীয় মানবীয় সত্তা। কিন্তু এ উদাহরণ অধিকাংশ খ্রিস্টান চিন্তাবিদ প্রত্যাখ্যান করেছেন।[১]

অতঃপর বিভিন্ন খ্রিস্টান চিন্তাবিদ ও দার্শনিক যেভাবে এ প্রশ্নটির সমাধান দিতে চেষ্টা করেছেন, আমরা নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করছি।

যারা মাসীহকে খোদা মানতে অস্বীকার করেছে

তাদের মধ্যে একটি দল তো এমন, যারা এ প্রশ্নের জবাব দিতে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করেছে, হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামকে খোদা বলাটাই ভুল। তিনি কেবল মানুষই ছিলেন। সুতরাং একই ব্যক্তির খোদা ও মানুষ হওয়া কি করে সম্ভব –এ প্রশ্নই আসে না।

মিষ্টার জেমস ম্যাককিনন (Jams Mackinon) রচিত From Christ to Constantine একখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি এ মতবাদ ও এর প্রবক্তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী এ মতবাদের গোড়াপত্তনকারী হলেন পৌল অফ সামুসাটা[২] (Paul of Semosata) ও লুসিয়ান (Lucian)।[৩]

---

১. কেননা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় রোমান ক্যাথলিক চার্চের এ ব্যাখ্যা মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা আংটিতে যে নকশা আঁকা থাকে, তা বাহ্যিকভাবে আংটির সাথে মিলিত থাকলেও বাস্তবে তা একটা আলাদা জিনিস। এ কারণেই কেউ আংটিকে বলবে না যে, এটা নকশা এবং নকশাকেও বলবে না যে, এটা আংটি। অথচ খ্রিস্টধর্মে পুত্র-সত্তা হযরত মাসীহের শরীর ধারণের পর তাকে খোদা সাব্যস্ত করে থাকে এবং খোদা সম্পর্কে বলে থাকে তিনি মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। এমনিভাবে আরশিতে যায়দের প্রতিবিম্ব দেখা গেলে সেটা আরশি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। এ কারণেই কেউ আরশিকে যায়েদ বলে না এবং যায়েদকেও আরশি বলে না। কিন্তু খ্রিস্টধর্মে হযরত ঈসা মাসীহকে খোদা এবং খোদাকে মানুষ বলা হয়ে থাকে। সুতরাং এ উদাহরণ দু'টি কিছুতেই অবতারত্বের আকীদার সাথে খাপ খায় না।

২. আল্লামা ইবনে হাযম তার নাম লিখেছেন বূলাস আশ-শামশাতী (আল-মিলাল ওয়ান নিহাল ১ম খণ্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা)। ইনি ২৬০ খ্রি. থেকে ২৭২ খ্রি. পর্যন্ত আনতাকিয়ার বিশপ ছিলেন। দেখুন ব্রিটানিকা ১৭ খণ্ড, ৩৯৮ পৃষ্ঠা।

৩. লুসিয়ান (মৃ. ৩১২ খ্রি.) একজন প্রসিদ্ধ খ্রিস্টান ধর্মযাজক। তিনি সারা জীবন সংসার বিরাগী হয়ে কাটিয়েছেন। তাঁর চিন্তাধারা ছিল পল শামশাতী ও আরিয়ূসের চিন্তাধারার মাঝামাঝি। তিনি শামশাতায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু জীবনের সিংহভাগ সময় কাটিয়েছেন আনতাকিয়ায়। দেখুন ব্রিটানিকা ১৪ খণ্ড, ৪৬০ পৃষ্ঠা, নিবন্ধ লুসিয়ান।

মিষ্টার ম্যাককিনন লেখেন,

উভয়ের মতে ঈসা মাসীহ একজন মাখলুক ছিলেন। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল, পৌলের মতে তিনি কেবলই একজন মানুষ ছিলেন, যার মধ্যে খোদার নৈর্ব্যক্তিক বুদ্ধি আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু লূসিয়ান ও তার সহমত পোষণকারীদের মত হল, তিনি ছিলেন এক আসমানী সত্তা। আল্লাহ যাকে নাস্তি থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছিলেন এবং যার মধ্যে আল্লাহর বুদ্ধি ব্যক্তিক রূপে প্রতিফলিত হয়েছিল। সুতরাং হযরত মাসীহের অস্তিত্বে অধিষ্ঠানকালে তা মানবীয় দেহে প্রকাশ লাভ করত, কিন্তু তার আত্মা মানবীয় ছিল না। তার মিশন ছিল পিতার বার্তা প্রচার করা। বস্তুত তিনি সাধারণভাবে খোদা ছিলেন না এবং অনাদি ও অনন্ত সত্তাও না।[১]

অর্থাৎ পৌল তো আদপে অবতারত্বের বিশ্বাসকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং ব্যাখ্যা দান করেছেন যে, হযরত মাসীহের অস্তিত্বে খোদার অধিষ্ঠানের অর্থ হল, খোদার পক্ষ হতে তাকে এক বিশেষ বুদ্ধি দান করা হয়েছিল। আর লূসিয়ান অবতারত্বের বিশ্বাসকে সম্পূর্ণরূপে রদ করেননি। তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে, আল্লাহর জ্ঞানবত্তা তার অস্তিত্বে প্রবেশ লাভ করেছিল। কিন্তু তার মতে সে জ্ঞানবত্তার প্রবেশ এভাবে ঘটেনি যে, সে কারণে তাঁকে খোদা, স্রষ্টা, কিংবা নিত্য ও অনন্ত সত্তা বলা যাবে। বরং আল্লাহর জ্ঞান হযরত মাসীহের অস্তিত্বে মিশে যাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহই যথারীতি স্রষ্টা এবং মাসীহ (আ.) যথারীতি সৃষ্টিই রয়ে গেছেন।

খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর একজন খ্যাতনামা চিন্তাবিদ হলেন আরিউস (Arius)। তিনি পৌল ও লুসিয়ানের মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর সমকালীন চার্চের বিরুদ্ধে এক জবরদস্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হন এবং নিজ মতবাদের ঝাপটায় সমগ্র খ্রিস্টান জগতকে কাঁপিয়ে দেন। ম্যাককিননের বর্ণনায় তার মতবাদের সারমর্ম নিম্নরূপ,

আরিউসের জোর দাবি ছিল, কেবল আল্লাহই নিত্য ও চিরন্তন সত্তা। তার সমকক্ষ নয় কেউ। তিনিই পুত্রকে সৃষ্টি করেছেন। এর আগে পুত্র ছিলেন অস্তিত্বহীন। সুতরাং পুত্র যেমন চিরন্তন সত্তা নন, তেমনি খোদাও অনাদিকাল থেকে পিতা নন। কেননা একটা সময় ছিল, যখন পুত্রের কোন অস্তিত্ব ছিল না। পিতা হতে পুত্র সম্পূর্ণ পৃথক এক সত্তা এবং তাঁর অস্তিত্বে পরিবর্তন আসা সম্ভব। তিনি প্রকৃত অর্থে খোদা নন। অবশ্য তার মধ্যে 'পরিপূর্ণ' হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে।

১. From Christ to Constantine, London 1936.

তিনি এক পরিপূর্ণ সৃষ্টি। তিনি মূর্তিমান বুদ্ধি, যা এক প্রকৃত মানবদেহে বিদ্যমান। এভাবে আরিউসের মতে মাসীহের সত্তা দ্বিতীয় পর্যায়ের ঈশ্বরত্বের ধারক। কিংবা বলুন, তিনি অর্ধ দেবতা (Demi god), যিনি ঐশ্বরিক ও মানবিক উভয় প্রকার গুণের একটা মাত্রা ধারণ করেন। কাজেই সর্বোচ্চ অর্থে তিনি মোটেই ঈশ্বর নন।[১]

যেন তাঁর দৃষ্টিতে হযরত মাসীহের মর্যাদা ছিল এ রকম যে,

بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختصر

'খোদার পরে তুমিই সেরা, সংক্ষেপে মোরা এই জানি।'

আরিউস এই মতবাদ প্রচার করলে তার আমলেই বিশেষভাবে পূর্বাঞ্চলীয় গীর্জাসমূহে এটা অসাধারণ সমাদর লাভ করেছিল। এমনকি তাঁর নিজের দাবি ছিল, 'পূর্বাঞ্চলীয় সবগুলো গীর্জা আমার সমর্থক।'

তবে ইসকানদরিয়া (আলেকজান্দ্রিয়া) ও আনতাকিয়ার কেন্দ্রীয় চার্চগুলোর উপর আলেকজাণ্ডার ও এথানাসিওস (Athanasios) প্রমূখের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, যারা প্রশ্নটির এমন কোন সমাধান মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না, যা দ্বারা হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের ঈশ্বরত্বে বিন্দুমাত্র আঁচড় লাগে কিংবা অবতারত্বের আক্ষরিক অর্থ কোনওভাবে ক্ষুন্ন হয়। সুতরাং ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট কুসতানতীন নিকিয়া নামক স্থানে যে কাউন্সিল ডাকেন, তাতে আরিউসের মতবাদকে কেবল প্রত্যাখ্যানই করা হয়নি; বরং খোদ আরিউসকে নির্বাসিত পর্যন্ত করা হয়।

পৌলীয় সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা

খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে পৌলিয় সম্প্রদায় (Paulicians)-এর আবির্ভাব ঘটল। তারা হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে একটি মাঝামাঝি মত প্রকাশ করল। তারা বলল, হযরত মাসীহ খোদা নয়; বরং ফেরেশতা ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে মানুষের সংশোধনকল্পে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং তিনি হযরত মারয়াম (আ.)-এর উদরে মানুষের আকৃতিতে জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহ তাআলা যেহেতু তাকে বিশেষ মাহাত্ম্য দান করেছিলেন তাই তাকে 'আল্লাহর পুত্র' বলা হয়। এ সম্প্রদায়ের মতবাদ এশিয়া মাইনর ও আরমেনিয়া অঞ্চলেই বেশি প্রচার লাভ করেছিল।[২] কিন্তু এ মত ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়নি।

---

১. প্রাগুক্ত।

২. এ সম্প্রদায় সম্পর্কে আরও জানতে চাইলে দেখুন, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ১০ খণ্ড, ৩৯৭ পৃষ্ঠা, নিবন্ধ Paulicians.

কেননা হযরত মাসীহ ফেরেশতা ছিলেন বলে কোন নকলী দলিল (ঐশী নির্দেশনা) ছিল না।

নাসতূরী সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা

পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নাসতূরী সম্প্রদায় এ প্রশ্নের সমাধানে এগিয়ে আসে। এ সম্প্রদায়ের নেতার নাম নাসতূরিয়ূস (মৃ. ৪৫১ খ্রি.)। তিনি এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য একটি নতুন দর্শন পেশ করেন। তিনি বলেন, হযরত মাসীহকে একক ব্যক্তিত্ব ধরে নেওয়ার কারণেই এত সব জটিলতা দেখা দিয়েছে। বলা হচ্ছে, তিনি একক ব্যক্তি-সত্তা হয়েও দুই সত্তার ধারক ছিলেন– মানবীয় সত্তা ও ঐশ্বরিক সত্তা। প্রকৃতপক্ষে তিনি খোদা ছিলেন একথা যেমন সত্য, তেমনি তাঁর মানুষ হওয়াটাও সত্য। তবে একথা স্বীকার্য নয় যে, তিনি একই ব্যক্তিসত্তা ছিলেন, যার মধ্যে দুই বাস্তবতা একীভূত হয়েছিল। বরং হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম দুই ব্যক্তি-সত্তার ধারক ছিলেন; এক তো পুত্র আর দ্বিতীয় মাসীহ অর্থাৎ এক ইবনুল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র আর দ্বিতীয় ইবনে আদম বা মনুষ্য-পুত্র। পুত্র হলেন খালেস খোদা আর মাসীহ খালেস মানুষ।

রোমান ক্যাথলিক চার্চের সিদ্ধান্ত হল, একই ব্যক্তির ভেতর দুই সত্তার সমাবেশ ঘটেছিল। এর বিপরীতে নাসতূরিয়ূসের মতে ব্যক্তিও দুই এবং সত্তাও দুই। সুতরাং ৪৩১ খ্রিস্টাব্দে 'আফিস' নামক স্থানে সবগুলো চার্চের এক প্রতিনিধি সম্মেলন ডাকা হয় এবং তাতে নাসতূরিয়ূসের মতবাদকে জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়। এমনকি এ মতবাদ প্রচারের দায়ে নাসতূরিয়ূসকে বন্দী করা হয় ও নির্বাসন দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে তার অনুসারীদেরকে বিদআতী নামে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু তারপরও এ সম্প্রদায় এখনও পর্যন্ত টিকে আছে। নাসতূরিয়ূসের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয় ড. বেথুন বেকার (Bethane Baker)-এর ভাষায় তা নিম্নরূপ–

'সে আমাদের প্রভুর প্রভুত্ব ও মানবীয় সত্তার মধ্যে এতটা পার্থক্য সৃষ্টি করেছে, যদ্দরুণ তা স্বতন্ত্র দু'টি অস্তিত্বে পরিণত হয়ে গেছে। সে আল্লাহর কালিমাকে ইয়াসূ থেকে এবং আল্লাহর পুত্রকে মনুষ্য পুত্র হতে আলাদা সত্তা বানিয়ে ফেলেছে।'[১]

---

১. পরবর্তীকালীন কোন কোন গবেষক যেমন বেথুন বেকার প্রমূখের ধারণা, নাসতূরিয়ূসের প্রতি এ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তহীন। আসলে তার দৃষ্টিভঙ্গি ভালোভাবে উপলব্ধি করা হয়নি। কিন্তু প্রফেসর মরিস রিল্টন প্রমূখ এ ধারণা খণ্ডন করেন এবং তারা আফিস কাউন্সিলের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করেছেন। দেখুন Studes on Christion Doctrine P. 102.

ইয়াকূবী সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা

ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দে ইয়াকূবী সম্প্রদায় (Eacobite Charch) আত্মপ্রকাশ করে। এখনও পর্যন্ত শাম ও ইরাকে তাদের কিছু অনুসারী অবশিষ্ট আছে। এ সম্প্রদায়ের নেতার নাম ইয়াকূব বারদাঈ (Jacabus Baradeus ৫৪১–৫৭৮ খ্রি.) তার মত ছিল আরিউস ও নাসতূরিয়ূস উভয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। নাসতূরিয়ূসের মতে তো হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের মধ্যে দুই ব্যক্তি ও দুই সত্তার সমাবেশ ঘটেছিল। কিন্তু ইয়াকূব বলেন, হযরত মাসীহ যে কেবল একই ব্যক্তি ছিলেন তাই নয়; বরং সত্তাও ছিল মাত্র একটিই। আর তা ছিল ঐশ্বরিক সত্তা। অর্থাৎ তিনি কেবল ঈশ্বরই ছিলেন, যদিও আমরা তাকে মানবরূপে দেখতে পেতাম। দি ওয়ার্লড ফ্যামিলি এনসাইক্লোপিডিয়ায় এ সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা বর্ণিত হয়েছে নিম্নরূপ,

এ সম্প্রদায়ের মতে মাসীহের ভেতর ঐশ্বরিক ও মানবীয় সত্তা এভাবে একীভূত হয়েছিল যে, তা পুরোপুরি একই সত্তায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল।[১]

ইয়াকূব বারদাঈর অনুসারীরা ছাড়াও কোন কোন গোষ্ঠী এ মতবাদ গ্রহণ করেছিল। এসব গোষ্ঠীকে মোনূফীসিটস (Monophysites) নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। সপ্তম খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এসব গোষ্ঠীর বেশ প্রভাব ছিল।[২]

সর্বশেষ ব্যাখ্যা

উপরের আলোচনা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, হযরত মাসীহ (আ.)-এর অবতারত্বের ব্যাখ্যা দান ও এ বিশ্বাসকে যুক্তি-বুদ্ধির কাছে নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন খ্রিস্টান চিন্তাবিদের পক্ষ থেকে অনেক রকম চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আপনি লক্ষ্য করেছেন, এর প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাই চালানো হয়েছে রোমান ক্যাথলিক চার্চের আকীদা-বিশ্বাস থেকে সরে গিয়ে, যে কারণে কেন্দ্রীয় চার্চের দায়িত্বশীলগণ তাকে বিদআত বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। বাকি থাকল প্রশ্নের আসল উত্তর। তো এ সম্পর্কে গোঁড়াপন্থীদের পক্ষ থেকে তো সর্বদা একথাই বলা হয়েছে যে,

---

১. দি ওয়ার্ড ফ্যামিলি এনসাইক্লোপিডিয়া ১০ খ, ২৬৩৮ নিউইয়র্ক ১৯৫৭ খৃ.।

২. এটা ইসলামের প্রাথমিক কালের কথা। এ সময় সমগ্র খ্রিস্টান জগতে এ গোষ্ঠীটি ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। তাদের কারণে শাম ও ইরাকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই থাকত। (দেখুন ব্রিটানিকা ১৫ খণ্ড, ৭৩০ পৃষ্ঠা, নিবন্ধ Monophysites)। এর দ্বারা বোঝা যায়, কুরআন মাজীদে খুব সম্ভব এদেরই প্রতি ইশারা করে বলা হয়েছে–

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ بْنُ مَرْيَمَ

'অবশ্যই কাফের হয়ে গেছে তারা, যারা বলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তো মাসীহ ইবনে মারইয়াম। (সূরা মায়েদা : ৭২)

অবতারত্বের আকীদাও মূলত একটি গুপ্ত রহস্য, যা বিশ্বাস করা অপরিহার্য, কিন্তু বোঝা সম্ভব নয় (দেখুন ব্রিটানিকা)।

কিন্তু তাদের একথা কোন সদ্বিবেচক ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি, যে কারণে শেষ যুগে এসে অবতারত্বের বিশ্বাসকে যৌক্তিক প্রমাণ করার জন্য আরও একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাখ্যার একটা বৈশিষ্ট্য হল– এতে হুবহু রোমান ক্যাথলিক দৃষ্টিভঙ্গির পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছে এবং সেটাকেই ঠিক-ঠিক বহাল রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও এ ব্যাখ্যা কোন কোন প্রাচীন চিন্তাবিদও পেশ করেছিলেন, কিন্তু প্রফেসর মরিস রিল্টনই তা বেশি স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেন,

(রোমান ক্যাথলিক চার্চ যার প্রবক্তা) এ রকম অবতারত্ব ভালোভাবেই বুঝে নেওয়া সম্ভব, যদি এ কথাটা আমরা স্মরণে রাখি যে, এর জন্য সেই তখনই রাস্তা প্রস্তুত করা হয়েছিল যখন প্রথম মানুষ (হযরত আদম আ.)-কে আল্লাহ-সদৃশ করে সৃষ্টি করা হয়। কেননা এর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায়, খোদার মধ্যে সর্বদাই মানবীয় একটা উপাদান বিদ্যমান ছিল এবং সেই মানবীয় উপাদানকেই আদম- সন্তানদের জন্য সৃষ্ট অবকাঠামোর মধ্যে অসম্পূর্ণরূপে বিম্বিত করে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং খোদার মনুষ্যত্বই সত্যিকারের মনুষ্যত্ব। এটা ভিন্ন কথা যে, খালেস ও অবিমিশ্র মনুষ্যত্ব কেবল মানুষেরই মধ্যে বিদ্যমান। কেননা সে এক মাখলুক এবং সে অসম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী। ফলে সে কখনও ঈশ্বরের রূপ গ্রহণ করতে পারবে না, তাতে তার মধ্যে ঐশ্বরিকতা যত কালই অবস্থান করুক না কেন।

সুতরাং খোদা যখন মানুষ হয়ে আসলেন, তখন তিনি যে মনুষ্যত্ব প্রকাশ করলেন, তা সৃষ্ট মনুষ্যত্ব ছিল না, যা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান; বরং তা ছিল সত্যিকারের মনুষ্যত্ব, যা কেবল খোদারই নিকট রয়েছে এবং যা-সদৃশ করে আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে ...। পরিশেষে এর অর্থ দাঁড়াল এই যে, ইয়াসূ মাসীহের মনুষ্যত্ব সেই মনুষ্যত্ব নয়, যা আমরা আমাদের অস্তিত্বে অনুভব করি; বরং তা ছিল ঈশ্বরের মনুষ্যত্ব; আমাদের মনুষ্যত্বের সাথে তার প্রভেদ ঠিক সেই রকমের যেমনটা আছে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে।[১]

এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী যদিও মাসীহের মধ্যে ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্ব এই দুই বাস্তবতা একীভূত হয়েছিল, কিন্তু তার সে মনুষ্যত্বও ছিল ঐশ্বরিক মনুষ্যত্ব, আমাদের হেন মনুষ্যত্ব নয়। কাজেই একই অস্তিত্বে যুগপৎ উভয়ের বিদ্যমানতা অসম্ভব নয়।

এই হচ্ছে সেই ব্যাখ্যা, যা প্রফেসর মরিস রিল্টনের কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি যুক্তিসম্মত এবং সব রকম প্রশ্ন ও আপত্তি থেকে মুক্ত। সেই সঙ্গে এর দ্বারা ক্যাথলিক বিশ্বাসেও কোন আঘাত লাগে না।

১. Studies in Christain Doctrin. P. 133, 144

কিন্তু এ ব্যাখ্যারও ওজন কতটুকু, তা চিন্তাশীল মাত্রই উপলব্ধি করতে পারেন।[১]

শূলবিদ্ধ হওয়ার বিশ্বাস (Crucificion)

হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে খ্রিস্টধর্মের দ্বিতীয় বিশ্বাস হল, ইয়াহুদীরা পানতিয়ুস পীলাত (Pontius Pilatus)-এর আদেশে শূলে চড়িয়েছিল এবং এভাবেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। এ বিশ্বাস প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে, খ্রিস্টানদের অধিকাংশ গোষ্ঠীর মতেই এ ফাঁসি পুত্র-সত্তাকে দেওয়া হয়নি, যাকে তারা খোদা বলে বিশ্বাস করে; বরং পুত্র-সত্তার যে মানবীয় প্রকাশ, সেই মাসীহ আলাইহিস সালামকেই ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল; একজন মানুষ হিসেবে যিনি খোদা নন, বরং মাখলুক।[২]

---

১. এ ব্যাখ্যার ভিত্তি এই ধারণার উপর যে, অনাদিকাল থেকেই ঈশ্বরের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্ব বিদ্যমান। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই ঐশ্বরিক মনুষ্যত্ব কী জিনিস? তাঁর মধ্যেও কি ক্ষুধা, পিপাসা, আনন্দ, বিষাদ প্রভৃতি মানবীয় অবস্থাসমূহ বিদ্যমান আছে, না কি নেই? যদি থাকে তবে তার অর্থ দাঁড়াবে, খোদারও ক্ষুধা ও পিপাসা লাগে, তিনিও আনন্দ-বিষাদ বোধ করেন এবং সৃষ্টির যাবতীয় অবস্থা তাঁকেও স্পর্শ করে (নাউযুবিল্লাহ)। বলাবাহুল্য আল্লাহ সম্পর্কে এ ধারণা সম্পূর্ণ গলত, যা সাধারণ জ্ঞান দ্বারাই বোঝা যায়। রোমান ক্যাথলিক চার্চও এরূপ বিশ্বাস পোষণ করে না। আর যদি ঐশ্বরিক মনুষ্যত্ব এসব মানবীয় অবস্থা থেকে মুক্ত থাকে, তবে প্রশ্ন আসে, হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের মধ্যে কেন এগুলো বিদ্যমান ছিল? তাঁর কেন ক্ষুধা লাগত? তাঁর কেন দুঃখ-বেদনা বোধ হত এবং (খ্রিস্টীয় বিশ্বাস অনুযায়ী) শূলে চড়ানো হলে তিনি কষ্টে কেন চিৎকার করছিলেন? মরিস মিল্টনের ভাষ্য অনুযায়ী তাঁর মনুষ্যত্ব যদি আমাদের মত না হয়, বরং তা হয় ঐশ্বরিক মনুষ্যত্ব, যা সমস্ত মানবীয় অবস্থা থেকে মুক্ত ও পবিত্র, তবে এসব তার কেন দেখা দিত?

অতঃপর এ ব্যাখ্যায় মানুষকে খোদা-সদৃশ্য বানিয়ে সৃষ্টি করার এই আজব অর্থ বয়ান করা হয়েছে যে, খোদার মধ্যে আগে থেকেই মনুষ্যত্বের এক উপাদান বিদ্যমান ছিল এবং সেই উপাদানের একটা প্রতিবিম্ব মানুষের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ তৌরাতের পয়দায়েশ অধ্যায়ের যে আয়াত থেকে এ ধারণা নেওয়া হয়েছে, তা যদি বাস্তবিকই এলহামী হয়ে থাকে, তবে তার অর্থ বড়জোর এই যে, আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়েছেন, ভালো-মন্দে প্রভেদ করার যোগ্যতা দিয়েছেন এবং ইষ্ট-অনিষ্ট উভয় করার শক্তি দিয়েছেন। ক্যাথলিক ধর্মযাজকগণও প্রাচীন কাল থেকে আয়াতটির এ অর্থই বর্ণনা করে আসছেন। সেন্ট অগাষ্টাইন তার প্রসিদ্ধ রচনা 'দি ষ্টে অফ গড'-এর ১২ শ' অধ্যায়ের ২৩ পরিচ্ছেদে লেখেন, অতঃপর খোদা মানুষকে আপনার সদৃশ করে বানালেন। তা এভাবে যে, তিনি মানুষের জন্য এমন এক আত্মা সৃষ্টি করলেন, যার ভেতর বোধ-বুদ্ধির যোগ্যতা গচ্ছিত রাখা হয়েছে, যাতে সে পৃথিবীর এবং সমুদ্র ও অন্তরীক্ষের সমস্ত সৃষ্টি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়ে যায়, যাদেরকে এ যোগ্যতা দান করা হয়নি। (অগাষ্টাইন, ২য় খণ্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা)

২. হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামকে শূলে চড়ানোর ঘটনা প্রচলিত চারও ইনজীলে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু কুরআন মাজীদ দৃঢ়তার সাথে তা রদ করেছে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, সেটা আসলে তাদের একটা বিভ্রম। প্রকৃতপক্ষে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে জীবিত আসমানে তুলে নেওয়া হয়েছে। পাঠক যখন এ রচনার দ্বিতীয় অধ্যায় পড়বেন, তখনই কুরআনী বর্ণনার সত্যতা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারবেন। আর প্রচলিত চার ইনজীলই বা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য তা জানতে পারবেন ইজহারুল

পবিত্র ক্রুশ

পবিত্র ক্রুশ

খ্রিস্টানদের যেহেতু বিশ্বাস হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল, তাই তাদের কাছে ক্রুশচিহ্ন (+) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এস্থলে বিষয়টা প্রাসঙ্গিক বোধ হওয়ায় সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাচ্ছে।

যতদূর জানা যায় খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত ক্রুশ প্রতীকটি সার্বজনীন মর্যাদা লাভ করেনি। সম্রাট কুসতানতীন সম্পর্কে প্রসিদ্ধ, ৩১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি তার এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে যুদ্ধকালে (খুব সম্ভব স্বপ্নে) আকাশে একটি ক্রুশচিহ্ন দেখতে পেয়েছিলেন। তারপর ৩২৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে তার মা সেন্ট হেলেনার হাতে কোথাও থেকে একটি ক্রুশ আসে, যেটি সম্পর্কে মানুষের ধারণা ছিল, এটিই সেই ক্রুশ, যাতে হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামকে শূলে দেওয়া হয়েছিল (যেমনটা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিশ্বাস)। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই খ্রিস্টানগণ প্রতি বছর ৩রা মে 'ক্রুশ প্রাপ্তি' নামে উৎসব পালন করে থাকে। এভাবে কালক্রমে ক্রুশ-চিহ্ন খ্রিস্টানদের ধর্মীয় প্রতীকে (Symbol) পরিণত হয়। তারা প্রতিটি কাজে এ প্রতীক ব্যবহার করে থাকে। প্রখ্যাত খ্রিস্টান পণ্ডিত টারটুলিয়ান (Tertullianus) লেখেন,

আমরা প্রতিটি সফরে, গৃহে অবস্থানকালে, যাতায়াত কালে, জুতা খোলা, গোসল করা, খানা খাওয়া, বাতি জ্বালানো, শোওয়া, ওঠা-বসা, মোটকথা

হক গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় পড়লে। এখানে শুধু এতটুকু ইশারা করে দেওয়া জরুরি বোধ হচ্ছে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষের উৎকর্ষ লাভের সাথে সাথে কুরআন মাজীদের সত্যতা আপনা-আপনিই ক্রমশ স্পষ্টতর হচ্ছে। বছর কয়েক আগে বার্নাবাশের ইনজীল খুঁজে পাওয়া গেছে। বার্নাবাশ এতে দ্ব্যর্থহীনভাবে এ সত্য উচ্চারণ করেছেন যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে নয়; বরং তাঁর স্থানে এহুদা ইস্কারিয়োতকেই শূলে দেওয়া হয়েছিল। (আমরা ইজহারুল হকের শেষ অধ্যায়ে 'সুসংবাদসমূহের বর্ণনা' প্রসঙ্গে একটি দীর্ঘ টীকা লিখেছি। তাতে এ ইনজীলের বিভিন্ন উদ্ধৃতি দ্বারা এর মৌলিকতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।) বার্নাবাশের ইনজীল সম্পর্কে খ্রিস্টানদের দাবি হল, এটি কোন মুসলিম ব্যক্তির রচনা। কিন্তু হালেই ইনজীলের আরও একটি সংকলন আবিষ্কৃত হয়েছে, যা হাওয়ারী পিতরের সংকলিত বলে প্রকাশ। এতে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে, শূলে চড়ানোর কিছু আগেই হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামকে আসমানে তুলে নেওয়া হয়েছিল। পিতরের এ উক্তি হেলম্যান স্ট্রেটর তার The Four Gospels নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৫, নিউইয়র্ক ১৯৬১ খ্রি.) উদ্ধৃত করেছেন। স্ট্রেটর যদিও এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, এখানে মাসীহ বলে তাঁর ঐশ্বরিক সত্তা বোঝানো হয়েছে। কিন্তু পিতরের ইনজীলে যে শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েছে তা একথা প্রমাণ করে না। বরং তা ছাড়া এর বিপরীতটাই প্রমাণ হয়। কেননা তাতে আসমানে তুলে নেওয়ার বিষয়টা বোঝানোর জন্য কর্মবাচ্য ক্রিয়াপদ (Passive Voice) ব্যবহৃত হয়েছে। স্বয়ং স্ট্রেটরই এরূপ উদ্ধৃত করেছেন (He Was taken off অর্থাৎ তাকে উর্ধ্বে তুলে নেওয়া হয়েছে)। এর দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায়, তাকে উর্ধ্বে উত্তোলনকারী ছিল অন্য কেউ। বলাবাহুল্য, যদি তাঁর ঐশ্বরিক সত্তাই বোঝানো হত, তবে বলা হত 'তিনি আসমানে উঠে যান'। কেননা খোদাকে ওঠানোর জন্য অন্য কোন কর্তার দরকার পড়ে না।

যে-কোনও রকমের কাজ-কর্ম ও গতি-যতিকালে নিজেদের চেহারায় ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে থাকি।[১]

প্রশ্ন হচ্ছে, খ্রিস্টধর্মে ক্রুশের এ মর্যাদার কারণ কী, যখন তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী এ বস্তুটির মাধ্যমেই হযরত মাসীহ্ আলাইহিস সালামকে চরম নির্যাতন করা হয়েছিল? কোন খ্রিস্টান পণ্ডিতের লেখায় এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের চোখে পড়েনি। বাহ্যত মনে হয় কাফফারা বা পাপমোচনের যে বিশ্বাস তারা পোষণ করে থাকে, ক্রুশকে পবিত্র মনে করার ভিত্তি তারই উপর, অর্থাৎ তাদের মতে ক্রুশ যেহেতু পাপমোচনের কারণ বনেছিল, সে কারণেই তারা একে সম্মান করে।

পুনর্জীবিত হওয়ার বিশ্বাস (Resurrection)

হযরত মাসীহ্ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে খ্রিস্টধর্মের তৃতীয় বিশ্বাস হল, তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করার এবং তারপর কবরে সমাহিত হওয়ার পর তৃতীয় দিন পুনরায় জীবিত হয়েছিলেন। এমনকি পুনর্জীবিত হওয়ার পর তিনি হাওয়ারীদেরকে কিছু উপদেশও দিয়েছিলেন। তারপর তিনি আসমানে চলে যান।

পুনরায় জীবিত হওয়ার এ ঘটনাও প্রচলিত ইনজীলসমূহে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। হযরত মাওলানা রহমাতুল্লাহ কীরানবী (রহ.) 'ইজহারুল হক'[২] গ্রন্থে এ বিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং তিনি প্রমাণ করেছেন যে, হযরত মাসীহ (আ.)-এর পুনর্জীবন লাভের ঘটনা নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত নয় এবং এ সম্পর্কিত বর্ণনাও পরস্পরবিরোধী। আগ্রহী পাঠক বিষয়টা সেখানে দেখে নিতে পারেন। এস্থলে আমরা এ বিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছি না।

পাপমোচনের বিশ্বাস (The Atonement)

এটা হযরত মাসীহ্ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে খ্রিস্টধর্মের চতুর্থ ও সর্বশেষ বিশ্বাস। পাপমোচন বাা কাফফারার বিশ্বাসটি আসলে কী, তা বিস্তারিতভাবে জেনে নেওয়া দরকার এবং তা বহুবিধ কারণে। (এক) মিষ্টার ডেনিয়েল উইলসনের[৩] বক্তব্য মতে এ বিশ্বাসটিই হল খ্রিস্টধর্মের প্রাণ। আর এমনিতেও বিশ্বাসটি সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে আমরা খ্রিস্টধর্মের যেসব আকীদার কথা বর্ণনা করেছি মূলত সেগুলো এ বিশ্বাসেরই পটভূমি স্বরূপ।

---

১. ক্রুশের এ ইতিহাস এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে গৃহীত ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭৫৩ পৃষ্ঠা, নিবন্ধ Cross.

২. গ্রন্থখানির উর্দূ তরজমা 'বাইবেল সে কুরআন তাক' নামে ৩ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

৩. Daniel Wilson, Evidences of Christianrty. V. 11, P. 53, London 1870.

(দুই) সবগুলো আকীদার মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বোধ্য হওয়ায় বিশেষভাবে অখ্রিস্টান জগতে এর প্রকৃত অর্থ খুব কম লোকই বুঝতে পেরেছে।

(তিন) ভালোভাবে বুঝতে না পারার কারণে এর থেকে দু'টি কুফল সৃষ্টি হয়েছে। (ক) অন্তত আমাদের এতদঞ্চলে খ্রিস্টান মিশনারীগণ এ বিশ্বাসটিকে যেভাবে ইচ্ছা ব্যাখ্যা করেছে[১] এবং এর প্রকৃত অর্থ না জানার কারণে বহু সরলমতি মুসলিম বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। (খ) যারা খ্রিস্টধর্মের ভ্রান্তি প্রমাণে কলম ধরেছেন, তাদের কেউ কেউ এ বিশ্বাস সম্পর্কে এমন সব আপত্তি তুলেছেন, প্রকৃতপক্ষে যার কোন সম্পর্ক এ বিশ্বাসের সাথে নেই। ফলে সেসব আপত্তি সত্যের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি। এসব বিবেচনা করে আমরা নিচে এ বিশ্বাসটি কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব, যাতে এর প্রকৃত মর্ম বুঝতে কোন অসুবিধা বাকি না থাকে।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় অ্যাটোনমেন্ট (প্রায়শ্চিত্ত/পাপমোচন)-এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে নিম্নরূপ,

খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বে অ্যাটোনমেন্ট দ্বারা হযরত ইয়াসূ মাসীহের সেই আত্মোৎসর্গকে বোঝানো হয়, যার মাধ্যমে একজন পাপী মানুষ মুহূর্তের ভেতর খোদার রহমতের নিকটবর্তী হয়ে যায়। এ বিশ্বাসের প্রেক্ষাপটস্বরূপ দু'টি ধারণা কার্যকর রয়েছে। (ক) আদমের পাপের কারণে মানুষ আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। (খ) আল্লাহর কালাম-গুণ (পুত্র) মানুষকে পুনরায় আল্লাহর রহমতের নিকটবর্তী করে দেওয়ার লক্ষ্যেই[২] মানবদেহ ধারণ করেছিল।

বলতে তো খুবই সংক্ষেপ কথা, কিন্তু এর পেছনে ঐতিহাসিক ও দৃষ্টিভঙ্গিগত অনেকগুলো বিষয় রয়েছে, যেগুলো ভালোভাবে না বুঝলে এ বিষয়টির প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। আমরা সে বিষয়গুলো নিচে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করছি।[৩]

---

১. উদাহরণস্বরূপ পাদ্রী গোল্ডসেক সাহেবের 'আল-কাফফারা' নামক পুস্তিকাটি দ্রষ্টব্য, পাঞ্জাব রিলিজাস বুক সোসাইটি, লাহোর ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ।

২. এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ২য় খণ্ড, ৬৫১ পৃষ্ঠা, নিবন্ধ Atonement.

৩. আমার দৃষ্টিতে প্রায়শ্চিত্তের বিশ্বাস ও এর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করেছেন সেন্ট অগাষ্টাইন। তিনি তার প্রসিদ্ধ The Enchiridion গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। আমরা এ বিশ্বাসটির ব্যাখ্যায় যা-কিছু লিখব, তার বেশির ভাগ ওই গ্রন্থ থেকেই নেওয়া হবে। তবে তার বক্তব্য যেহেতু অতি দীর্ঘ তাই সব জায়গায় তা পুরোপুরি উদ্ধৃত করা হবে না; বরং অনেক জায়গায় গ্রন্থের বরাত দিয়েই ক্ষান্ত থাকব। যেখানে অন্যান্য বই-পুস্তকের সাহায্য নেওয়া হবে, সেখানে তার সাথে সাথেই বরাত লিখে দেওয়া হবে।

(এক) যেসব ধারণার উপর এ বিশ্বাসটির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, তন্মধ্যে সর্বপ্রথম ধারণা এই যে, প্রথম মানুষ হযরত আদম আলাইহিস সালামকে যখন সৃষ্টি করা হয়েছিল, তখন তাকে সব রকমের সুখ-শান্তি দান করা হয়েছিল। তার উপর কোন রকমের বিধি-নিষেধ ছিল না। কেবল এতটুকু কথা যে, তাকে গন্ধম খেতে নিষেধ করা হয়েছিল। তখন তার ইচ্ছাশক্তিকে স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে তিনি ইচ্ছা করলে হুকুম পালনও করতে পারতেন এবং ইচ্ছা করলে অমান্যও করতে পারতেন।[১]

(দুই) হযরত আদম আলাইহিস সালাম তাঁর ইচ্ছাশক্তির অনুচিত ব্যবহার করেন এবং নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে এক মহাপাপ করে বসেন। বলতে তো একটি মামুলি অপরাধ ছিল, কিন্তু মান (Quality) ও পরিমাণ (Quantity) উভয় বিচারে তা ছিল গুরুতর পাপ। মান বিচারে তো এজন্য যে, এক তো হযরত আদম আলাইহিস সালামের পক্ষে তখন আদেশ পালন অত্যন্ত সহজ ছিল। তাকে যে-কোন খাদ্য ভোগের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। একটি মাত্র ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল, যা পালন করা কিছুমাত্র কঠিন ছিল না। তাছাড়া তখনও পর্যন্ত মানুষের মধ্যে লোভ-লালসা ও ইন্দ্রিয় চাহিদা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেনি, যা মানুষের গুনাহে লিপ্ত হওয়ার একটি বড় কারণ। এ অবস্থায় গন্ধম থেকে দূরে থাকা কোন কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল না। বলাবাহুল্য আদেশ পালন যত সহজ হয়, অমান্য করাটাও সেই অনুপাতে গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত এটাই ছিল মানুষের কৃত প্রথম পাপ, যা সর্বপ্রথম আনুগত্যের স্থলে অবাধ্যতার জন্মদান করে। এর আগে মানুষ কোন অবাধ্যতা করেনি। আনুগত্য যেমন সমস্ত পুণ্যের মূল, তেমনি অবাধ্যতা সমস্ত পাপের ভিত্তি। সর্বপ্রথম হযরত আদম আলাইহিস সালামই পাপের ভিত্তি স্থাপন করেন।[২]

পরিমাণের দিক থেকেও এটি ছিল গুরুতর পাপ। কেননা এই এক পাপের ভেতর আরও বহু পাপ শামিল হয়ে গিয়েছিল, যে কারণে এটি পাপের সমষ্টিতে পরিণত হয়েছিল। সেন্ট অগাষ্টাইন বিষয়টি নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেন,

মানুষের এই এক পাপের মধ্যে বহু পাপ শামিল ছিল, যেমন এর ভেতর নিহিত ছিল অহংকার। কেননা এর দ্বারা মানুষ আল্লাহর আধিপত্যের পরিবর্তে নিজ এখতিয়ার-বলয়ের মধ্যে থাকার আগ্রহ ব্যক্ত করল। দ্বিতীয়ত এটা কুফর ও

১. অগাষ্টাইন, দি স্টে অফ গড, অধ্যায় ১৪, পরিচ্ছেদ ১১, ২য় খণ্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা।
২. দি স্টে অফ গড, অধ্যায় ১৪, পরিচ্ছেদ ১২, ২য় খণ্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা।

আল্লাহর সাথে বেয়াদবী করার গুনাহও বটে। কেননা মানুষ এক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস বজায় রাখেনি। তৃতীয়ত এটা নরহত্যার পাপও ছিল। কেননা এর মাধ্যমে মানুষ নিজেকে মৃত্যুর উপযুক্ত বানিয়ে ফেলেছে। চতুর্থত এটা ছিল ব্যভিচার। কেননা সাপের বিভ্রান্তিকর, অথচ মিষ্টি-মধুর কথা বিশ্বাস করার ফলে মানবাত্মার ইখলাস ও একনিষ্ঠতা ধুলায় মিশে গিয়েছিল। পঞ্চমত এটা চৌর্যকর্মও বটে। কেননা যে খাদ্য স্পর্শ করা তাঁর জন্য নিষেধ ছিল, তিনি তা উদরস্থ করেছিলেন। ষষ্ঠত এটা ছিল এক রকম লোলুপতা। কেননা মানুষের জন্য যে পরিমাণ খাদ্য যথেষ্ট ছিল, তিনি তার বেশি কামনা করেছিলেন। আর সত্য কথা হল, আপনি যে কোন পাপের প্রতি লক্ষ্য করবেন তার একটা ছায়া এই এক পাপের মধ্যে দেখতে পাবেন।[১]

(তিন) হযরত আদম আলাইহিস সালামের পাপ যেহেতু খুবই গুরুতর ছিল, তাই তার দু'টি প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। এক তো এই যে, তার শাস্তি হিসেবে হযরত আদম 'স্থায়ী মৃত্যু' বা 'স্থায়ী আযাব'-এর উপযুক্ত হয়ে গেলেন, কেননা আল্লাহ তাআলা নিষিদ্ধ গাছ দেখিয়ে বলে দিয়েছিলেন,

'যে দিন তুমি তার ফল খাবে সেই দিন নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে।'

(পয়দায়েশ ২ : ১৭)

দ্বিতীয় ফল হল এই যে, হযরত আদম আলাইহিস সালামকে ইচ্ছাশক্তির যে স্বাধীনতা (Free Will) দেওয়া হয়েছিল, তা তার থেকে কেড়ে নেওয়া হল। প্রথমে তাকে এই শক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি নিজ ইচ্ছায় ভালো কাজও করতে পারতেন এবং মন্দ কাজও। কিন্তু তিনি যখন এই শক্তির অন্যায় ব্যবহার করলেন, তখন তার থেকে এ শক্তি কেড়ে নেওয়া হল। অগাষ্টাইন লেখেন,

'মানুষ যখন তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দ্বারা পাপকর্মে লিপ্ত হল, তখন পাপ তার উপর জয়লাভ করায় তার ইচ্চাশক্তির বিলোপ ঘটানো হল। কেননা যে ব্যক্তি যার কাছে পরাস্ত হয় সে তার দাস হয়ে যায়। এটা 'পিতর প্রেরিত'-এর ফায়সালা।[২] সুতরাং মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত পাপমুক্ত হয়ে পুণ্যের দাস হতে শুরু না করবে ততক্ষণ সৎকর্ম করার স্বাধীনতা তার অর্জিত হবে না।'[৩]

---

১. Augustine The Enchiridion XLV PP. 684 V. 1.

২. ইশারা পিতরের দ্বিতীয় পত্র ২ : ১৯-এর প্রতি।

৩. Enchirdion XXX P. 675 V. 1. অগাষ্টাইন 'দি স্টে অফ গড' গ্রন্থেও প্রায় এই একই রকম কথা বলেছেন।

অগাষ্টাইন যা বলেছেন, তার সারমর্ম হল, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তার পাপের বেড়ি থেকে মুক্তি লাভ না করছে ততক্ষণ পর্যন্তের জন্য তার ইচ্ছার স্বাধীনতা রহিত করে দেওয়া হয়েছে। এখন সে পাপ করার জন্য তো স্বাধীন, কিন্তু পুণ্যের জন্য স্বাধীন নয়।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয়, আল্লাহ্ মানুষকে এক গুনাহের শাস্তিতে অন্য সব গুনাহে কেন লিপ্ত করে দিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সেন্ট থমাস একুইনাস লেখেন,

'প্রকৃতপক্ষে পাপের আসল শাস্তি ছিল এই যে, আল্লাহ মানুষের উপর থেকে তাঁর রহমত তুলে নিয়ে যান। এ শাস্তি সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু আল্লাহর রহমত উঠে যাওয়ার সাথে সাথে মানুষের মধ্যে অধিকতর পাপের প্রবণতা সৃষ্টি হয়ে যায়। কাজেই এক পাপের কারণে অসংখ্য পাপে লিপ্ত হওয়াটা প্রকৃতপক্ষে সেই প্রথম পাপেরই অবধারিত ফল।[১]

(চার) পাপে লিপ্ত হওয়ার ফলে যেহেতু হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (আ.)-এর ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, যার মানে তারা পুণ্যের জন্য আর স্বাধীন থাকলেন না, কিন্তু পাপের জন্য স্বাধীন থাকলেন। তাই তাদের স্বভাবের ভেতর পাপের উপাদান যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিংবা বলা যায়, পাপ তাদের স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। পরিভাষায় তাদের সেই পাপকে 'আদিপাপ' (Original Sin) বলা হয়।

(পাঁচ) আদি মানব-মানবীর পর যত মানুষের জন্ম হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে, তারা সকলে যেহেতু তাদেরই ঔরস ও উদরজাত, তাই 'আদিপাপ' সমস্ত মানুষের ভেতর সংক্রমিত হয়ে আসছে। সেন্ট অগাষ্টাইন লেখেন,

বাস্তবে এই ঘটল যে, আদি পাপে পঙ্কিল সমস্ত মানুষ আদম ও সেই নারী হতেই জন্ম নিয়েছে, যে নারী আদমকে পাপে লিপ্ত করেছিল এবং আদমের সাথে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল।[২]

অর্থাৎ এখন দুনিয়ায় যে ব্যক্তিই জন্মগ্রহণ করে, সে মায়ের পেট থেকেই পাপী হয়ে জন্ম নেয়। কেননা তার পিতা-মাতার 'আদিপাপ' তার স্বভাবেও প্রবিষ্ট রয়েছে।

---

১. Aquinas, The Summa theologica, Q 87 Art 2, P. 710V. 11.
২. Augustine, the Enchiridion XXVI Britannica P. 633 V. 4 'Calvin' P. 673 V. 1.

প্রশ্ন আসে, পাপ তো করেছিল পিতা-মাতা, পুত্র কিভাবে সেজন্য পাপী হয়ে গেল? প্রটেষ্টান্ট সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ নেতা জন ক্যালভিন এর উত্তর দিতে গিয়ে লেখেন,

'যখন বলা হয় আদমের পাপের কারণে আমরা শাস্তির উপযুক্ত হয়ে গেছি, তার অর্থ 'আমরা মূলত নিষ্পাপ ও নিরপরাধ ছিলাম, আদমের পাপ অহেতুক আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে' –এমন নয়। বস্তুত আদম থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা কেবল 'শাস্তি' লাভ করিনি; বরং বাস্তব কথা হল, পাপের এক সংক্রামক ব্যাধি আমাদের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে আর তা আদম থেকে আমাদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে। এই পাপের কারণেই আমরা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গতভাবে শাস্তিযোগ্য হয়েছি। এমনিভাবে দুধের শিশুও মাতৃগর্ভ থেকে শাস্তির উপযুক্ত হয়ে আসে। আর এ শাস্তি স্বয়ং তারই ত্রুটি ও অপরাধের কারণে হয়, অন্য কারও অপরাধের কারণে নয়।[১]

রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ দার্শনিক থমাস একুইনাস একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টা পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন,

আমাদের পিতা-মাতার পাপের কারণে 'আদি পাপ' সন্তান-সন্ততির মধ্যেও বিস্তার লাভ করেছে। এর দৃষ্টান্ত এ রকম, মূলত পাপ তো করে আত্মা, কিন্তু তার সে পাপ দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে।[২]

(ছয়) সমস্ত আদম সন্তান যেহেতু আদিপাপে পঙ্কিল হয়ে গিয়েছিল আর আদিপাপই অন্য সব পাপের মূল, তাই পিতা-মাতার মত সমস্ত মানুষও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে। ফলে তারা একের পর এক পাপ করে যেতে থাকে। আর এভাবে 'আদিপাপ' ছাড়া অন্যান্য পাপেরও এক বিরাট বোঝা তাদের উপর চেপে যায়, যা আদিপাপের কারণে তারা নিজেরাই সম্পাদন করেছে।[৩]

(সাত) উপরে বর্ণিত পাপসমূহের কারণে সমস্ত আদম সন্তান তাদের পিতা-মাতার মত একদিকে স্থায়ী শাস্তির উপযুক্ত ছিল, অন্যদিকে নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি থেকেও বঞ্চিত হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাদের ক্ষমা ও মুক্তি লাভের কোন পথ ছিল না। কেননা পাপরাশি থেকে মুক্তি লাভ হতে পারত সৎকর্মেরই মাধ্যমে,

---

১. Calvin, Instit, bk ii. ch i, Sec 8, as quoted by the Britannica, P. 633 V. 4 'Calvin'.

২. The Summa theologica Q. 81. Art 3. P. 669 V. 11.

৩. Augustine, the Enchiridion, XXVII P. 673 V. 1.

কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি হারানের ফলে তারা সৎকর্ম করতেও সক্ষম ছিল না, যা তাদেরকে শাস্তি থেকে মুক্তিদান করবে।[১]

(আট) এই মুসিবত থেকে মানুষের মুক্তি লাভের একটা উপায় এই হতে পারত যে, আল্লাহ তাআলা নিজ দয়ায় তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন, কিন্তু এটাও এই কারণে সম্ভব ছিল না যে, আল্লাহ ন্যায়বিচারক। তিনি তার অটল আইন-কানুনের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন না। 'পয়দায়েশ' পুস্তকের বরাতে পূর্বে বলা হয়েছে, তিনি আদিপাপের শাস্তি স্থির করেছিলেন মৃত্যু। কাজেই মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে তিনি যদি ক্ষমা করে দিতেন, তবে সেটা তাঁর ন্যায়বিচারের পরিপন্থী হত।[২]

(নয়) অন্যদিকে আল্লাহ তাআলা পরম দয়ালু। তিনি নিজ বান্দাদেরকে এহেন মুসিবতের মধ্যে ফেলেও রাখতে পারেন না। তাই তিনি এমন এক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন, যা দ্বারা বান্দাদের প্রতি দয়াও করা হয়, আবার তাঁর ন্যায়বিচারও অক্ষুণ্ন থাকে। আইনগতভাবে বান্দাদের মুক্তির একমাত্র উপায় ছিল শাস্তিস্বরূপ একবার তাদের মৃত্যুবরণ, তারপর আবার জীবন লাভ, যাতে মৃত্যুর আগে আদিপাপের কারণে তাদের যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বিলোপ ঘটেছিল, দ্বিতীয় জীবনে তারা পুনরায় তা ফিরে পায় এবং আদি পাপ থেকে ভারমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে সৎকর্ম করতে সক্ষম হয়।[৩]

(দশ) কিন্তু সমস্ত মানুষকে একবার মৃত্যুদান করে পুনরায় জীবিত করাটাও প্রাকৃতিক বিধানের পরিপন্থী ছিল। তাই প্রয়োজন ছিল এক নিষ্পাপ ব্যক্তির, যে সমস্ত মানুষের পাপ নিজ কাঁধে বহন করে নেবে, তারপর আল্লাহ একবার তার মৃত্যু ঘটিয়ে পুনরায় জীবন দান করবেন। এভাবে তার একার শাস্তি দ্বারা গোটা মানব জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে এবং তারা সকলে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির মালিক হয়ে যাবে।

এই মহা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আল্লাহ নিজ পুত্রকে বেছে নিলেন এবং তাকে মানবাকৃতি দিয়ে দুনিয়ায় পাঠালেন। অতঃপর ঈশ্বর-পুত্র শূলে চড়ে মৃত্যুবরণ করলেন আর তাঁর মৃত্যু দ্বারা সমস্ত মানুষের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেল।[৪] এর দ্বারা মানব জাতির আদিপাপই ক্ষমা হল না; বরং সেই পাপের কারণে তারা আরও যত পাপ করেছিল তাও সব মাফ হয়ে গেল।[৫] তিন দিন পর ঈশ্বর-পুত্র পুনরায় জীবিত

১. প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ৩০, ১ম খণ্ড, ৬৭৫ পৃষ্ঠা।
২. দেখুন এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ২য় খণ্ড, ৬৫১, ৬৫২ পৃষ্ঠা, নিবন্ধ Aqtonement.
৩. অগাষ্টাইন, দি স্টে অফ গড, ২য় খণ্ড, ২৫৫, ২৫৬ পৃষ্ঠা, অধ্যায় ১৪, পরিচ্ছেদ ১১।
৪. প্রাগুক্ত।
৫. The Enchiridion LP. 687 V. 1.

হলেন এবং এর ফলে গোটা মানব জাতি নতুন জীবন লাভ করল। এই নতুন জীবনে সে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির মালিক হল। এখন সে এই ইচ্ছাশক্তিকে পুণ্যের কাজে ব্যবহার করলে আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হবে আর যদি পাপকাজে ব্যবহার করে, তবে সেই পাপের মান ও মাত্রা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য হবে।[১]

(এগার) কিন্তু ইয়াসূ মাসীহের এই ত্যাগ কেবল সেই ব্যক্তিরই জন্য, যে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে ও তাঁর শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করবে। তাঁর প্রতি ঈমানের আলামত হল তরিকাবন্দী (ব্যাপ্টাইজ) পালন করা।[২] তরিকাবন্দী পালন দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য যে, এটা পালনকারী ইয়াসূ মাসীহের প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস রাখে। এটা পালন করে সে যেন একবার মৃত্যুবরণ করে পুনরায় জীবন লাভ করল। যে ব্যক্তি তরিকাবন্দী পালন করবে তার আদিপাপ মোচন হয়ে যাবে এবং তাকে নতুন ইচ্ছাশক্তি দান করা হবে। যে ব্যক্তি তা পালন করবে না, আদিপাপের বোঝা তার কাঁধে থেকে যাবে, যদ্দরুণ সে স্থায়ী শাস্তির উপযুক্ত গণ্য হবে। এ কারণেই একুইনাস লেখেন,

ব্যাপ্টাইজ (তরিকাবন্দী) গ্রহণের আগে যে শিশু মারা যায়, তার আদিপাপ যেহেতু মোচন হয় না, তাই সে কখনও প্রভুর রাজত্ব দেখতে পাবে না।[৩]

(বার) যেসব লোক হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের আগে মারা গেছে, তাদের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা হবে, তারা ইয়াসূ মাসীহের উপর ঈমান রাখত কি না। ঈমান রেখে থাকলে ইয়াসূ মাসীহের মৃত্যু তাদের জন্যও প্রায়শ্চিত্ত হবে এবং সেও মুক্তি লাভ করবে। অন্যথায় নয়।[৪]

(তের) যারা ইয়াসূ মাসীহের প্রতি ঈমান এনে তরিকাবন্দী (ব্যাপ্টাইজ) পালন করে হযরত মাসীহের আত্মোৎসর্গ দ্বারা তাদের পাপমোচন হওয়ার মানে এ নয় যে, এখন তারা যতই পাপ করুক, সেজন্য তাদের কোন শাস্তি হবে না। বরং তার অর্থ হল, তাদের আদিপাপ মোচন হয়ে গেছে, যা স্থায়ী শাস্তির কারণ ছিল এবং সেই সমস্ত পাপও যা আদি পাপের কারণে সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এখন তো এক নতুন জীবন লাভ করেছে। এ জীবনে সে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির মালিক। সে যদি এ শক্তির অপব্যবহার করে পাপকর্মে লিপ্ত হয়, তবে পাপ অনুযায়ী শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে। তরিকাবন্দীর পর ঈমান থেকে খারিজ হওয়ার মত কোন পাপ করলে

১. Ibid, 60 ch. Lii P. 688 V. 1.
২. সামনে তরিকাবন্দীর ব্যাখ্যা আসবে– ইনশাআল্লাহ।
৩. Aquinas, the Summa theologica 875 P. 714 V. 11
৪. Augustine. On Original Sin ch. XXXI P. 641 V. 1.

সে স্থায়ী শাস্তিতে নিপতিত হবে; সেক্ষেত্রে ইয়াসূ মাসীহের প্রায়শ্চিত্ত তার কোন কাজে আসবে না। সুতরাং চার্চ যাদেরকে নিফাক (Schism) বা বিদআত (Sersy)-এর অভিযোগে ভ্রাতৃত্ব হতে খারিজ করে দেবে, সে স্থায়ী শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাবে।[১]

আর তারা যদি মামুলি পর্যায়ের পাপ করে, তবে সাময়িকভাবে কিছুকাল জাহান্নামে কাটাবে এবং তা জাহান্নামের সেই অংশে, যা তৈরি করা হয়েছে মুমিনদেরকে গুনাহ থেকে পাক করার জন্য। সে স্থানের নাম পাপমোচনাগার (Purgatory)। সেখানে কিছুকাল কাটানোর পর তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে।[২]

কোন কোন খ্রিস্টান আলেমের মতে কেবল কুফরী গুনাহই নয়; বরং কবীরা গুনাহও মানুষকে ইয়াসূ মাসীহের প্রায়শ্চিত্তের সুফল লাভ থেকে বঞ্চিত করে। এরূপ পাপের কারণেও মানুষ স্থায়ী শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায়। সেন্ট অগাষ্টাইন এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন। Enchiridion গ্রন্থে উদ্ধৃত তাঁর ভাষ্য দ্বারা বোঝা যায়, তাঁর ঝোঁক এই মতেরই দিকে।

যারা এ বিশ্বাস অস্বীকার করেন

এই হল অ্যাটোনমেন্ট (পাপমোচন) বিশ্বাসের বৃত্তান্ত।[৩] খ্রিস্টানদের গরিষ্ঠ সংখ্যক শুরু থেকেই এ আকীদাকে ধর্মের ভিত্তিরূপে বিশ্বাস করে আসছে। তথাপি

---

১. The Enchiridion LXVII P. 691 V. 1.

২. The Ench. ch. LXIX P. 699 V. 1.

৩. এ বিশ্বাসটি সম্পর্কে মাওলানা রহমাতুল্লাহ কীরানবী (রহ.) 'ইজহারুল হক' গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষত তৃতীয় অধ্যায়ে অত্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ও সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। তারপরও এ বিশ্বাসটির একেকটি অংশ সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা করতে হলে একটি স্বতন্ত্র রচনার প্রয়োজন। আমরা যেহেতু এ রচনায় খ্রিস্টধর্মের আকীদা-বিশ্বাস বিবৃত করেছি মাত্র, সে সম্পর্কে পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ উদ্দেশ্য নয়, তাই এস্থলেও বিস্তারিত পর্যালোচনার অবকাশ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ বিষয়টির কয়েকটি মৌলিক দিকের প্রতি ইঙ্গিত করে যাওয়া জরুরি মনে হচ্ছে, যেগুলি এ বিষয়টি সম্পর্কে মীমাংসাকর গুরুত্ব বহন করে এবং তা নজরে রাখলে আশা করি এ বিশ্বাসটির ত্রুটিসমূহ আপনা-আপনিই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

(১) সর্বপ্রথম অনুসন্ধান করে দেখা উচিত হযরত আদম আলাইহিস সালাম দ্বারা যে ভুল হয়ে গিয়েছিল, সেটি পাপ ছিল কিনা।

(২) প্রায়শ্চিত্তের বিশ্বাসে দেখা যাচ্ছে আদিপাপকে দু'ভাবে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। (ক) হযরত আদম (আ.) থেকে তার বংশধরদের মধ্যে এবং (খ) সমস্ত মানুষ থেকে হযরত মাসীহের মধ্যে। প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার ন্যায়নীতি অনুযায়ী একজনের পাপ অন্যজনের উপর চাপানোর অবকাশ আছে কি? তাওরাতে তো আমরা লেখা দেখি,

চার্চের ইতিহাসে এমন কিছু লোকেরও সন্ধান পাওয়া যায় যারা এ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। খুব সম্ভব তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি বলে কোয়েলিসশিস (Coelestius)। অগাসটাইনের বর্ণনানুযায়ী তার চিন্তাধারা নিম্নরূপ–

'আদম আলাইহিস সালামের গুনাহ দ্বারা কেবল তিনিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। মানবজাতির উপর তার কোন কুফল দেখা দেয়নি। শিশু তার মাতৃগর্ভ থেকে ঠিক সেই রকমই জন্ম নেয়, যে রকম হযরত আদম গুনাহ করার আগে ছিলেন। (Augustine, On Original Sin ch, 621 II P. V. 1)

যে গুনাহ করবে সেই মরবে। ছেলে বাবার দোষের জন্য শাস্তি পাবে না আর বাবাও ছেলের দোষের জন্য শাস্তি পাবে না। সৎ লোক তার সততার ফল পাবে এবং দুষ্ট লোক তার দুষ্টতার ফল পাবে।

(ইহিস্কেল ১৮ : ২০)

(৩) ক্যালভিন হযরত আদম থেকে তাঁর সন্তানদের মধ্যে গুনাহ সংক্রমিত হওয়ার উদাহরণ হিসেবে যে সংক্রামক ব্যাধির কথা উল্লেখ করেছেন, তা কোনভাবেই সঠিক নয়। কেননা প্রথমত এ বিষয়টাই তো বিতর্কিত যে, এক ব্যক্তির রোগ দ্বারা অন্য ব্যক্তি আক্রান্ত হয় কি না। যদি আক্রান্ত হয় বলে মেনেও নেওয়া হয়, তবে বলব, রোগ একটি অনিচ্ছাজনিত বিষয়। তাকে ঐচ্ছিক গুনাহের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। কেননা শাস্তিযোগ্য গুনাহ সেটাই, যা মানুষ নিজ ইচ্ছাক্রমে করে। কারও যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন রোগ দেখা দেয়, সেজন্য তাকে নিন্দা করা যায় না এবং সে শাস্তিযোগ্যও হয় না। তাহলে মানুষকে কেন এমন গুনাহের জন্য শাস্তিযোগ্য মনে করা হবে, যাতে তার নিজের ইচ্ছার কোন ভূমিকা নেই?

(৪) এমনিভাবে একুইনাস বর্ণিত উদাহরণও ঠিক হয়নি। কেননা গুনাহগার মূলত মানুষ। কিন্তু মানুষ যেহেতু দেহ ও আত্মার সমষ্টির নাম, তাই এ দুয়ের প্রত্যেকেই গুনাহগার। পক্ষান্তরে হযরত আদম (আ.)-এর সত্তা তো তার বংশধরদের সমন্বয়ে গঠিত নয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে গুনাহগার সাব্যস্ত করা না হবে, ততক্ষণ তাকে গুনাহগার সাব্যস্ত করা যাবে না।

(৫) হযরত আদম (আ.)-এর বংশধরদের প্রত্যেকের মধ্যেই যদি সৃষ্টিগতভাবে আদিপাপ সংক্রমিত হয়ে থাকে, তবে তা হযরত ঈসা (আ.)-এর মানবীয় অস্তিত্বে কেন সংক্রমিত হবে না, যখন তিনিও অপরাপর মানুষের মত হযরত মারয়াম (আ.)-এর উদরে জন্মগ্রহণ করেছেন? খ্রিস্টানদের বিশ্বাসমতে তিনি তো খোদা হওয়ার সাথে সাথে মানুষও ছিলেন এবং মানুষ হিসেবেই তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল।

(৬) সমস্ত মানুষের পাপের কারণে একজন নিষ্পাপ বেকসুর লোককে শূলে চড়ানোটা কতটুকু ন্যায়নীতিসম্মত, হোক না তার সন্তুষ্টি ও সম্মতিক্রমে? কেউ যদি আদালতে গিয়ে দাবি করে, অমুক চোরের দৈহিক শাস্তি আমি ভোগ করতে চাই, তবে কি চোরকে খালাস দিয়ে দেওয়া হবে? ইহিস্কেলের পূর্ব বর্ণিত ভাষ্যও এটা প্রত্যাখ্যান করে।

(৭) বলা হয়ে থাকে, আল্লাহ ন্যায়বিচারক, তাই বিনা শাস্তিতে তিনি কোন পাপ ক্ষমা করতে পারেন না। কিন্তু এটা কেমন ন্যায়বিচার যে, এক অনিচ্ছাকৃত পাপের কারণে মানুষকে যে স্থায়ী শাস্তি দেওয়া হচ্ছে কেবল তাই নয়, বরং তার ইচ্ছাশক্তিও কেড়ে নেওয়া হল?

(৮) বলা হয়, আল্লাহ কেবল তাওবা দ্বারা আদিপাপ ক্ষমা করতে পারেন না। অথচ তাওরাতে আছে, 'যদি একজন দুষ্ট লোক তার সব গুনাহ থেকে ফিরে আমার সব নিয়ম-কানুন পালন করে আর ন্যায় ও ঠিক কাজ করে, তবে সে নিশ্চয়ই বাঁচবে, মরবে না (ইহিস্কেল ১৮ : ২১)।

(৯) অ্যাটোমমেন্ট বা প্রায়শ্চিত্তের বিশ্বাস সঠিক হলে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বিষয়টা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করলেন না কেন? ইনজীলসমূহের কোথাও এমন কথা নেই, যার থেকে এ বিশ্বাস আহরণ করা যায়। এ বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিষয়টা আমরা কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব– ইনশাআল্লাহ।

কিন্তু কার্থিজ নামক স্থানে বিশপদের একটি কাউন্সিলে এ মতকে বিদআত সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও কিছু লোক এ আকীদা স্বীকার করে না। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় 'অ্যাটোনমেন্ট' শীর্ষক নিবন্ধে তাদের বৃত্তান্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

উপাসনা ও প্রথা

উপাসনার মূলনীতি

খ্রিস্টধর্মে ইবাদত-উপাসনার কি কি পদ্ধতি আছে, তা জানার আগে এ ধর্মে উপাসনার মূলনীতি কি তা জেনে নেওয়া আবশ্যক মনে করি। মিষ্টার রেমন্ড অ্যাব্বার বর্ণনা অনুযায়ী মোট চারটি মূলনীতি আছে।

(এক) ইবাদত-উপাসনা মূলত আল্লাহর কালিমা অর্থাৎ হযরত মাসীহ (আ.) মানুষের পক্ষ থেকে যে আত্মত্যাগ করেছিলেন, তারই শোকরানা।[১]

(দুই) দ্বিতীয় মূলনীতি হল, সঠিক উপাসনা পাক রূহের কর্ম দ্বারাই সম্ভব। রোমীয়দের নামে পৌল তার পত্রে লেখেন,

কি বলে মুনাজাত করা উচিত তা আমরা জানি না। কিন্তু যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, সেই রকম আকুলতার সঙ্গে পাক রূহ নিজেই আমাদের হয়ে অনুরোধ করেন (রোমীয় ৮ : ২৬)।

(তিন) তৃতীয় মূলনীতি হল, উপাসনা মূলত একটি সমষ্টিগত কর্ম, যা চার্চ আঞ্জাম দিতে পারে। কোন ব্যক্তি একাকী কোন উপাসনা করতে চাইলে তা কেবল তখনই সম্ভব, যখন সে চার্চের সদস্য হবে।

(চার) চতুর্থ মূলনীতি, উপাসনা হল চার্চের মূল কাজ। এরই মাধ্যমে চার্চ 'মাসীহের দেহ' হিসেবে নিজেকে দুনিয়ার সামনে পেশ করে।

প্রশংসা পাঠ

খ্রিস্টধর্মে উপাসনার বহু পদ্ধতি আছে। এই সংক্ষিপ্ত রচনায় সবগুলোর পরিচয় দান সম্ভব নয়। আমরা এখানে কেবল দু'টি পদ্ধতি উল্লেখ করছি, যা সর্বাপেক্ষা বেশি পালন করা হয় এবং খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে যার উল্লেখ বারবার আসে। একটি হল 'প্রশংসা পাঠ'-এর উপাসনা। মুসলিমদেরকে বোঝানোর জন্য পাদ্রী সাহেবগণ একে 'নামায' নামেও অভিহিত করে।

মিষ্টার এফ. সি. বুরকিট (F. C. Burkitt)-এর বর্ণনা অনুসারে এ উপাসনার নিয়ম হল, প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় উপাসনাকারীগণ চার্চে উপস্থিত হয়। একজন বাইবেল থেকে অংশবিশেষ পাঠ করে। সাধারণত তা যাবূরের কোন অংশ হয়ে

১. Principles of Christian Worship, oxford 1960 P. 3

থাকে। যাবূর পাঠকালে উপস্থিত সকলে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে। যাবূরের প্রতিটি কাওয়ালী শেষ হলে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করা হয়। প্রার্থনাকালে গুনাহের স্বীকারোক্তিস্বরূপ অশ্রুবর্ষণ একটি পছন্দনীয় কাজ। এ পদ্ধতি খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে একাধারে চলে আসছে। এথানাসিওস (Athanasios)-এর কোন কোন রচনা এখনও পাওয়া যায়। তাতে এ পদ্ধতি অনুসরণ করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।[১]

ব্যাপটাইজ বা তরিকাবন্দী (Baptism)

ব্যাপটাইজ (বাইবেলের বর্তমান বাংলা অনুবাদে যাকে তরিকাবন্দী শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে) খ্রিস্টধর্মের সর্বপ্রথম প্রথা। এটা এক ধরণের গোসল। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকারীকে প্রথমে এটা দেওয়ানো হয়। এছাড়া কাউকে খ্রিস্টান বলা যায় না। এ প্রথার পেছনেও প্রায়শ্চিত্তের বিশ্বাস কার্যকর রয়েছে। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস হল, ব্যাপটাইজ গ্রহণের দ্বারা মানুষ ইয়াসূ মাসীহের মাধ্যমে একবার মৃত্যুবরণ করে পুনর্জীবিত হয়। মৃত্যুর মাধ্যমে তাকে আদিপাপের শাস্তি দেওয়া হয় এবং নতুন জীবনের মাধ্যমে সে ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা লাভ করে।[২]

যে ব্যক্তি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে চায়, তাকে প্রথমে একটি উত্তরণ পর্ব অতিক্রম করতে হয়। এ সময় সে ধর্মের বুনিয়াদী শিক্ষা লাভ করে। এ পর্বে তাকে খ্রিস্টান বলা হয় না। বরং 'ক্যাটচৌমেন্‌স' (Cate chumens) বলা হয়। এ সময় তাকে প্রভুর নৈশভোজে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয় না। পরিশেষে ইষ্টার উৎসবের কিছু আগে বা পঞ্চাশত্তমী ঈদের কিছু আগে তাকে ব্যাপটাইজ দেওয়া হয়।[৩]

ব্যাপটাইজ সম্পন্ন করার জন্য চার্চে একটি বিশেষ কক্ষ থাকে এবং এর জন্য বিশেষ লোক নিযুক্ত থাকে। জেরুজালেমের প্রসিদ্ধ ধর্মযাজক সাইরিল (Cyril) এ প্রথা পালনের যে নিয়ম বলেছেন, তা নিম্নরূপ–

ব্যাপটাইজ-প্রার্থীকে বিশেষ কক্ষে (Baptislry) নিয়ে পশ্চিমমুখী করে শুইয়ে দেওয়া হয়। তারপর সে পশ্চিম দিকে হাত বিস্তার করে বলে 'হে শয়তান! আমি তোর ও তোর প্রতিটি কাজের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করছি।' তারপর সে পূর্ব দিকে ফিরে মুখে ঈসায়ী আকীদা-বিশ্বাস ঘোষণা করে। তারপর তাকে ভেতরে একটি কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার সমস্ত পোশাক খুলে ফেলা হয় এবং মাথা

---

১. The Christian Religion PP. 152, 153 V. 3 Cambridge 1930.
২. Augustine, The Enchridion, XLII P. 688 V. 1
৩. The Christian Religion P. 150, 152 V. 3

হতে পা পর্যন্ত বিশেষ এক রকমের দম করা তেল মালিশ করা হয়। তারপর তাকে ব্যাপটাইজের হাওজে নামানো হয়। এ সময় যে ব্যক্তি তাকে ব্যাপটাইজ প্রদান করে, সে তাকে প্রশ্ন করে– সে কি পিতা, পুত্র ও পাক রূহের প্রতি নির্ধারিত ব্যাখ্যার সাথে ঈমান রাখে? প্রশ্নের উত্তরে ব্যাপটাইজ-প্রার্থী বলে, হাঁ, আমি ঈমান রাখি। এই প্রশ্ন-উত্তরের পর তাকে হাউজ থেকে তোলা হয় এবং পুনরায় তার কপাল, কান, নাক ও বুকে দম করা তেল মালিশ করা হয়। তারপর তাকে সাদা কাপড় পরিয়ে দেওয়া হয়, যা এ কথার আলামত যে, সে ব্যাপটাইজ বা তরিকাবন্দীর মাধ্যমে বিগত সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে গেছে। তারপর যারা ব্যাপটাইজ গ্রহণ করেছে তাদের সকলকে একত্রে চার্চে প্রবেশ করানো হয় এবং প্রথমবারের মত প্রভুর নৈশভোজে শরীক করা হয়।১

প্রভুর নৈশভোজ (Lord's Supper)

খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বের সাথে যে প্রথা পালন করা হয়, সেটি হল প্রভুর নৈশভোজ। হযরত মাসীহ (আ.)-এর আত্মোৎসর্গের স্মারক রূপে এ প্রথা পালিত হয়ে থাকে। খ্রিস্টীয় বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত মাসীহ্ গ্রেফতার হওয়ার আগের দিন হাওয়ারীদের সাথে রাতের খাবার খেয়েছিলেন। মথির ইনজিলে সে মজলিসের বিবরণ দেওয়া হয়েছে নিম্নরূপ,

খাওয়া-দাওয়া চলছে। এমন সময় ঈসা রুটি নিয়ে আল্লাহকে শুকরিয়া জানালেন। পরে তিনি সেই রুটি টুকরা টুকরা করলেন এবং সাহাবীদের দিয়ে বললেন, 'এই নাও খাও; এ আমার শরীর' (মথি ২৬ : ২৬)।

লূক এ ঘটনায় অতিরিক্ত যোগ করেন যে, হযরত মাসীহ হাওয়ারীদের বললেন,

আমাকে মনে করবার জন্য এ রকম করো (লূক ২২ : ১৯)।

প্রভুর নৈশভোজের প্রথাটি এ নির্দেশের তামিলস্বরূপই করা হয়ে থাকে। খ্রিস্টানদের বিখ্যাত আলেম জাষ্টিন মর্টির তার সময়ে যেভাবে প্রথাটি পালন করা হত তার বিবরণ দিতে গিয়ে লেখেন,

প্রতি রবিবার চার্চে একটি ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে কিছু প্রার্থনা ও কাওয়ালী পাঠ করা হয়। তারপর উপস্থিত সকলে একে অন্যকে চুম্বন করে শুভেচ্ছা জানায়। তারপর রুটি ও মদ আনা হয় এবং মজলিসের সভাপতি তা নিয়ে পিতা,

১. পূর্ণ এই বিবরণ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় (৩য় খণ্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা) Baptism নিবন্ধে সাইরিলের বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে।

পুত্র ও পাক রূহের কাছে বরকত প্রার্থনা করে এবং উপস্থিত সকলে তাতে আমীন বলে। তারপর চার্চের সেবায়েতগণ (Deacons) সেই রুটি ও মদ সকলের মধ্যে বিতরণ করে। এই আচার-অনুষ্ঠানের ফলে সহসা সেই রুটি মাসীহের দেহ এবং মদ তাঁর রক্তে পরিণত হয়। সেই প্রতীকী দেহ ও রক্ত খেয়ে সকলে তাদের প্রায়শ্চিত্তের বিশ্বাসকে সজীব করে তোলে।[১]

জাস্টিনের পরবর্তীকালে এ প্রথার নিয়ম ও এতে ব্যবহৃত শব্দাবলীর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। তবে প্রথাটির মূল বিষয় এটাই যে, সভাপতি যখন উপস্থিত উপাসকদের মধ্যে রুটি ও মদ পরিবেশন করে, তখন খ্রিস্টীয় বিশ্বাস অনুযায়ী হঠাৎ করে তা আপন সত্তাসার পরিবর্তন করে মাসীহ (আ.)-এর রক্ত-মাংসে পরিণত হয়, বাহ্যদৃষ্টিতে তা যাই পরিদৃষ্ট হোক না কেন। সাইরিল লেখেন,

মজলিসের সভাপতি যখন প্রার্থনা শেষ করে তখন পাক রূহ, যা কিনা খোদার এক জীবন্ত ও অনন্ত সত্তা, সেই রুটি ও মদে অবতীর্ণ হয় এবং তাকে দেহ ও রক্তে পরিবর্তন করে দেয়।[২]

রুটি ও মদ কি করে মুহূর্তের মধ্যে রক্ত-মাংসে পরিণত হল এ বিষয়টা দীর্ঘকাল যাবৎ আলোচনা-পর্যালোচনার বিষয়বস্তু হয়ে আছে। অবশেষে খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে প্রোটেষ্ট্যান্ট সম্প্রদায়টি আত্মপ্রকাশ করলে তারা এ বিশ্বাসটি মেনে নিতে অস্বীকার করে। তাদের মতে এ প্রথাটি কেবল হযরত মাসীহ (আ.)-এর আত্মোৎসর্গের স্মারক। কিন্তু রুটি ও মদের রক্ত-মাংসে পরিণত হওয়াকে তারা স্বীকার করে না।

প্রভুর নৈশভোজ (Lord's Supper) ছাড়াও এ প্রথার আরও কয়েকটি নাম আছে, যেমন শুকরানা (Eucharisi), পবিত্র আহার (Sacred meal) ও পবিত্র ঐক্য (Holy Communion)।

রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপটাইজ ও প্রভুর নৌশভোজ ছাড়াও পাঁচটি ধর্মীয় প্রথা চালু আছে, কিন্তু প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায় সেগুলো স্বীকার করে না। ক্যালভিন লেখেন,

---

১. Justin Martyr, Apol. 1. 65-67 quoted by F.C Burkit, the christiam Religion P. 140 V. 1il

২. Cyril Cat Myst. K. quoted by the Britannica P. 795 V. 8 'EUCHARIST'

এগুলোর মধ্যে কেবল ব্যাপটাইজ ও প্রভুর নৈশভোজ এই দু'টি প্রথাই আমাদের মুক্তিদাতা স্থির করে দিয়েছেন। পোপের শাসনকালে যে সাতটি প্রথার প্রবর্তন করা হয়েছে, আমরা তাকে মনগড়া ও মিথ্যা মনে করি।

অবশিষ্ট পাঁচ প্রথা যেহেতু সর্ববাদীসম্মত নয় এবং সে সম্পর্কে অবগত হওয়ারও বিশেষ প্রয়োজন নেই, তাই এ রচনার সংক্ষিপ্ততা রক্ষার খাতিরে আমরা সেগুলোর বিবরণ দেওয়া হতে বিরত থাকলাম।

বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের প্রতি এক নজর[১]

ইসরাঈল হচ্ছে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের নাম। তাঁর ছিল বার পুত্র। তাদেরই বংশধরদেরকে বলা হয় বনী ইসরাঈল। প্রাচীনকালে আল্লাহ্ তাআলা এ বংশকেই নবুওয়াতের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। বহু সংখ্যক নবী-রাসূল এ বংশে প্রেরিত হয়েছিলেন।

বনী ইসরাঈলের আদি নিবাস ছিল ফিলিস্তিন। এক সময় আমালেকা গোষ্ঠী তাদেরকে উৎখাত করে এ এলাকাটি কব্জা করে নেয়। তখন থেকে তারা মিসরে ফেরাউনদের দাসরূপে জীবনযাপন করতে থাকে। হযরত মুসা আলাইহিস সালামের আমলে তারা সে দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে। কিন্তু তারা ফিলিস্তিন পুনরাধিকার করার আগেই হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ওফাত হয়ে যায়। তাঁরপর যথাক্রমে হযরত ইউশা ও হযরত কালিব আলাইহিমাস সালাম নবুওয়াত লাভ করেন। হযরত ইউশা আলাইহিস সালাম নিজ আমলে আমালেকা সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করে ফিলিস্তিনের বিপুল অংশ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এ দুই নবীর পর বনী ইসরাইলকে চারদিক থেকে নানা রকম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। এ সময় পর্যন্ত তারা আরবদের মত অর্ধ যাযাবর রূপেই জীবন যাপন করেছে। সভ্য-সামাজিক জীবনে তখনও পর্যন্ত তারা উপনীত হতে পারেনি। তাদের জীবন ব্যবস্থা ছিল গোষ্ঠীভিত্তিক। গোষ্ঠীয় রীতি-নীতি অনুযায়ী যে ব্যক্তি তাদের কলহ-বিবাদ মেটানোর ভালো যোগ্যতা রাখত তারা তাকে বিশেষ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখত। সেই সঙ্গে তার মধ্যে যদি সামরিক প্রতিভাও থাকত, তবে বহিঃশত্রুর মোকাবেলার জন্য তাকেই নিজেদের সেনাপতি বানাত। এ জাতীয় নেতাদেরকে ইসরাঈলীদের পরিভাষায় 'কাজী' বলা হয়। বাইবেলের 'কাজীগণ'

---

১. বনী ইসরাঈলের এ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বাইবেলের পুরাতন নিয়ম, অ্যাপোক্রিফা (Apocrypha) ও ব্রিটানিকা থেকে গৃহীত।

(Judges) শীর্ষক পুস্তকটি মূলত সেই নেতৃবর্গেরই কার্যবিবরণী। আর এই সুরত হালের কারণে সে কালকে 'কাজীগণের কাল' বলা হয়।

কাজীদের আমলে তো ইসরাঈলীগণ বহিঃশত্রুর আক্রমণকে সফলভাবে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব একাদশ শতকে তারা কানআনীদের হাতে পর্যুদস্ত হয়। এ সময় ফিলিস্তিনের বেশির ভাগ এলাকার কানআনী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, যা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের আমল পর্যন্ত বলবৎ থাকে।

পরিশেষে যখন হযরত শামুয়েল আলাইহিস সালামকে নবী করে পাঠানো হয়, তখন ইসরাঈলীগণ তাঁর কাছে আবেদন জানাল, এই বাস্তুহারা জীবন আমরা আর বরদাশত করতে পারছি না। আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করুন তিনি আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নিযুক্ত করে দিন, যার নেতৃত্বে আমরা ফিলিস্তিনের (কানআনীদের) মুকাবেলা করব। তাদের আবেদন মঞ্জুর করা হল এবং সেমতে তাদেরই মধ্য থেকে একজনকে বাদশাহ বানিয়ে দেওয়া হল। কুরআন মাজীদের বর্ণনা অনুযায়ী তার নাম তালূত এবং বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী শৌল। (অবশ্য বাইবেলের বর্তমান তরজমায় তার নাম তালূতই লেখা হয়েছে ১ শামুয়েল ৯, ১০, ১১, ১৩)

তালূত ফিলিস্তিনীদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। এ সময় হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম ছিলেন তরুণ বয়সের। ঘটনাক্রমে তিনি তালূতের সৈন্যদলে উপস্থিত হয়েছিলেন। ফিলিস্তিনি সৈন্যদের মধ্যে জালূত নামে এক পালোয়ান ছিল। সে সম্মুখ সমরের আহ্বান জানাল। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম তাতে সাড়া দিলেন। জালূত তাঁর হাতে নিহত হল। এ ঘটনায় হযরত দাউদ (আ.) ইসরাঈলীদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করলেন। ফলে তালূতের পর তিনিই তাদের বাদশাহ হলেন। আল্লাহ তাআলা এই সর্বপ্রথম একজন বাদশাহকে নবুওয়াত দান করলেন। হযরত দাউদ (আ.)-এর আমলে প্রায় সমগ্র ফিলিস্তিনে ইসরাঈলীদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর পর খ্রি. পূ. ৯৭৪ সালে হযরত সুলাইমান (আ.) ক্ষমতারোহণ করলে ইসরাঈলী রাজত্ব চরম উৎকর্ষ লাভ করে। তিনিই আল্লাহ তাআলার নির্দেশে বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করেন। তিনি তাঁর ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষের নামে রাষ্ট্রের নাম রাখেন 'ইয়াহূদা'। খ্রি. পূ. ৯৩৭ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। অতঃপর তার পুত্র রাহবিআম সিংহাসনে বসেন। তিনি যোগ্য শাসক ছিলেন না। তাঁর অযোগ্যতার ফলে রাষ্ট্রের কেবল দ্বীনী চরিত্রই নষ্ট হয়নি রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যও চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার আমলেই ইয়ারাবিম নামে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর এক ভূতপূর্ব ভৃত্য ইসরাঈলীদের নিয়ে বিদ্রোহ করল

এবং ইসরাঈল নামে একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করল। এভাবে বনী ইসরাঈল দুই রাজত্বে ভাগ হয়ে গেল। উত্তর দিকে ছিল ইসরাঈলী শাসন, যার রাজধানী ছিল সামাররা (Somoria) আর দক্ষিণ দিকে ছিল ইয়াহুদিয়া রাজ্য, রাজধানী জেরুজালেম। উভয় রাজ্যের মধ্যে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিরোধ লেগেই থাকত। এ বিরোধ বুখত নাস্‌সারের হামলা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। দুই রাজ্যেই মূর্তিপূজা চালু হয়ে গিয়েছিল এবং দিন দিন তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এর থেকে মানুষকে ফেরানোর জন্য একের পর এক নবী প্রেরিত হচ্ছিল। কিন্তু বনী ইসরাঈল যখন হেদায়াত কবুল করল না; উপরন্তু তাদের দুষ্কর্ম সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাস্তি দান করলেন। খ্রি. পূ. ৫৮৬ সালে ব্যাবিলনের বাদশাহ বুখতে নাসসার জেরুজালেমে প্রচণ্ড আক্রমণ চালালেন। সর্বশেষ আক্রমণে ব্যাপক গণহত্যা চালালেন এবং জেরুজালেমকে সম্পূর্ণ জেরবার করে ফেললেন। জেরুজালেমের বাদশাহ সিদকিয়কে গ্রেফতার করে নিয়ে গেলেন। যারা প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল তাদেরকেও বন্দী করে ব্যাবিলন নিয়ে গেলেন। সেখানে তারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত দাসত্বের জীবন যাপন করে।

পরিশেষে খ্রি. পূ. ৫৩৬ সালে পারস্যের বাদশাহ সাইরাসের হাতে ব্যাবিলনের পতন ঘটলে তিনি ইয়াহুদীদেরকে মুক্তিদান করেন এবং তাদেরকে জেরুজালেমে ফিরে গিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস মেরামত করার অনুমতি দেন। সুতরাং খ্রি. পূ. ৫১৫ সালে তারা বাইতুল মুকাদ্দাসকে পুনঃনির্মাণ করে আর এভাবে ইয়াহুদীরা পুনরায় জেরুজালেমের বাসিন্দা হয়ে যায়।

ইয়াহুদার আগেই ইসরাঈল রাজ্যটি আসূরিয়দের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। পরবর্তীতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ-বিসংবাদও যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল। তবে তারা কোন রাজত্ব লাভে সক্ষম হয়নি। খ্রি. পূ. ৪০০ সাল থেকে সমস্ত বনী ইসরাঈল বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ দ্বারা শাসিত হতে থাকে। খ্রি. পূ. ৩৩২ সালে আলেকজাণ্ডার দ্যা গ্রেট তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। এ সময়ই তারা তাওরাতের তরজমা করে, যা সেপটুঅ্যাজিন্ট (Septuagint) নামে প্রসিদ্ধ।

খ্রি. পূ ১৬৫ সালে সিরিয়ার বাদশাহ এনতিয়োকুস এপিফিনস তাদের উপর নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায় এবং তাওরাতের সমস্ত কপি জ্বালিয়ে দেয়। (দেখুন মুকাবীদের প্রথম কিতাব, প্রথম অধ্যায়।) এ সময়ই ইয়াহুদা মুকাবী নামক এক বীর ইসরাঈলী একদল ইয়াহুদীকে সংঘবদ্ধ করে আসূরীয়দের রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ফিলিস্তিনের একটা বড় এলাকা থেকে তাদেরকে বিতাড়ন

করে সেখানে ইয়াহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। মুকাবীদের এ রাজত্ব ৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কায়েম ছিল।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আবির্ভাব

মুকাবীদের এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটি ছাড়া ইয়াহুদীদের আর কোন স্বাধীন ভূমি ছিল না। তারা বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। রোম উপসাগরের আশেপাশে বিভিন্ন জনপদে তারা বসবাস করত। ব্যাবিলনের নির্বাসন জীবন শেষ হওয়ার পর বহু সংখ্যক ইয়াহুদী ফিলিস্তিনে এসে বসবাস শুরু করলেও তাদের গরিষ্ঠ সংখ্যক ব্যাবিলনেই থেকে গিয়েছিল। ফিলিস্তিনের একটি অংশ ছিল রোমান শাসনাধীন। জেরুজালেম ছিল রোম সাম্রাজ্যের একটা প্রদেশ, যাকে রোমান ইয়াহুদিয়া বলা হত। রোমানদের পক্ষ থেকে এক গভর্নর এ প্রদেশ শাসন করত। বৈষয়িক ব্যাপারে স্বাধীন পরিবেশে তাদের নিঃশ্বাস গ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না। এহেন পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তাদের কোন উপায় ছিল না। তাদের অধিকাংশই এই অপেক্ষায় ছিল যে, কখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এক মুক্তিদাতা আসবে এবং তাদেরকে দাসত্বের জীবন থেকে মুক্ত করে রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করবে। অবশেষে তাদের সেই মুক্তিদাতার আবির্ভাব ঘটল। রোম সম্রাট অগাষ্টাস ও ইয়াহুদিয়ার প্রশাসক হেরোদের শাসনামলে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করলেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবনেতিহাস জানার জন্য নির্ভরযোগ্য কোন সূত্র বর্তমানে কোথাও নেই। আমাদেরকে নির্ভর করতে হয় কেবল চার ইনজীলের উপর। বলা যেতে পারে এগুলোই তার পবিত্র জীবনী জানার একমাত্র মাধ্যম, অথচ আমাদের দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য কোন রচনার মর্যাদা ও ইনজীলসমূহ রাখে না।

খ্রিস্টবাদের ইতিহাস[১]

খ্রিস্টবাদের যে রূপ বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রচলিত, এর সূচনা কিভাবে ঘটেছিল? এর বিস্তারিত উত্তর অনেকটাই অন্ধকারের ভেতর। তথাপি যতটুকু তথ্য-উপাত্ত আমাদের কাছে আছে তার নিরিখে আমরা এতটুকু জানতে পারি যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার পর হাওয়ারী (শিষ্য)-গণ

---

১. সংক্ষিপ্ত এ ইতিহাস বর্ণনায় যেসব গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে ঃ এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিওন এন্ড এথিক্স, নিবন্ধ Christianity; সি. পি. এস ক্লার্ক, চার্চের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস; পাদ্রী খুরশিদ আলম, কালিসায়ে রূমাতুল কুবরা এবং ব্রিটানিকার বিভিন্ন নিবন্ধ।

কায়মনে তাঁর দ্বীনের প্রচার কার্যে রত থাকেন। তাদেরকে প্রচণ্ড বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে, উপর্যুপরি প্রতিকূলতার মুকাবেলা করতে হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকেন এবং এক সময়ে তারা যথেষ্ট সফলতাও অর্জন করেন। কিন্তু সফলতার সেই সন্ধিক্ষণে এমন একটি ঘটনা ঘটল, যদ্দরুণ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ঘুরে গেল। ঘটেছিল এই যে, শৌল নামক প্রসিদ্ধ ইয়াহুদী আলেম, যে কিনা এ যাবৎকাল খ্রিস্টধর্মের ঘোর বিরোধিতা করে আসছিল এবং এর অনুসারীদের উপর নানা রকম জুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছিল, হঠাৎ করেই এ ধর্মে ঈমান আনল এবং সে দাবি করল, 'দামেস্কের রাস্তায় আমার সামনে এক আলোর জ্যোতি দেখা দিল এবং আসমান থেকে হযরত মাসীহের আওয়াজ শোনা গেল 'তুমি আমাকে কষ্ট দিচ্ছ কেন?' এ ব্যাপারটা আমার উপর দারুণ প্রভাব ফেলেছে। এর ফলে খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে আমার অন্তরে পূর্ণ প্রত্যয় সঞ্চার হয়েছে।

শৌল হাওয়ারীদের কাছে গিয়ে তার এই পরিবর্তনের কথা জানালে তাদের অধিকাংশই এটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কিন্তু বার্নাবাস নামক হাওয়ারী বিশ্বাস করলেন। অতঃপর তাঁর দেখাদেখি অন্যসব হাওয়ারীর অন্তরেও বিশ্বাস জন্মাল। শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাকে নিজেদের ভ্রাতৃসংঘে শামিল করে নিলেন। শৌল নিজের নামও পরিবর্তন করে ফেলল। নতুন নাম গ্রহণ করল পৌল। এ ঘটনার পর সেও হাওয়ারীদের পাশাপাশি খ্রিস্টধর্মের প্রচারে আত্মনিয়োগ করল। এমনকি তার অক্লান্ত মেহনতের ফলে বহু অ-ইয়াহুদী লোকও খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হল। এ ভূমিকার কারণে খ্রিস্টধর্মের অনুসারীদের মধ্যে পৌলের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকল এবং সেই সুযোগে তাদের মধ্যে সে হযরত মাসীহের ঈশ্বরত্ব, প্রায়শ্চিত্ত, অবতারত্ব প্রভৃতি বেদ্বীনী আকীদা-বিশ্বাসের প্রচার শুরু করে দিল। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, এ পর্যায়ে কোন কোন হাওয়ারী প্রকাশ্যে পৌলের বিরোধিতা করেন, কিন্তু তার বেদ্বীনী আকীদা-বিশ্বাসের মূলোৎপাটনের জন্য তারা কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তী জীবন তারা কিভাবে অতিবাহিত করেছিলেন এসব বিষয় গভীর অন্ধকারের ভেতর পড়ে রয়েছে।[১] এরপর কেবল এতটুকুই জানা যায় যে, ক্রমে খ্রিস্টধর্মে পৌলের প্রভাব সকলকে ছাপিয়ে যেতে থাকে।

---

১. লুকের প্রেরিত পুস্তক হল হাওয়ারীদের একমাত্র জীবন বৃত্তান্ত। কিন্তু পৌলের বিরোধিতার পর হাওয়ারীগণ আর কি করেছেন সে সম্পর্কে এ পুস্তক সম্পূর্ণ নীরব। এ রচনার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আসছে পৌল কিভাবে খ্রিস্টধর্মকে বিকৃত করেছে।

অগ্নিপরীক্ষার কাল

খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর সূচনাকাল পর্যন্ত খ্রিস্টবাদ দুনিয়ায় একটি পরাস্ত ও নিগৃহীত ধর্মরূপে অস্তিত্ব রক্ষা করে আসছিল। খ্রিস্টান ঐতিহাসিকগণ এ সময়টাকে দমন-নিপীড়ন (Age of persecution)-এর যুগ নামে স্মরণ করে থাকে। রাজনৈতিক দিক থেকে তখন এ ধর্মের উপর ছিল রোমানদের আধিপত্য আর ধর্মীয় দিক থেকে ইয়াহুদীদের। রোমান ও ইয়াহুদী উভয় সম্প্রদায় খ্রিস্টানদেরকে নিপীড়ন করার ব্যাপারে একাট্টা ছিল। এ যুগের আরও একটা বৈশিষ্ট্য হল, তখনও পর্যন্ত খ্রিস্টধর্মের আকীদা-বিশ্বাস ও ইবাদত-উপাসনার রীতি-নীতি সংকলিত হয়নি। ফলে খ্রিস্টান জগতে এ ধর্ম বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। ক্লিমান্ট (মৃত ১০০ খ্রি.), এগনাশস (মৃত আনুমানিক ১১৭ খ্রি.), পেপিয়াস (মৃত ১২০ খ্রি.), পোলিক্যার্প (মৃত ১৫৫ খ্রি.), আইরিনিউস (খ্রি. ১৭৭) প্রমূখ এ যুগের খ্যাতনামা ধর্মজ্ঞ। এঁদের রচনা ও পত্রাবলীর উপরই খ্রিস্টধর্মের ভিত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

মহান কুসৃতানতীন

খ্রি. ৩০৬ সালটি খ্রিস্টবাদের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বছর। কেননা এ বছরই ১ম কুসতানতীন রোমান সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আসীন হন। তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং এ ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় করার প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এটাই সর্বপ্রথম ঘটনা যে, কোন রাষ্ট্রপ্রধান খ্রিস্ট সম্প্রদায়ের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করার পরিবর্তে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কনষ্টান্টিনোপল, সূর, জেরুজালেম ও রোমে বহু গীর্জা প্রতিষ্ঠা করেন এবং খ্রিস্টান ধর্মগুরুদেরকে বিভিন্ন বড় বড় উপাধি দিয়ে ধর্মীয় গবেষণার কাজে নিয়োজিত করেন। এ কারণেই তাঁর আমলে বিভিন্ন স্থানে খ্রিস্টান ধর্মজ্ঞদের বড়-বড় প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এসব সম্মেলনে ঈসায়ী আকীদা-বিশ্বাস ও ইবাদতের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। এর মধ্যে নিকাবী সম্মেলনটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। খ্রি. ৩২৫ সালে নিকিয়া (Nicaea) নামক স্থানে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বপ্রথম এ সম্মেলনেই ত্রিত্ববাদের বিশ্বাসকে ধর্মের মূল বিশ্বাসরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং এতে অবিশ্বাসকারীকে (যেমন আরিউস প্রমূখ) ধর্ম থেকে খারিজ ঘোষণা করা হয়। এ সম্মেলনে স্থিরীকৃত খ্রিস্টীয় আকীদা-বিশ্বাসসমূহ এথানশিয়ান বিশ্বাসমালা (Athanasian Creed) নামে খ্যাত।[১]

---

১. প্রকাশ থাকে যে, যে সকল বিশ্বাস এথানাশিয়ান বিশ্বাসমালা নামে খ্যাত তার রূপকার মূলত এথানশিস নন; বরং পরবর্তীকালের কেউ এগুলো সম্পাদন করেছে।

নিকিয়ায় অনুষ্ঠিত সে কাউন্সিল যদিও ধর্মের মৌল বিশ্বাসসমূহ স্থির করে দিয়েছিল, কিন্তু সে সব বিশ্বাস ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট ও জটিল। বহুকাল পর্যন্ত তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রচণ্ড মতবিরোধ চলতে থাকে। সেসব বিরোধের নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে বড়-বড় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হতে থাকে। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী ছিল এ সংক্রান্ত আলোচনা-পর্যালোচনা ও তর্ক-বিতর্কের যৌবনকাল, যে কারণে খ্রিস্টান ঐতিহাসিকগণ এ যুগকে 'সভা-সম্মেলনের যুগ' (Age of Councils) অথবা তর্ক-বিতর্কের যুগ (Controversy Period) নামে অভিহিত করেছেন।

কুস্‌তানতীন থেকে গ্রেগোরি পর্যন্ত

খ্রি. ৩১৩ থেকে ৫৩৯ পর্যন্ত সময়কালে রোম সাম্রাজ্যে খ্রিস্টধর্ম ব্যাপক প্রচার লাভ করেছিল। যদিও পৌত্তলিক ধর্ম তার পাশাপাশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রচার ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে খ্রিস্টধর্মই ছিল প্রধান। এ সময়ে রোমের আইন প্রণয়নকারী পরিষদ (Legislature)ও খ্রিস্টধর্ম দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল।

এ আমলের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল খ্রিস্টধর্মের বিভাজন। এ সময় খ্রিস্টধর্ম দু'টি সাম্রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর একটি ছিল পূর্বাঞ্চলীয় সাম্রাজ্য, যার রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল। বলকান, ইউনান, এশিয়া মাইনর, মিসর, হাবশা প্রভৃতি দেশসমূহ এ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানকার সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতাকে বলা হত প্যাট্রিয়াক (Patriarch)।

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যটি ছিল পশ্চিমাঞ্চলে, যার রাজধানী ছিল যথারীতি রোম। ইউরোপের অধিকাংশ এলাকাই এ সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। এখানকার সর্বোচ্চ ধর্মনেতাকে বলা হত পোপ। এ দুই সাম্রাজ্য ও ধর্মীয় শক্তিদ্বয়ের মধ্যে শুরু থেকেই বিরোধ-বিসংবাদ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। এদের প্রত্যেকেই আপন ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছিল।

এ আমলের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল রাহবানিয়াত বা বৈরাগ্যবাদের উৎপত্তি। মৌলিক যে ধারণার ভিত্তিতে এ কালচার জন্ম নিয়েছিল, তা হল, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন কেবল পার্থিব কাজ-কারবার পরিহার করার মাধ্যমেই সম্ভব। যত বেশি আত্মপীড়ন করা যাবে, আল্লাহর নৈকট্য তত বেশি হাসিল হবে। বস্তুত চতুর্থ শতাব্দী থেকেই এ জাতীয় ভাবনা শুরু হয়ে গিয়েছিল, যা পঞ্চম শতাব্দীতে ব্যাপক আকার লাভ করে। এ সময় ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিভিন্ন স্থানে বহু আশ্রম গড়ে ওঠে। তবে এ ভাবনাকে সর্বপ্রথম যিনি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন, তিনি হলেন ষষ্ঠ শতাব্দীর রাহিব (সন্যাসী) পাকম-মিসরী। পাকমের পর ব্যাসিল (Basile) ও জায়রোম ছিলেন এ মতবাদের বিখ্যাত নেতা।

অন্ধকার যুগ

৫৯০ খ্রিস্টাব্দে গ্রেগোরি প্রথম পোপ নির্বাচিত হয়েছিলেন। তার আমল থেকে শার্লিম্যান (৮০০ খ্রি./১৮৪ হি.) পর্যন্ত কালটি হল খ্রিস্টান ঐতিহাসিকদের বর্ণিত অন্ধকার যুগ ((Dark Ages)-এর প্রথম পর্ব। খ্রিস্টবাদের ইতিহাসে এ কালে রাজনৈতিক ও জ্ঞান-বিদ্যাগত অধঃপতন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এর একটা বড় কারণ ছিল এই যে, একেত এ সময়ে অতি দ্রুতগতিতে ইসলামের দিগ্বিজয় ঘটছিল, অন্যদিকে খ্রিস্টানদের মধ্যে বিভেদ-বিভক্তি মহামারি আকার ধারণ করেছিল।

এ যুগের গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। (এক) এ সময় পশ্চিমাঞ্চলের খ্রিস্টানগণ ইউরোপের বিভিন্ন এলাকায় খ্রিস্টধর্মের প্রচার শুরু করে দেয়। ব্রিটেন, জার্মানী প্রভৃতি দেশে প্রথমবারের মত রোমান খ্রিস্টানদের ধর্মীয় বিজয় সূচিত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে চার শতকের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার পর গোটা ইউরোপ খ্রিস্টান হয়ে যায়।

(দুই) এ যুগেই পারনের চূড়া থেকে ইসলাম-রবির উদয় ঘটে এবং দেখতে দেখতে অর্ধ জাহান তার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। পশ্চিমে মিসর, আফ্রিকা, আনদালুস ও সিকিল্লিয়া (Cicilia) এবং পূর্বে শাম ও ইরানের বিশাল সাম্রাজ্য মুসলিম শক্তির করতলগত হয়। এর ফলে বিশেষভাবে পূর্বাঞ্চলে খ্রিস্টীয় শাসনের বিদায় ঘণ্টা বেজে যায়।

মধ্য যুগ

৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে মধ্যযুগ (Mediaeval Era) বলা হয়। এ যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল পোপ ও সম্রাটের মধ্যকার আত্মকলহ। এ কলহ দীর্ঘকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আলফ্রেড এ. গার্বে এ যুগকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন।

(এক) শার্লিম্যান থেকে ৭ম গ্রেগোরি পর্যন্ত (৮০০ খ্রি./১৮৪ হি. থেকে ১০৭৩ খ্রি./৪৬৬ হি. পর্যন্ত) সময়কাল। এটা ছিল পোপদের উত্থান পর্ব।

(দুই) ৭ম গ্রেগোরি থেকে ৮ম বোনিফিয়াসের আমল পর্যন্ত (১০৭৩ খ্রি./৪৬৬ হি. – ১২৯৪ খ্রি./৬৯৩ হি.)। এ সময়ে পশ্চিম ইউরোপে পোপের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

(তিন) ৮ম বোনিফিয়াস থেকে সংস্কার কাল পর্যন্ত (১২৯৪ খ্রি./৬৯৩ হি. - ১৫১৭ খ্রি./৯২৩ হি.)। এ পর্বে পোপ-কর্তৃত্বের অবসান ঘটে এবং সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়ে যায়।[১]

মধ্যযুগে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে নিম্নে তার এক সংক্ষিপ্ত চিত্র পেশ করা গেল।

মহা কপটতা/বিভাজন

মহা কপটতা (Great Schism) হল খ্রিস্টধর্মের একটা পরিভাষা। এর দ্বারা পূর্ব ও পশ্চিমের চার্চসমূহের মধ্যকার সেই ঘোরতর বিরোধকে বোঝানো হয়, যার ফলে পূর্বাঞ্চলীয় চার্চ স্থায়ীভাবে রোমান ক্যাথলিক চার্চ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার নতুন নাম হয়ে যায় দি হোলি অর্থোডকস চার্চ (The Holy Orthodox Church)। এই মহা বিভাজনের কারণ তো বহু, তবে নিচে আমরা তার মধ্যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উল্লেখ করছি।

(এক) এই বিভক্তির প্রথম কারণ হচ্ছে পূর্ব ও পশ্চিমের চার্চসমূহের মধ্যকার চিন্তাধারাগত পার্থক্য। পূর্বাঞ্চলীয় চার্চের বিশ্বাস ছিল পাক-রূহের সত্তা কেবল পিতা থেকেই বের হয়েছে। পুত্র-সত্তা তার জন্য একটা মাধ্যম মাত্র। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলীয় চার্চের বক্তব্য হল, পাক রূহের সত্তা পিতা ও পুত্র উভয় থেকেই বের হয়েছে। এমনিভাবে পূর্বাঞ্চলীয় চার্চের বিশ্বাস মতে পুত্রের মর্যাদা পিতার নিচে, কিন্তু পশ্চিমের বিশ্বাস ছিল উভয় সমমর্যাদাসম্পন্ন। পশ্চিম সম্পর্কে পূর্বাঞ্চলীয় চার্চের অভিযোগ ছিল, তারা নিজেদের বিশ্বাস প্রমাণ করার জন্য নিকিয়ায় অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের ভেতর নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু শব্দ প্রক্ষেপণ করেছে, যা মূল সিদ্ধান্তের ভেতর ছিল না।

(দুই) পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্যের শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত ছিল। পশ্চিমে ছিল ইটালিয়ান ও জর্মন গোষ্ঠীর লোক আর পূর্বে ইউনানী ও এশিয়ান বংশোদ্ভূত লোক।

(তিন) রোম সাম্রাজ্য দুই খণ্ডে ভাগ হয়ে গিয়েছিল, যে কারণে কনস্টান্টিনোপল প্রাচীন রোমের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

---

১. এসব তথ্য এবং সামনে খ্রিস্টবাদের যে ইতিহাস বর্ণিত হচ্ছে তার উপাত্তসমূহ এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিওন এন্ড এথিক্স, নিবন্ধ Christianity, ৩য় খণ্ড, ৫৮৯-৫৯৬ পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত।

(চার) তা সত্ত্বেও রোমান পোপ কিছুতেই নিজ কর্তৃত্ব ও আধিপত্য কনস্টান্টিনোপলের প্যাট্রিয়াকের হাতে অর্পণ করতে বা তাকে নিজের হিস্যাদার বানাতে প্রস্তুত ছিল না।

(পাঁচ) এসব কারণে বিচ্ছিন্নতা ছিল কেবলই সময়ের ব্যাপার। আয়োজন সব তৈরিই ছিল। এরই মধ্যে পোপ নবম লিও ১০৫৪ খ্রি./৪৪৬ হি. সালে পশ্চিমের আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা পূর্বের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু কনস্টান্টিনোপলের প্যাট্রিয়াক মীকাইল তা মানতে অস্বীকার করল। ওদিকে ইউরোপের দূতগণ আয়াসোফিয়া গীর্জার বলিদানস্থলে অভিসম্পাতমূলক বাক্যাদি লিখে দিল। ব্যস, এ ঘটনা তপ্ত লোহায় হাতুড়ির শেষ বাড়ি বসিয়ে দিল এবং এভাবে মহাবিভাজন সূচিত হয়ে গেল।[১]

ক্রুসেড যুদ্ধ

এ যুগের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ক্রুসীয় যুদ্ধ, যাকে খ্রিস্টান ঐতিহাসিকগণ ক্রুসেড (Crusede) নামে স্মরণ করে থাকে। হযরত উমর (রাযি.)-এর আমলে বায়তুল মুকাদ্দাস, শাম ও ফিলিস্তিন মুসলিমদের হাতে বিজিত হয়েছিল। তখনকার পরিস্থিতিতে খ্রিস্টান জগতের পক্ষে আত্মরক্ষা করাটাই ছিল অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কাজেই তাদের পক্ষে অগ্রগামী হয়ে এসব পবিত্র ভূমি পুনরুদ্ধার করার চিন্তা করাও সম্ভব ছিল না। তবে পরবর্তীকালে মুসলিমদের ক্রমবর্ধমান বিজয়বেগ যখন একটা পর্যায়ে পৌছে থমকে গেল এবং তাদের মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা দেখা দিল, তখন খ্রিস্টান রাজা-বাদশাহগণ তাদের ধর্ম-নেতাদের ইশারায় বায়তুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের সংকল্প গ্রহণ করল। তারা একের পর এক তুর্কী সেলজুকী ও আইউবী সুলতানদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে গেল। এসব যুদ্ধের আগে ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেডের কোন ধারণা খ্রিস্টধর্মে ছিল না। কিন্তু ১০৯৫ খ্রি./৪৮৮ হি. সালে পোপ দ্বিতীয় অরবান ক্লেরমোন্ট (Clermont)-এর কাউন্সিলে ঘোষণা করে দেন যে, ক্রুসেড হল ধর্মযুদ্ধ। সি. পি. এম ক্লার্ক তাঁর 'চার্চের ইতিহাস' গ্রন্থে এ ঘোষণার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখেন,

মানুষকে উদ্দীপিত করার লক্ষ্যে অরবান ঘোষণা করে দেন, যে ব্যক্তিই এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে তার পাপমোচন অবধারিত। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

১. Adeney, The Greek and Eastern Churches P. 241, as quoted by the Ency. of Religion and Ethics P. 590 V. 3

ওয়াসাল্লাম)-এর মত তিনিও প্রতিশ্রুতি দেন, যারা এ যুদ্ধে মারা যাবে, তারা সোজা জান্নাতে চলে যাবে।[১]

এভাবে সর্বমোট ক্রুসেড হয় সাতটি। সর্বশেষ যুদ্ধে খ্রিস্টানগণ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে।[২]

পোপদের হঠকারিতা

ক্রুসেডের পর পোপদের ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল। পোপ চতুর্থ ইন্নোসেন্টের আমল (১২৪৩ খ্রি./৬৪১ হি.) থেকে তাদের প্রভাব যথারীতি বিলুপ্ত হতে শুরু করল। এর কারণ, চতুর্থ আন্নোসেন্ট আপন পদমর্যাদাকে অন্যায় স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। রাজনৈতিক ও পার্থিব স্বার্থে ব্যবহার করে পোপের পদকে তিনি বিতর্কিত করে তুলেছিলেন। তার আমলে 'মুক্তিপত্রের' ব্যবসা বেশ রমরমা হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে প্রতিপক্ষের লোকদেরকে ক্ষমার বদলে জ্যান্ত পুড়ে মারার শাস্তি চালু করা হয়েছিল। তার পরবর্তী পোপগণ এই দুরাচারবৃত্তিকে চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। পোপ অষ্টম বোনিফিয়াস (Bonifatius) রাজা ১ম এডওয়ার্ড এবং ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ ফিলিপের সঙ্গে চরম শত্রুতায় লিপ্ত হয়। এর পরিণামে রোমান সাম্রাজ্যে দীর্ঘ একাত্তর বছর (১৩০৫ খ্রি./৭০৪ হি.-১৩৭৬ খ্রি./৭৭৯) পোপত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত থাকে। এ সময়ে পোপ ফ্রান্সে অবস্থান করত, যে কারণে এ কালকে 'ব্যাবিলনের নির্বাসন' নামে স্মরণ করা হয়ে থাকে।

অতঃপর ১৩৭৮ খ্রি./৭৮০ হি. থেকে ১৪১৩ খ্রি./৮১৬ হি. পর্যন্ত এক নতুন বিপত্তি চলতে থাকে। এ সময়কালে খ্রিস্টজগতে একের পরিবর্তে দু'জন পোপ নির্বাচিত হতে থাকে। তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান বলে দাবি করত। তাদেরকে যথারীতি কার্ডিনালদের ভোটে নির্বাচিত হতে হত। এক পোপ নির্বাচিত হত ফ্রান্স, স্পেন, ন্যাপলেস (Naples) প্রভৃতি এলাকার জন্য। তাকে বলা হত অ্যাভিনন পোপ (Avignon Pope)। আর দ্বিতীয় পোপ নির্বাচিত হত ইটালি, ইংল্যাণ্ড ও জার্মানির জন্য। তাকে বলা হত রোমান পোপ। এই বিচ্ছিন্নতাকেও কোন কোন ঐতিহাসিক মহা বিভাজন নামে আখ্যায়িত করেছেন।

---

১. Clark, Short History of the Charch, P. 204

২. এসব যুদ্ধ এবং এর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট জানার জন্য দেখুন মেজর জেনারেল মোহাম্মাদ আকবর খানের সারগর্ভ রচনা 'ক্রুসেড আওর জিহাদ', সিন্ধ সাগর একাডেমি, লাহোর ১৯৬১ খ্রি.।

সংস্কার ও সংশোধনের ব্যর্থ চেষ্টা

পোপদের অবিমৃষ্যকারিতা যখন চরম পর্যায়ে, তখন বহু সংস্কারক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানোর লক্ষ্যে কাজ করেছেন। তাদের মধ্যে ইউক্লিফ (Wychiff মৃত ১৩৮৪ খ্রি./৭৮৬ হি.)-এর নাম সবার শীর্ষে। তিনি চার্চের উদ্ভাবিত বিদআত (নতুন নতুন রীতি-রেওয়াজ)-এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। তার দাবি ছিল, পুণ্যবান পরহেজগার ব্যক্তিকে পোপ মনোনীত করা হোক। সর্বপ্রথম তিনিই ইংরেজি ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন, যা ১৩৮৫ খ্রি./৭৮৭ হি. সালে প্রকাশিত হয়। এর আগে অন্য কোন ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করাকে একটি মহাপাপ গণ্য করা হত। তাঁর শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে জন হাস (John Huss) ও জেরোম (Jerome) সংস্কারকার্যের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, কিন্তু তখনও পর্যন্ত পরিবেশ-পরিস্থিতি সংস্কারকর্মের অনুকূল ছিল না।

পোপদের বিভেদ ও মহা বিভাজনের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে ১৪০৯ খ্রি./৮১২ হি. সালে পিসার কাউন্সিল (Council of pisa) ডাকা হয়। এতে আশিজন বিশপ অংশগ্রহণ করেন। তারা বিদ্বেষপরায়ণ উভয় পোপকে অপসারণ করে পঞ্চম আলেকজাণ্ডারকে পোপ নির্বাচিত করেন। কিন্তু এ নির্বাচনের পর পরই তার মৃত্যু হয়ে যায়। অতঃপর তেইশতম জন নামক এক জলদস্যুকে পোপ নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু তিনি তার সমকালীন পোপদের আনুগত্য লাভে সক্ষম হননি। ফল দাঁড়ালো এই যে, এখন চার্চের পোপ দু'য়ের স্থলে তিনজন হয়ে গেল। আর এভাবে চার্চের বিভাজনে আরও মাত্রা যোগ হল।

পরিশেষে ১৪১৪ খ্রি./৮১৭ হি. সালে কন্সট্যান্স (Constance) নামক স্থানে একটি কাউন্সিল ডাকা হল। এ কাউন্সিলে মহা বিভাজনের অবসান ঘটল বটে, কিন্তু একই সঙ্গে জন হাসের সংস্কার কর্মসূচি সর্বসম্মতিক্রমে বিদআত ও অগ্রাহ্য সাব্যস্ত হল এবং এরূপ কর্মসূচি দেওয়ার অপরাধে জন হাস ও তার শিষ্য জিরোমকে আগুনে পুড়ে হত্যা করা হল। আর এভাবে পোপদের অনৈতিক কার্যাবলী ও ধর্মীয় স্বেচ্ছাচারিতা যথারীতি বহাল থেকে গেল।

কিন্তু জন হাসের আন্দোলন যেহেতু ছিল জাগ্রত চেতনার আন্দোলন, যা জুলুম-নিপীড়নে স্তব্ধ হওয়ার নয়, তাই তাঁর শিক্ষায় প্রভাবিত লোকদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এক পর্যায়ে পোপ প্রমাদ গণলেন এবং তাঁর ক্ষমতার মসনদ কেঁপে উঠল। উপায়ান্তর না দেখে ১৪৩১ খ্রি./৮৩৪ হি. সনে তিনি বাসিল নামক স্থানে সম্মেলন ডাকলেন। এ সম্মেলনে দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে সংস্কার আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টা করা হল, কিন্তু তা বিশেষ ফলপ্রসূ হল না।

সংস্কার প্রচেষ্টা ও প্রটেষ্ট্যান্ট সম্প্রদায়

১৪৮৩ খ্রি./৮৮৮ হি. সনে প্রটেষ্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মার্টিন লুথার জন্মগ্রহণ করেন। পোপবাদের কফিনে সর্বশেষ পেরেকটি তিনিই মারেন। সর্বপ্রথম তিনি 'ক্ষমাপত্র'-এর ব্যবসার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। মানুষ এ ডাকে সাড়া দিলে তিনি পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি পোপদের সীমাহীন ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন ব্যাপটাইজ ও প্রভুর নৈশভোজ ছাড়া আর যত প্রথা আছে সবই পোপদের মনগড়া। আমরা তা পালন করতে বাধ্য নই। ওদিকে সুইজারল্যাণ্ডে জ্যুইংলী (Zwingli)-ও একই আওয়াজ তোলেন। তাদের পর ষোড়শ খ্রিস্টাব্দের সূচনাকালে জেনেভায় জন ক্যালভিন এ আন্দোলন নিয়ে এগিয়ে চলেন। দেখতে না দেখতে এ রব ফ্রান্স, ইটালি, জার্মানিসহ ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশেই জোরদার হয়ে ওঠে। পরিশেষে ইংল্যাণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরি এবং চতুর্থ এডওয়ার্ডও এ আন্দোলনে বেশ প্রভাবিত হন। এভাবে প্রটেষ্ট্যান্ট সম্প্রদায় ক্যাথলিক চার্চের এক শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে।

বুদ্ধিবৃত্তিক আমল

যুক্তিবাদের যুগ

ইতোমধ্যে গোটা ইউরোপে বস্তুতান্ত্রিক মহা পরিবর্তন ঘটে যায়। রেনেসাঁ-উত্তর ইউরোপ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিক থেকে দুনিয়ার বাদবাকি অংশকে পেছনে ফেলে বহুদূর এগিয়ে যায়। এর ফলে ইউরোপের যেসব জাতি এ যাবৎকাল গুহার জীবন যাপন করছিল, তারা সব জেগে উঠল। তারা চৈতন্যপ্রাপ্ত হল। তারা দেখতে পেল পোপগণ কতটা জ্ঞানবিদ্বেষী, তারা কী পরিমাণ দুর্নীতিবাজ। তারা যখন উপলব্ধি করল পোপগণ ধর্মেরই ছত্রছায়ায় এসব অন্যায়- অনাচার করছে, তখন তারা ধর্মের প্রতি ভীষণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল। চার্চের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সূচনা তো করেছিলেন মার্টিন লুথার এবং তিনিই বাইবেলের ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণে পূর্বসূরীদের বিপরীত অবস্থান গ্রহণের দুঃসাহস করেছিলেন, কিন্তু যা করার হিম্মত তিনিও দেখাতে পারেননি, তার খুলে দেওয়া পথে পরবর্তীগণ সেটাই করে দেখাল। মার্টিন লুথার তো বাইবেলের কেবল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেই স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করেছিলেন, খোদ বাইবেলের বিশ্বস্ততায় কোন রকম প্রশ্ন তোলার সাহস তাঁর হয়নি। কিন্তু তার পরবর্তীকালে যে সকল চিন্তাবিদ যুক্তিবাদ (Rationalism)-এর স্লোগান নিয়ে ময়দানে নামেন; তারা তাদের সমালোচনার ব্যাপারে বাইবেলকেও কোনরূপ ছাড়

দেননি। তারা একেকটি করে খ্রিস্টধর্মের সমস্ত আকীদা-বিশ্বাসকে নিন্দা-সমালোচনা এমনকি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের নিশানা বানিয়ে নিয়েছিলেন।

তাদের স্লোগান ছিল, ধর্মের প্রতিটি ধারণাকে বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হবে। আমাদের বোধগম্য নয় এমন কোন কথা আমরা মানতে প্রস্তুত নই; বরং তা আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করা হবে। তাতে এ রকম আকীদা-বিশ্বাসের সংখ্যা যত বেশিই হোক না কেন এবং চার্চ যত দীর্ঘকালই সেগুলোকে পবিত্রতার লেবাস পরিয়ে বুকে জড়িয়ে রাখুক না কেন। এ চিন্তার অনুসারীগণ নিজেদেরকে যুক্তিবাদী (Rationalist) এবং নিজেদের যুগকে যুক্তিবাদের যুগ (Age of Reason) নামে অভিহিত করত।

উইলিয়ম শিলিংগওয়ার্থ (William Shilligworth ১৬০২ খ্রি./১০১২ হি. – ১৬৪৪ খ্রি./১০৫৪ হি.) এ সম্প্রদায়ের সর্বশীর্ষ নেতা। সর্বপ্রথম তিনিই যুক্তিবাদের স্লোগান তোলেন।[১] তাছাড়া লর্ড হার্বার্ট (১৫৮৩ খ্রি./৯৯১ হি. – ১৬৪৮ খ্রি./১০৫৮ হি.), থমাস হোবস (Thomas Hobbes ১৫৮৮ খ্রি./৯৯৬–১৬৭১ খ্রি./১০৮২ হি.) প্রমূখ এ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতা ছিলেন।

যুক্তিবাদের এ উন্মাদনা চরম আকার ধারণ করলে এর থাবা থেকে কোন আকীদাই নিস্তার পায়নি। এমনকি এহেন বাতাবরণে ভলটেয়ার (Voltaire ১৬৯৪ খ্রি./১১০৫ হি. – ১৭৮৮ খ্রি./১২০২ হি.)-এর মত বেদ্বীনেরও উদ্ভব হয়, যে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দেহের বীজ বুনে দেয়। এরপর তো প্রকাশ্যেই আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব অস্বীকার করা শুরু হয়ে যায়। এ কালের বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল হলেন এ শ্রেণীর সর্বশেষ প্রতিনিধি,[২] যিনি এখনও পর্যন্ত জীবিত আছেন।[৩]

আধুনিকায়নের প্রচেষ্টা

ধার্মিকদের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদীদের এ আন্দোলন দু'রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কিছু লোক তো এ আন্দোলনে প্রভাবিত হয়ে ধর্মের ভেতর কিছু পরিবর্তন ও সংশোধনী আনয়নের প্রয়োজন বোধ করল। তাদের প্রচেষ্টাকে আধুনিকায়ন (Modernism)-এর আন্দোলন নামে অভিহিত করা হয়। তাদের মত ছিল, ধর্ম মৌলিকভাবে সঠিক, কিন্তু তার যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা ভুল। বাইবেলের ভেতর এ পরিমাণ স্থিতিস্থাপকতা রয়েছে যে, প্রত্যেক যুগের নতুন

১. Clarke, Short Histooy of the Church P. 394

২. খ্রিস্টবাদ ও ধর্ম সম্পর্কে তার বৈরীসুলভ চিন্তাধারা জানতে হলে তার বিখ্যাত প্রবন্ধ 'আমি খ্রিস্টান নই কেন?' (Why I am not a Christian) পড়ে দেখুন।

৩. এ রচনার কিছুকাল পরেই ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়– অনুবাদক।

আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাথে তার সমন্বয় সাধন সম্ভব। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাইবেলের কম গুরুত্বপূর্ণ অংশকে অগ্রাহ্যও করা যেতে পারে এবং প্রয়োজনে যুগ-যুগ ধরে চলে আসা শব্দ ও অর্থের উপর ছুরি চালনাও করা যাবে।

ড. পোললেইনের বর্ণনা অনুযায়ী এ শ্রেণীর অগ্রনায়ক ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক রুশো (Rousseau)। নিকট-অতীতে প্রফেসর হ্যারনেক (Harnack) ও রিন্যান (Renan) ছিলেন এদের প্রসিদ্ধ ও সুযোগ্য মুখপাত্র।[১]

পুনর্জীবন দানের আন্দোলন

যুক্তিবাদীদের আন্দোলনে দ্বিতীয় যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তা ছিল প্রথমোক্ত প্রতিক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত। খ্রিস্টধর্মের কোন কোন মহল যুক্তিবাদকে প্রতিহত করার জন্য খালেস রোমান ক্যাথলিক ধর্মকে নব জীবন দানের আন্দোলন শুরু করে দেয়। এ আন্দোলনকে Catholic Revival Movement বলা হয়ে থাকে।

এ আন্দোলনের ধজাধারীগণ যুক্তিবাদীদের বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ শুরু করে দেয়। তারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করল খ্রিস্টধর্ম সেটাই, যা আমাদের পূর্বসূরীগণ বুঝেছিলেন এবং যা তাদের কাউন্সিলসমূহের ফায়সালার মাধ্যমে এ পর্যন্ত চলে আসছে। তারা আরও ঘোষণা করল ধর্মের ব্যাপারে চার্চেরই হওয়া উচিত সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ক্যাথলিক চার্চ যে আকীদা-বিশ্বাস প্রচার করে তাতে রদ-বদলের কোন সুযোগ নেই। এ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে। এটা সেই আমল, যখন পাশ্চাত্যবাসী বস্তুবাদের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট পরিমাণে হাসিল করে ফেলেছে অবশেষে তার নখরাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পেছনে ফিরে আসতে শুরু করেছে। জড়সভ্যতা পাশ্চাত্য জীবনে যে চরম অস্থিরতা ও অশান্তি সৃষ্টি করেছিল তার ফলশ্রুতিতে পুনরায় আত্মা ও আত্মিক জগতের প্রতি মনোযোগী হওয়ার চেতনা চাঙ্গা হয়ে উঠছিল। যারা এ চেতনার স্পর্শ পেয়েছিল পুনরুজ্জীবন দানের আন্দোলন তাদের অন্তরে বেশ সাড়া জাগাল। তারা আরেকবার খ্রিস্টবাদের প্রাচীন সেই চিন্তা-চেতনার কোলে ঝাঁপ দিল, যা ইতঃপূর্বে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে খ্রিস্টান জগতকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিল। এ আন্দোলনের ঝাণ্ডাবাহীদের মধ্যে আলেকজাণ্ডার নক্স (Alexender Knox ১৭৫৭ খ্রি.১১৬৯ হি–১৮৩১ খ্রি./১২৪৭ হি.), জন হেনরি নিউম্যান (১৮০১ খ্রি.

১. হ্যারনেক প্রণীত 'খ্রিস্টধর্মের পরিচয়' সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একখানি চিন্তা-উদ্দীপক কালজয়ী গ্রন্থ। লেখক এ গ্রন্থে হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম যে মানুষ ছিলেন এ বিষয়টা খ্রিস্টান জগতের সামনে প্রমাণসিদ্ধরূপে পেশ করেছেন। What is Christianity নামে গ্রন্থখানির ইংরেজি অনুবাদ বারবার প্রকাশিত হয়েছে।

১২১৬ হি.–১৮৯০ খ্রি. ১৩০৮ হি.), হিউরেল ফ্রাউড (Hurrel Froude ১৮০৩ খ্রি./১২১৮ হি.–১৮৩৬ খ্রি./১২৫২ হি.) ও রিচার্ড উইলিয়াম চার্চ (১৮১৫ খ্রি./১২৩০ হি.–১৮৯০ খ্রি./১৩০৮ হি.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

খ্রিস্টান জগতে অদ্যাবধি যুক্তিবাদ, আধুনিকায়ন ও পুনরুজ্জীবন দান –এ তিনও প্রকার আন্দোলন যথারীতি তৎপর আছে এবং তিনও শ্রেণীর প্রতিনিধি বিপুল সংখ্যায় পাওয়া যাচ্ছে।

আহা! কেউ যদি তাদেরকে জানাত, তোমরা শৈথিল্য ও বাড়াবাড়ির যে চোরাবালিতে আটকে আছ, আরবের শুষ্ক মরুভূমি ছাড়া আর কোথাও তা থেকে মুক্তির পথ পাওয়া যাবে না। জীবন পথের বিভ্রান্ত যাত্রীদল সর্বদা সেখানেই গন্তব্যের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে। তোমরা তো পোপবাদ থেকে শুরু করে নাস্তিক্যবাদ পর্যন্ত সব রকমের মত-পথ পরীক্ষা করে দেখেছ। কোন বিকল্পই তোমাদের যন্ত্রণা প্রশমনে কিছুমাত্র কাজে আসেনি। তোমরা যদি স্বস্তি ও সুখের সন্ধান পেতে চাও, তবে চৌদ্দশ' বছর আগে পারনের চূড়া[১] থেকে উদিত পারাক্লিত[২] সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্তির যে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে গেছেন একটিবার তাও পরীক্ষা করে দেখ। হাঁ, পারণের সেই পারাক্লিত, যাকে দেখে শেলার[৩] লোকেরা আনন্দে কাওয়ালী গেয়েছিল, কায়দারীয়দের[৪] গ্রামগুলো প্রশংসা করেছিল, যার পায়ের উপর পাথরের প্রতিমাগুলি মুখ থুবড়ে পড়েছিল[৫] এবং যিনি নিজ থেকে কোন কথা বলেননি; বরং যা কিছু শুনেছেন, তাই তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।[৬] যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন না করবে, ততক্ষন গন্তব্যের সেই ঠিকানা খুঁজে পাবে না, যেখানে গেলে আত্মার প্রশান্তি ও হৃদয়ের স্বস্তি লাভ হয়।

পৌঁছে যাও মোস্তফার দ্বারে, যদি লভিতে চাও দ্বীন।
তাঁকে ছেড়ে ভাই যেথা যাবে তুমি,
আবু লাহাবী মন্ত্রণা ছাড়া পাবে না কিছু।

---

১. দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩ : ২
২. ইউহোন্না ১৪ : ১৭
৩. ইশাইয়া ৪২ : ১১
৪. ইশাইয়া ৪২ : ১১
৫. ইশাইয়া ৪২ : ১৭
৬. ইউহোন্না ১৬ : ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

খ্রিস্টবাদের জনক কে?

খ্রিস্টান ভাইদের দাবি হল, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামই এ ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁরই শিক্ষার উপর বর্তমান খ্রিস্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমরা যতদূর অনুসন্ধান করেছি, তার ফলাফল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। একথা তো সত্য যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ইসরাঈলী জাতির কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং তিনি তাদেরকে একটি নতুন ধর্মের শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু অনুসন্ধান ও গবেষণার পর যে বাস্তবতা উন্মোচিত হয় তা এই যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যে ধর্মের শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা তাঁর পরবর্তীকালে বেশি দিন স্থায়ী হয়নি; বরং তা অল্প-দিনের ভেতরই বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং এমন একটি ধর্ম তার স্থান দখল করে নেয়, যার শিক্ষা ও নির্দেশনা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বাণী ও নির্দেশনাবলীর সম্পূর্ণ বিপরীত। এ নতুন ধর্মই বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর পার হয়ে আজ 'খ্রিস্টবাদের' বর্তমান রূপ ধারণ করেছে।

আমরা পরিপূর্ণ সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে অনুসন্ধান কর্ম চালিয়ে পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, প্রচলিত খ্রিস্টধর্মের প্রকৃত জনক হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নন; বরং সেন্ট পৌল, যার চৌদ্দটি চিঠি বাইবেলে সন্নিবেশিত রয়েছে।

পৌলের পরিচয়

আমরা আমাদের দাবির সপক্ষে দলিল-প্রমাণ পেশ করার এবং আমাদের গবেষণা ও অনুসন্ধানের সারাৎসার পেশ করার আগে পৌলের পরিচয় দান জরুরি মনে করছি।

পৌলের জীবন বৃত্তান্তের প্রথম দিক বলতে গেল অন্ধকারে ঢাকা। অবশ্য প্রেরিত পুস্তক ও তাঁর লেখা পত্রাবলী দ্বারা এতটুকু জানা যায় যে, শুরু দিকে তিনি বিনয়ামীন গোত্রের একজন গোঁড়া ফরীশী ইহুদী ছিলেন। তার আসল নাম ছিল শৌল। ফিলিপীয়দের নামে লেখা পত্রে তিনি নিজের সম্পর্কে লেখেন,

আট দিনের দিন আমাকে খতনা করানো হয়েছিল। ইসরাঈল জাতির মধ্যে বিনইয়ামীনের বংশে আমার জন্ম। আমি একজন খাঁটি ইবরানী। মূসার শরীয়ত পালনের ব্যাপারে আমি একজন ফরীশী। (ফিলিপীয় ৩ : ৫)

তিনি ছিলেন রোমের তার্ষ শহরের অধিবাসী (যেমন প্রেরিত ২২ : ২৮-এর বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়)।

তাঁর প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত ইশারাসমূহের পর তাঁর সম্পর্কে সর্বপ্রথম আলোচনা পাওয়া যায় প্রেরিত পুস্তকে (৭ : ৫৮)। সেখানে তার নাম বলা হয়েছে শৌল। অতঃপর প্রেরিত পুস্তকের তিনটি পরিচ্ছেদে তার যে বৃত্তান্ত পেশ করা হয়েছে, তার সারমর্ম হল, তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শিষ্যগণ ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসীদের ঘোর শত্রু ছিলেন। দিবা-রাত্র তাদের উৎপীড়ন করা ও তাদের মূলোৎপাটনের ফন্দি-ফিকিরে থাকতেন। এ অবস্থাতেই সহসা একদিন তিনি দাবি করলেন,

'আমি নিজেই বিশ্বাস করতাম, নাসরাতের ঈসার বিরুদ্ধে যা করা যায় তার সবই আমার করা উচিত, আর ঠিক তা-ই আমি জেরুজালেমে করছিলাম। প্রধান ইমামদের কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়ে আমি ঈসায়ী ঈমানদার অনেককে জেলে দিতাম এবং তাদের হত্যা করবার সময় তাদের বিরুদ্ধে ভোট দিতাম। তাদের শাস্তি দেবার জন্য আমি প্রায়ই এক মজলিস-খানা থেকে অন্য মজলিস-খানায় যেতাম এবং ঈসার বিরুদ্ধে কথা বলবার জন্য আমি তাদের উপর জোর খাটাতাম। তাদের উপর আমার এত রাগ ছিল যে, তাদের উপর জুলুম করবার জন্য আমি বিদেশের শহরগুলোতে পর্যন্ত যেতাম। এভাবে একবার প্রধান ইমামদের কাছ থেকে ক্ষমতা ও হুকুম নিয়ে আমি দামেস্কে যাচ্ছিলাম। মহারাজ, তখন বেলা প্রায় দুপুর। পথের মধ্যে সূর্যের থেকেও উজ্জ্বল একটা আলো আসমান থেকে আমার ও আমার সঙ্গীদের চার দিকে জ্বলতে লাগল। আমরা সবাই মাটিতে পড়ে গেলাম এবং আমি শুনলাম হিব্রু ভাষায় কে যেন আমাকে বলছেন, শৌল, শৌল, কেন তুমি আমার উপর জুলুম করছ? কাঁটা বসানো লাঠির মুখে লাথি মেরে কি তুমি নিজের ক্ষতি করছ না? তখন আমি বললাম, প্রভু আপনি কে? প্রভু বললেন, আমি ঈসা, যার উপর তুমি জুলুম করছ। এখন ওঠো, তোমার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও। সেবাকারী ও সাক্ষী হিসেবে তোমাকে নিযুক্ত করবার জন্য আমি তোমাকে দেখা দিলাম। তুমি আমাকে যেভাবে দেখলে এবং আমি তোমাকে যা দেখাব তা তুমি অন্যদের কাছে বলবে। তোমার নিজের লোকদের ও অ-ইহুদীদের হাত থেকে আমি তোমাকে রক্ষা করব। তাদের চোখ খুলে দেবার জন্য ও অন্ধকার

থেকে আলোতে এবং শয়তানের শক্তির হাত থেকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে আনবার জন্য আমি তোমাকে তাদের কাছে পাঠাচ্ছি, যেন আমার উপর ঈমানের ফলে তারা গুনাহের মাফ পায় এবং যাদের পবিত্র করা হয়েছে তাদের মধ্যে স্থান পায় (প্রেরিত ২৬ : ৯–১৮)।[১]

পৌলের দাবি ছিল, 'এ ঘটনার পর আমি প্রভু ইয়াসূ মাসীহের উপর ঈমান এনেছি।' এরপর তিনি তার নামও পরিবর্তন করে ফেলেন। শৌল ছেড়ে নতুন নাম ধারণ করলেন পৌল। প্রথম দিকে তিনি যখন এ দাবি করেছিলেন, তখন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শিষ্যদের মধ্যে কেউ তাঁর কথা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিলেন না। কেননা যে ব্যক্তি কি না কাল পর্যন্ত হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম ও তাঁর শিষ্যদের প্রাণের শত্রু ছিল, হঠাৎ করেই সে আজ সাচ্চা দিলে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে গেল? কিন্তু পরে সর্বপ্রথম বিশিষ্ট শিষ্য বার্নাবাস তাঁর কথা বিশ্বাস করলেন। তাঁর মত ব্যক্তি যখন বিশ্বাস করলেন, তখন অন্যদেরও আস্থা জন্মাল। প্রেরিত পুস্তকে আছে,

শৌল জেরুজালেমে এসে উম্মতদের সাথে যোগ দিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তারা সবাই তাকে ভয় করতে লাগল। তারা বিশ্বাস করতে পারল না যে, শৌল সত্যিই একজন উম্মত হয়েছেন। কিন্তু বার্ণাবাস তাকে সঙ্গে করে সাহাবীদের কাছে নিয়ে গিয়ে তাদের জানালেন, দামেস্কের পথে শৌল কিভাবে হযরত ঈসাকে দেখতে পেয়েছিলেন এবং ঈসা তার সঙ্গে কিভাবে কথা বলেছিলেন আর দামেস্কে ঈসার সম্বন্ধে তিনি কিভাবে সাহসের সঙ্গে তাবলীগ করেছিলেন। এরপরে শৌল জেরুজালেমে উম্মতদের সঙ্গে রইলেন এবং তাদের সঙ্গে চলাফেরা করতেন ও প্রভুর বিষয়ে সাহসের সঙ্গে তাবলীগ করে বেড়াতেন। যে ইহুদীরা গ্রীক ভাষা বলত তাদের সঙ্গে তিনি কথা বলতেন ও তর্ক করতেন, কিন্তু এই ইহুদীরা তাকে হত্যা করবার চেষ্টা করতে লাগল। ঈমানদার ভাইয়েরা এই কথা শুনে তাকে সিজারিয়া শহরে নিয়ে গেলেন এবং পরে তাকে তার্ষ শহরে পাঠিয়ে দিলেন (প্রেরিত ৯ : ২৬–৩০)।

এরপর পৌল হাওয়ারীদের সাথে মিলেমিশে খ্রিস্টধর্মের প্রচার করতে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনি খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠতম ধর্মগুরু রূপে বরিত হলেন,

গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তা এই যে, খ্রিস্টধর্মের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারার আসল প্রবর্তক এই ব্যক্তিই।

১. এটা রাজা আগ্রিপ্পর সামনে দেওয়া পৌলের ভাষণের অংশবিশেষ।

আর এসব তারই মস্তিষ্কপ্রসূত। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কখনই এর তালীম দেননি।

হযরত ঈসা (আ.) ও পৌল

আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি বহু দলিল-প্রমাণ ও সাক্ষী-সবুতের ভিত্তিতে। আমরা এখানে সর্বপ্রথম দেখাব হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও পৌলের শিক্ষার মধ্যে কতটা পার্থক্য এবং তা কি পরিমাণ পরস্পর-বিরোধী।

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা খ্রিস্টান পণ্ডিতদের নির্ভরযোগ্য বরাতে প্রমাণ করে এসেছি যে, খ্রিস্টধর্মের ভিত্তি হল, ত্রিত্ববাদ, অবতারত্ব ও পাপমোচন- এই তিনটি বিশ্বাসের উপর। খ্রিস্টধর্মে এ তিনটি এমনই মৌল বিশ্বাস যে, এর থেকে কেউ এক চুল পরিমাণ সরে গেলে খ্রিস্টান আলেমগণ তাকে ধর্মচ্যুত, বেদ্বীন ও কাফের আখ্যায়িত করে আসছেন। বস্তুত এসব বিশ্বাসের ভিত্তিতেই প্রচলিত খ্রিস্টবাদ অন্যান্য ধর্ম থেকে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলছে। কিন্তু মজার কথা হল, এ বিশ্বাসত্রয়ের মধ্যে একটিও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কোন বাণী দ্বারা প্রমাণিত নয়। প্রচলিত ইনজীলসমূহে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের যেসব উক্তি বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে এমন একটিও নেই, যা দ্বারা পরিষ্কারভাবে এসব আকীদা প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে ইনজীলসমূহে তার এমন বহু উক্তি বিধৃত আছে, যা দ্বারা এসব আকীদা রদ ও বাতিল হয়ে যায়।

ত্রিত্ববাদ ও অবতারত্বে বিশ্বাস

সর্বপ্রথম ত্রিত্ববাদকেই ধরুন। 'তিনে এক ও একে তিন' এই গোলক ধাঁধাকে যদি সঠিক এবং নাজাতের শর্ত বলে স্বীকারও করে নেওয়া হয়, তবে একথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিষয়টা অত্যন্ত জটিল, গোলমেলে ও অস্পষ্ট এবং মানব-বুদ্ধি এটা বুঝতে সক্ষম নয়। এটা বোঝার উপায় ছিল একটাই যে, ওহীর মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করে দেওয়া হবে। সে হিসেবে কি উচিত ছিল না হযরত ঈসা আলাইহিসসালাম সুস্পষ্ট ভাষায় এর ব্যাখ্যা দান করবেন, মানুষকে বিষয়টা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন এবং সন্দেহাতীত শব্দে এ আকীদার ঘোষণা করে যাবেন? বিষয়টা যদি মানুষের পক্ষে বোধগম্য হত, তবে মানুষ যাতে বিভ্রান্তির শিকার না হয় সে লক্ষ্যে সন্তোষজনক দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে এটা মানুষের সামনে বর্ণনা করার কোন দায়িত্ব তাঁর উপর থাকত না। আর যদি এ বিশ্বাসটি মানুষের বুদ্ধির অতীত হয়ে থাকে, তবে অন্ততপক্ষে এতটুকু বলে যাওয়া উচিত

ছিল যে, এ বিশ্বাসটি তোমাদের বুদ্ধির অতীত। কাজেই দলিল-প্রমাণের পেছনে পড়া ছাড়াই তোমরা এটা মেনে নাও।

প্রফেসর মরিস রেল্টন– যিনি খ্রিস্টধর্মের একজন বিশিষ্ট গোঁড়াপন্থী আলেম– ঈশ্বর সম্পর্কে কী চমৎকার বলেছেন–

'তাঁর স্বরূপ যথাযথভাবে উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তা আমাদের ধী-শক্তির অতীত। বাস্তবে তিনি আসলে কী, তা আমরা জানি না। আমরা তাঁর সম্পর্কে ততটুকুই জানতে পেরেছি যে, যতটুকু তিনি ওহীর মাধ্যমে মানব জাতিকে জানিয়েছেন।[১]

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব সংক্রান্ত যেসব বিষয়ের উপর ঈমান রাখা জরুরি আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে তা মানুষকে অবশ্যই অবহিত করেছেন।

যদি ত্রিত্ববাদের বিষয়টাও সেইসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হত, তবে কি তা মানুষের সামনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে যাওয়া হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দায়িত্ব ছিল না?

কিন্তু আমরা যখন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বাণীসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, স্পষ্ট দেখতে পাই তিনি সমগ্র জীবনে একবারও এ আকীদার কথা বলেননি। বরং এর বিপরীতে তিনি সর্বদা তাওহীদেরই শিক্ষা দিয়েছেন। কখনও বলেননি, ঈশ্বর তিন সত্তার যৌগিক রূপ এবং এ তিন মিলে একই।[২]

আল্লাহ সম্পর্কে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অসংখ্য উক্তি থেকে দু'টি উক্তি আমরা এস্থলে উল্লেখ করছি, যাতে তিনি তাওহীদের বিষয়টি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকাশ করেছেন। মার্ক ও মথির ইনজীলে আছে, তিনি বলেন,

বনী ইসরাঈলেরা, শোন, আমাদের মাবুদ আল্লাহ এক। তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত দিল, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত মন এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাদের মাবুদ আল্লাহকে মহব্বত করবে (মার্ক ১৯ : ২৯; মথি ২২ : ৩৬)।

---

১. H Maurice Ralton, Studies in Christian Doctorine.

২. খ্রিস্টানগণ ত্রিত্ববাদের সপক্ষে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সেইসব উক্তিকে দলিলরূপে পেশ করে থাকেন, যাতে তিনি আল্লাহকে পিতা এবং নিজেকে পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ শব্দদ্বয় ইসরাঈলী পরিভাষা। বাইবেলের অসংখ্য স্থানে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ছাড়া অন্যান্য মানুষকেও আল্লাহর পুত্র বলা হয়েছে (দেখুন লূক পরিচ্ছেদ ৩; জবুর ২৭ : ৮৯; ইয়ারমিয়া ৩১ : ৯; ইশাইয়া ৬৩ : ১৬; আইয়ুব ৩৮ : ৭; পয়দায়েশ ৬ : ২ ইত্যাদি)। কাজেই কেবল এ শব্দাবলী দ্বারা প্রমাণ পেশ করা কোনভাবেই সঠিক নয়। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য 'ইজহারুল হক, তৃতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইউহোন্নার ইনজীলে আছে, হযরত মাসীহ আল্লাহ তাআলার কাছে মুনাজাত করতে গিয়ে বলেছিলেন,

তোমাকে অর্থাৎ এক ও সত্য আল্লাহকে আর তুমি যাকে পাঠিয়েছ সেই ঈসা মাসীহকে জানতে পারাই সত্য জীবন' (ইউহোন্না ১৭ : ৩)।

এভাবে হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাছাড়া তিনি কোথাও এমন বলেননি যে, প্রকৃতপক্ষে আমি খোদা। আমি তোমাদের পাপমোচনের উদ্দেশ্যে মানবরূপে পৃথিবীতে এসেছি। বরং তিনি সর্বদা নিজেকে মনুষ্য-পুত্র হিসেবেই উল্লেখ করতেন। ইনজীলে এমন ষাটটি জায়গা আছে, যেখানে তিনি নিজেকে মনুষ্য-পুত্র বলেছেন।

সাম্প্রতিককালে খ্রিস্টজগতে এই উপলব্ধি তীব্র হয়ে উঠছে যে, হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম নিজেকে কখনও খোদা বলেননি; বরং এ বিশ্বাস পরবর্তী কালের উদ্ভাবিত। এ প্রসঙ্গে বহু খ্রিস্টান পণ্ডিতের বরাত পেশ করা যেতে পারে। আমরা এস্থলে শুধু একটি উদ্ধৃতিই পেশ করব, যা দ্বারা আপনি অনুমান করতে পারবেন, তথাকথিত 'পবিত্র দৃষ্টিভঙ্গির' আড়ালে সত্য কথাকে যতই গোপন করার চেষ্টা করা হোক, একদিন না একদিন তা প্রকাশ পেয়েই যায়। প্রফেসর হার্নেক বিংশ শতাব্দীর শুরুভাগের একজন বিখ্যাত জর্মন চিন্তাবিদ। খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে তার কয়েকটি বই আছে, যা ইউরোপ ও আমেরিকায় বহুল পঠিত ও অত্যন্ত সমাদৃত। তিনি যুক্তিবাদী (Ratisonalist) সম্প্রদায়ের সাথেও সম্পৃক্ত নন। বরং তিনি আধুনিকপন্থী (Modernist)-দের একজন। তাঁর দৃষ্টি খ্রিস্টধর্মের যে ব্যাখ্যা সঠিক, তাতে তাঁর বিশ্বাস খুব শক্ত। তিনি ১৮৯৯ খ্রি. ও ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে জর্মন ভাষায় কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যা Das Wesen des Christentums নামে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে What is Christianity নামে তার ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশ হয়। জার্মানী, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় এ বক্তৃতাসমূহ খুবই সমাদর লাভ করে। এখন তো এগুলো এমনই ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছে যে, আধুনিককালের কোন খ্রিস্টান ঐতিহাসিকই তাঁর উল্লেখ না করে পারেন না। তিনি তাঁর বক্তৃতাসমূহে হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছেন, আমরা এস্থলে তার যবানীতেই তা বিবৃত করছি,

খোদ ইয়াসূ মাসীহ নিজ সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করতেন, তার প্রতি দৃষ্টিপাত করার আগে আমাদের দু'টি মৌলিক বিষয় বুঝে নেওয়া জরুরি। প্রথম কথা হল, তাঁর নির্দেশনাবলীকে অবশ্য পালনীয় মনে করা হোক এই আকাঙ্ক্ষা

তাঁর কখনওই ছিল না। এমনকি চতুর্থ ইনজীলের লেখক, বাহ্যত যার সম্পর্কে মনে হয় তিনি ইয়াসূ মাসীহকে ইনজীল-প্রদত্ত মর্যাদা অপেক্ষাও বেশি মর্যাদা দিতে বদ্ধপরিকর, তাঁর ইনজীলে পর্যন্ত আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গিই সুস্পষ্টরূপে দেখতে পাই। তিনি হযরত মাসীহের এই বাক্য উল্লেখ করেছেন যে, তোমরা যদি আমাকে ভালোবেসে থাক, তবে আমার নির্দেশাবলী পালন কর।[১] খুব সম্ভব হযরত মাসীহ লক্ষ্য করেছিলেন, কিছু লোক তাকে সম্মান করে; বরং তার উপর ভরসা রাখে, কিন্তু কখনও তাঁর বার্তা অনুযায়ী কাজ করার জন্য কোন প্রকার কষ্ট স্বীকার করতে রাজি নয়। এরূপ লোকদেরকেই সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেন, "যারা আমাকে প্রভু, প্রভু বলে, তারা প্রত্যেকে যে বেহেশতী রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে তা নয়। কিন্তু আমার বেহেশতী পিতার ইচ্ছা যে পালন করে সে-ই ঢুকতে পারবে।"[২]

এর দ্বারা প্রকাশ, ইনজীলের মূল বক্তব্য থেকে সরে গিয়ে (হযরত) মাসীহ সম্পর্কে কোন বিশ্বাস তৈরি করে নেওয়াটা খোদ মাসীহের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে খারিজ হয়ে যাওয়ার নামান্তর ছিল।

দ্বিতীয় কথা হল, (হযরত) মাসীহ আসমান ও যমীনের প্রভুকে নিজের প্রভু ও নিজের পিতা বলে প্রকাশ করেছেন। আরও বলেছেন, তিনিই স্রষ্টা এবং তিনি একাই পবিত্র। তিনি নিশ্চিতভাবে এটাও বিশ্বাস করতেন যে, তাঁর কাছে যা-কিছুই আছে এবং যে জিনিসের পূর্ণতাবিধান তাঁর দায়িত্ব, তা সবই পিতার পক্ষ হতে তাঁর কাছে আসে। এ কারণেই তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করতেন, নিজেকে আল্লাহর ইচ্ছাধীন করে রাখতেন এবং আল্লাহর ইচ্ছা জেনে নিয়ে তদনুযায়ী কাজ করার জন্য কঠিন থেকে কঠিনতর কষ্ট-ক্লেশ স্বীকার করতেন। তাঁর দৃষ্টিতে উদ্দেশ্য, শক্তি, সিদ্ধান্ত ও বিপদাপদ সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে।

এসব এমন বাস্তব সত্য, যা ইনজীল আমাদেরকে অবহিত করে। এসব সত্যে কোন ভাঙচুর করা সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি নিজ অন্তরে চিন্তা-ভাবনা ও অনুভব-অনুভূতি পোষণ করেন, দুআ করেন, কর্ম ও প্রচেষ্টার পথে চলমান থেকে কষ্ট-ক্লেশ স্বীকার করেন ও বিপদাপদ বরণ করে নেন, নিশ্চয়ই তিনি একজন মানুষ, যিনি আল্লাহর সামনেও নিজেকে অপরাপর মানুষের সাথে একীভূত করে রাখেন।[৩]

---

১. খুব সম্ভব এর দ্বারা ইউহোন্নার ইনজীলের এই বাক্যের প্রতি ইশারা করা হয়েছে যে, 'যে আমার সব হুকুম জানে ও পালন করে সে-ই আমাকে মহব্বত করে' (ইউহোন্না ১৪ : ২১)।

২. মথি ৭ : ২১

৩. এর মূল ইংরেজি ভাষ্য এ রকম– This is What Gospels Say, and it Cannot be turned and twisted this feeling, praying, Working Struggling and

এ দু'টি বিষয় দ্বারা সেই ভূমির সীমানা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা নিজ সম্পর্কে হযরত মাসীহের সাক্ষ্য দ্বারা আচ্ছন্ন। একথা সত্য যে, এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে হযরত মাসীহ কী বলেছিলেন, সে সম্পর্কে আমাদের ইতিবাচক কোন অবগতি লাভ হয় না। কিন্তু তিনি নিজের সম্পর্কে যা ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ ঈশ্বর পুত্র ও মাসীহ (অর্থাৎ দাঊদের পুত্র ও মনুষ্য পুত্র), এ দু'টি শব্দের প্রতি যদি আমরা কাছ থেকে দৃষ্টিপাত করি, তবে তিনি এর দ্বারা কী বোঝাতে চেয়েছিলেন, তা আমাদের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব। ....।

আসুন আমরা প্রথমে দেখি, 'ইবনুল্লাহ বা ঈশ্বর-পুত্র'-এর যে উপাধি, তার প্রকৃত অর্থ কী? হযরত মাসীহ তাঁর এক বক্তব্যে, তিনি নিজেকে এ উপাধিতে কেন ভূষিত করেছিলেন, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁর সে বক্তব্যটি মথির ইনজীলে বিবৃত হয়েছে। (এবং যেমনটা ধারণা করা সম্ভব ছিল, ইউহোন্নার ইনজীলে তা অবর্তমান।) তিনি বলেন, 'পিতা ছাড়া পুত্রকে কেউ জানে না এবং পুত্র ছাড়া পিতাকে কেউ জানে না। আর পুত্র যার কাছে পিতাকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন সে-ই তাঁকে জানে।' (মথি ১১ : ২৭)

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়, 'নিজের সম্পর্কে 'ঈশ্বর-পুত্র' হওয়ার যে ধারণা হযরত মাসীহের ছিল, তা এ বিষয়েরই এক বাস্তব অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তিনি আল্লাহকে পিতা তথা নিজের পিতা হিসেবে যেমন জানা সম্ভব সেইভাবে জানতেন। সুতরাং 'পুত্র' শব্দটিকে যদি বিশুদ্ধ ধরে নেওয়া হয়, তবে তার মানে আল্লাহর পরিচয় ছাড়া আর কিছু নয়। অবশ্য এস্থলে দু'টি বিষয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে। এক তো এই যে, হযরত মাসীহের দাবি হল, তিনি আল্লাহকে এভাবে জানতেন, যেমনটা তার আগে কেউ জানত না। ... আর এ হিসেবেই তিনি নিজেকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করতেন।[১]

কয়েক পৃষ্ঠা পর ড. হার্নেক লেখেন,

হযরত মাসীহ যেই ইনজীলের প্রচার করেছিলেন, তার সম্পর্ক কেবল পিতার সাথে, পুত্রের সাথে নয়। এটা কোন স্ববিরোধী কথা নয় এবং নয় যুক্তিবাদিতাও।

Suffering individual is a Man Who is the face of God also associates himself With other men - (What is Christianity PP. 129. 130)

১. Harnack. What is Christianity PP. 128, 131 trans by thamas Bailey Sourder Newyork 1912

বরং এটা হল সেই বাস্তবতার সাদামাঠা প্রকাশ, যা ইনজীলের লেখকগণই বর্ণনা করেছেন।[১]

এর চার পৃষ্ঠা পর লেখেন,

ইনজীল আমাদেরকে চিরঞ্জীব, অন্তহীন খোদারই ধারণা দেয়। এখানেও কেবল এ কথার উপরই জোর দেওয়া হয়েছে যে, সেই খোদাকেই মানতে হবে এবং কেবল তারই মর্জি অনুযায়ী চলতে হবে। এটাই সেই জিনিস, যা (হযরত) মাসীহের লক্ষ্য ও অভিপ্রায় ছিল।[২]

ড. হার্নেকের এই দীর্ঘ বক্তব্য উদ্ধৃত করার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হল একথা প্রমাণ করা যে, যখনই নিরপেক্ষতা ও বিশ্বস্ততার সাথে ইনজীলসমূহ নিরীক্ষণ করা হয়েছে, তখন তা থেকে সর্বদা এই সিদ্ধান্তই পাওয়া গেছে যে, হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম নিজের সম্পর্কে 'এক আল্লাহর নবী ও তাঁর বান্দা' হওয়া ছাড়া অন্য কোন কথা বলেননি। আজকের ইনজীলসমূহেও তার এমন একটি উক্তিও পাওয়া যায় না, যা দ্বারা তার ঈশ্বর বা ঈশ্বরের ত্রিসত্তার এক সত্তা হওয়া প্রমাণিত হয়।

হাওয়ারীদের দৃষ্টিতে হযরত মাসীহ

হযরত মাসীহ (আ.)-এর পর তাঁর হাওয়ারী (শিষ্য)-গণের মর্যাদা সকলের উপরে। আমরা তাদের উক্তিসমূহ সন্ধান করে দেখেছি। তাতেও ত্রিত্ববাদ বা অবতারত্বের কোন ধারণা পাওয়া যায় না। বাইবেলে তাদের পক্ষ থেকে হযরত মাসীহ (আ.) সম্পর্কে 'খোদা' শব্দের ব্যবহার অবশ্যই পাওয়া যায়, কিন্তু 'নেতা' ও গুরু সম্পর্কেও এ শব্দটির বহুল ব্যবহার আছে। ইনজীলের বিভিন্ন স্থানে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হাওয়ারীগণ হযরত মাসীহ (আ.)কে 'শিক্ষক' অর্থে 'খোদাবন্দ' ও 'রাব্বী' বলতেন। মথির ইনজীলে আছে, হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম বলেন,

'তোমরা 'রাব্বী' (উস্তাদ) বলো না। কেননা তোমাদের রাব্বী তো একজনই আছেন। আর তোমরা সবাই ভাই-ভাই। এই দুনিয়াতে কাউকেই পিতা বলে ডেকো না। কারণ তোমাদের একজনই পিতা আর তিনি বেহেশতে আছেন। আর কেউ তোমাদের হাদী (নেতা) বলেও ডাকুক তাও চেও না। কারণ তোমাদের হাদী বলতে কেবল একজনই আছেন তিনি মাসীহ। (মথি ২৩ : ৮–১০)

১. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১৪৭
২. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১৫১

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়, হাওয়ারীগণ হযরত মাসীহকে যে 'রাব্বী' বা 'খোদাবন্দ' বলতেন, তা উস্তাদ ও হাদী বা নেতা অর্থেই বলতেন। মাবুদ ও ইলাহ অর্থে নয়। সুতরাং এ শব্দ দ্বারা প্রমাণ করা যায় না যে, তারা হযরত মাসীহ (আ.)কে 'খোদা' মনে করতেন। আবার এ শব্দটি ছাড়া বাইবেলে এমন একটি হরফও পাওয়া যায় না, যা ত্রিত্ববাদ বা অবতারত্বের কোন ইঙ্গিত বহন করে। বরং তাতে এমন বহু কথা পাওয়া যায়, যা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, হাওয়ারীগণ হযরত মাসীহ (আ.)কে কেবল একজন নবীই মনে করতেন। হাওয়ারীদের মধ্যে হযরত পিতরের স্থান অনেক উঁচুতে। তিনি একবার ইহুদীদের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন,

বনী ইসরাঈলরা, এই কথা শুনুন। নাসরাতের ঈসা ছিলেন এমন এক ব্যক্তি, যার আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়াটা আপনাদের কাছে সেই সব মুজিযা, আশ্চর্য কাজ ও চিহ্ন দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, যা আল্লাহ তার মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখিয়েছেন। আর এই কথা তো আপনারা জানেন' (প্রেরিত ২ : ২২)।

প্রকাশ থাকে যে, এ ভাষণ দেওয়া হয়েছিল ইহুদীদেরকে খ্রিস্টধর্মের দাওয়াত দেওয়ার জন্য। ত্রিত্ববাদ ও অবতারত্ব খ্রিস্টধর্মের মৌলিক আকীদা হয়ে থাকলে হযরত পিতরের উচিত ছিল নাসরাতের ঈসাকে 'এক ব্যক্তি' না বলে ঈশ্বরের 'এক সত্তা' বলা এবং 'আল্লাহর পক্ষ থেকে' না বলে শুধু 'আল্লাহ' বলা। সেই সঙ্গে তাদের সামনে ত্রিত্ববাদ ও অবতারত্বের আকীদাকে ব্যাখ্যা করে দেওয়া। অন্যত্র তিনি বলেন,

ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের আল্লাহ অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ এই কাজের দ্বারা নিজের গোলাম ইয়াসূকে মহিমা দান করেছেন (প্রেরিত ৩ : ১৩)।

প্রেরিত পুস্তকেই আছে, একবার হাওয়ারীগণ সকলে সম্মিলিতভাবে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করে বলেছিলেন,

বাস্তবিকই তোমার পবিত্র গোলাম ইয়াসূ, যাকে তুমি মাসীহ হিসেবে নিযুক্ত করেছিলে, বাদশাহ হেরোদ ও পন্তীয় পিলাত এই শহরেই তার বিরুদ্ধে অ-ইহুদীদের সঙ্গে এবং বনী ইসরাঈলের সঙ্গে সত্যিই হাত মিলিয়েছিলেন (প্রেরিত ৪ : ২৭)।

তাছাড়া একবার হাওয়ারী বার্নাবাস বলেছিলেন, 'আন্তরিক ইচ্ছার সাথে খোদাবন্দের সাথে জড়িয়ে থাক। কেননা তিনি একজন ভালো লোক এবং পাক-রূহ ও বিশ্বাসে পূর্ণ ছিলেন' (প্রেরিত ১১ : ২৩-২৪)।

এখানেও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে একজন ভালো লোক ও মুমিন ব্যক্তি বলা হয়েছে।

ইনজীলের এসব বাক্য সুস্পষ্টভাবেই এ সত্যের জানান দিচ্ছে যে, হাওয়ারীগণ হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামকে 'একজন ব্যক্তি', 'আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত নবী', 'আল্লাহর গোলাম' (বান্দা) এবং 'মাসীহ' মনে করতেন। এর বেশি কিছু নয়।

এতক্ষণ আপনি দেখলেন, হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম থেকে তার হাওয়ারীগণ পর্যন্ত কারও থেকেই ত্রিত্ববাদ ও অবতারত্বের আকীদা প্রমাণিত নয়। বরং তাদের থেকে এর বিপরীতটাই সুস্পষ্ট ভাষায় প্রমাণিত।

সুতরাং ত্রিত্ববাদ ও অবতারত্বের আকীদা সর্বপ্রথম যার বক্তব্যে পাওয়া যায়, তিনি হলেন পৌল। তিনি ফিলিপীয়দের কাছে লেখা চিঠিতে বলেন,

যদিও তিনি (মাসীহ) খোদারূপে ছিলেন, কিন্তু খোদার সমান থাকাকে তিনি আঁকড়ে ধরে রাখবার মত কিছু মনে করেননি। তিনি বরং গোলাম হয়ে এবং মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করে নিজেকে সীমিত করে রাখলেন। এছাড়া চেহারায় মানুষ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশের উপরে মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য থেকে তিনি নিজেকে নীচু করলেন। আল্লাহ এজন্যই তাঁকে সবচেয়ে উঁচুতে উঠালেন এবং এমন একটা নাম দিলেন, যা সব নামের চেয়ে মহৎ, যেন বেহেশতে, দুনিয়াতে এবং দুনিয়ার গভীরে যারা আছে তারা প্রত্যেকেই ঈসার সামনে হাটু পাতে আর পিতা আল্লাহর গৌরবের জন্য স্বীকার করে যে, ঈসা মাসীহই প্রভু' (ফিলিপীয় ২ : ৬–১১)।

কলসীয়দের নামে লেখা চিঠিতে বলেন,

এই পুত্রই হলেন অদৃশ্য আল্লাহর হুবহু প্রকাশ। সমস্ত সৃষ্টির আগে তিনিই ছিলেন। সমস্ত সৃষ্টির উপরে তিনিই প্রধান। কারণ আসমান ও যমীনে যা দেখা যায় আর যা দেখা যায় না, সবকিছু তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। আসমানে যাদের হাতে রাজত্ব, কর্তৃত্ব, শাসন ও ক্ষমতা রয়েছে তাদের সবাইকে তাঁকে দিয়ে তাঁরই জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে (কলসীয় ১ : ১৬)।

একটু পরে লেখেন,

ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা মসীহের মধ্যে শরীর হয়ে বাস করছে (কলসীয় ২ : ৯)।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, হাওয়ারীগণ হযরত মাসীহের জন্য 'খোদাবন্দ' ও 'রাব্বী' শব্দ ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু পূর্বোক্ত দলিল-প্রমাণের আলোকে তার

অর্থ হল শিক্ষক। তারা কোথাও তাঁর জন্য ঈশ্বরত্ব বা (ঈশ্বরের মানব) শরীর ধারণ (অবতারত্ব)-এর শব্দ ব্যবহার করেননি। এ আকীদা সর্বপ্রথম পৌলের কাছেই পাওয়া যায়।

ইউহোন্নার ইনজীলের স্বরূপ

এখানে কেউ বলতে পারে, ঈশ্বরের মানব দেহ ধারণ বা অবতারত্বের আকীদা তো ইউহোন্নার ইনজীলে একদম শুরুতেই বর্ণিত হয়েছে, যার ভাষা নিম্নরূপ–

প্রথমেই কালাম ছিলেন, কালাম আল্লাহর সঙ্গে ছিলেন এবং কালাম নিজেই আল্লাহ ছিলেন (ইউহোন্না ১ : ১)।

আরও পরে লেখেন,

সেই কালামই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও সততায় পূর্ণ হয়ে আমাদের মধ্যে বাস করলেন এবং পিতার একমাত্র পুত্র হিসেবে তার যে মহিমা সেই মহিমা আমরা দেখেছি' (ইউহোন্না ১ : ১৪)।

এটা ইউহোন্নার ভাষ্য। ইউহোন্না যেহেতু হাওয়ারী তাই বোঝা যাচ্ছে অবতারত্বের আকীদা পৌলের উদ্ভাবিত নয়; হাওয়ারীদের মধ্যে ইউহোন্নাও এর প্রবক্তা ছিলেন। কাজেই পৌলকে এ বিশ্বাসের জনক বলা সঙ্গত কি? বস্তুত এ প্রশ্নটি যথেষ্ট ওজনদার হতে পারত, যদি ইউহোন্নার ইনজীল অন্ততপক্ষে অবশিষ্ট তিন ইনজীলের মতও নির্ভরযোগ্য হত। কিন্তু ইউহোন্নার এ ইনজীলটি এমন যে, খোদ খ্রিস্টান জগতই শুরু থেকে এর নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে আসছে। দ্বিতীয় শতাব্দী থেকেই খ্রিস্টানদের একটি বড় দল এ ইনজীলকে ইউহোন্নার রচনা বলে স্বীকার করতে রাজি নন। আরও পরে এসে তো এ ইনজীলের মৌলিকত্বের প্রশ্নটি তাদের একটি মাথা ব্যথার কারণ হয়ে ওঠে। এর মৌলিকত্ব নিরীক্ষা সম্পর্কে বহু বই-পুস্তক রচিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত আলোচনা-পর্যালোচনায় হাজার-হাজার পৃষ্ঠা মসিলিপ্ত হয়েছে। এখানে সেসব আলোচনার সারমর্ম পেশ করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি তথ্যের প্রতি ইশারা করে দেওয়া জরুরি মনে করছি।

এ ইনজীল সম্পর্কে সর্বপ্রথম অরিনূস (মৃ ১৭৭ খ্রি.) অরিজন (মৃ. ২৫৬ খ্রি.), ক্লিমেন্ট রোমী (২০০ খ্রি.) এবং ঐতিহাসিক ইউসীবীস (মৃ. ৩১৪) দাবি করেছিলেন যে, এটা ইউহোন্নার লেখা। কিন্তু সে যুগেরই (১৬৫ খ্রি.-এর কাছাকাছি সময়ে) একদল খ্রিস্টান এটাকে ইউহোন্নার রচনা বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় এদের সম্পর্কে লেখা হয়েছে,

যারা ইউহোন্নার ইনজীলের উপর আপত্তি তোলে, তাদের অনুকূলে এ বিষয়টাকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা যায় যে, ১৬৫ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এশিয়া মাইনরে খ্রিস্টানদের এমন একটি উপদল ছিল, যারা চতুর্থ ইনজীলকে ইউহোন্নার রচিত বলে স্বীকার করত না। তাদের ধারণা ছিল এটি সেরিনথাস (Cerinthus)-এর রচনা। তাদের এ ধারণা নিশ্চয়ই ভুল। কিন্তু জনসংখ্যার দিক থেকে খ্রিস্টানদের এ গোষ্ঠীটি এত বড় ছিল যে, সেন্ট এপি ফানিউস ৩৭৪ খ্রি.–৩৭৭ খ্রি.-এর ইতিহাস বর্ণনায় তাদের সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন বোধ করেছেন। তারা বাকি তিন ইনজীলে বিশ্বাস করত এবং তারা গনাষ্টি ও মোনটানিস্ট দলসমূহের বিরোধী ছিল। তারা নিজেদেরকে স্বতন্ত্র কোন নামে পরিচিত করত না। পরবর্তীকালে বিশপ তাদেরকে আলূগী (কালাম সম্বলিত ইনজীলের বিরোধী) নামে আখ্যায়িত করেন। প্রশ্ন হচ্ছে ইউহোন্নার ইনজীলের মৌলকিত্ব যদি সন্দেহাতীত হত, তবে সেই প্রাচীন কালে এশিয়া মাইনরের মত দেশে ইউহোন্নার ইনজীল সম্পর্কে এই শ্রেণীর পক্ষে এ রকম দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা কি সম্ভবপর ছিল? নিশ্চয়ই নয়।[১]

তাছাড়া এ ইনজীলের নিজের ভেতরই এমন কিছু সাক্ষ্য বিদ্যমান রয়েছে, যা প্রমাণ করে এটি হাওয়ারী ইউহোন্নার লেখা নয়, যেমন এ ইনজীলের ভাষ্যমতে এর লেখক একজন ইহুদী পণ্ডিত, যিনি ইহুদী আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত[২] ছিলেন। অথচ ইউহোন্না ইবন সিবদিয় একজন অশিক্ষিত, অজ্ঞ লোক ছিলেন (যেমন প্রেরিত ৪ : ১৩ দ্বারা জানা যায়)। এমনিভাবে ইউহোন্নার ইনজীল দ্বারা বোঝা যায় এর লেখক একজন প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী খান্দানের লোক ছিলেন।[৩] অথচ হাওয়ারী ইউহোন্না ইবনে সিবদিয় ছিলেন একজন জেলে এবং পার্থিব দিক থেকে গুরুত্বহীন লোক।[৪]

অধিকন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই চতুর্থ ইনজীলটি অপর তিন ইনজীল থেকে আলাদা; বরং তার সাথে সাংঘর্ষিক এবং এর বর্ণনাশৈলীও অন্য রকম।

এ গ্রন্থখানিকে সর্বপ্রথম যিনি ইউহোন্নার রচনা বলে পরিচয় দিয়েছেন, তিনি হলেন আরিনূস, যার সম্পর্কে খ্রিস্টান পণ্ডিতদের ধারণা, তিনি গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন লোক ছিলেন না এবং সমালোচনার ক্ষেত্রেও বিশেষ নির্ভরযোগ্য নন।

---

১. এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ১৩ খণ্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা, নিবন্ধ "জন, গসপেল, অফ"
২. দেখুন ৪ : ২৭; ৭ : ১৫; ৯ : ২, ৪; ৭ : ৪৯; ১ : ২১; ৪ : ২৫; ৬ : ১৪; ৭ : ৪০; ১২ : ৩৭; ৭ : ২২; ১৮ : ২৭; ৭ : ৩৭ ইত্যাদি।
৩. দেখুন ১৮ : ১৫, ১৬; ৩ : ১; ৭ : ৫; ১৯ : ৩৮; ৭ : ৪৫; ১১ : ৪৭; ১২ : ১০ ইত্যাদি।
৪. ব্রিটানিকা ১৩ খণ্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা নিবন্ধ 'জন'।

এবংবিধ কারণে শেষ যুগের বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টান পণ্ডিত মনে করেন এ ইনজীলটি ইউহোন্নার নামে একটি জাল রচনা। একে ঐশী গ্রন্থসমূহের মধ্যে গণ্য করা কিছুতেই বৈধ নয়।

কিন্তু যে সকল খ্রিস্টান পণ্ডিত ইউহোন্নার ইনজীলকে বিশুদ্ধ মনে করেন এবং একে মনগড়া হওয়ার অভিযোগ থেকে বাঁচাতে চান, আমাদের এ যুগে তাদের প্রায় সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, এ ইনজীলের রচয়িতা হাওয়ারী ইউহোন্না ইবন সিবদিয় নন; বরং বৃদ্ধ ইউহোন্না (John the Elder)। জেমস ম্যাককিনন লেখেন,

ধারণা করা যায়, আরিনূস, যার বস্তুনিষ্ঠতা ও পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি বেশি উজ্জ্বল নয়, খুব সম্ভব (ইউহোন্না ইবন সিবদিয়কে) বৃদ্ধ ইউহোন্নার সাথে একশা করে ফেলেছেন।[১]

আমাদের এ যুগের প্রসিদ্ধ পাদ্রী, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, খ্রিস্টান পণ্ডিত আর্চ ডিকন বরকতুল্লাহ লেখেন,

সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, চতুর্থ ইনজীলখানি রসূল (প্রেরিত) ইউহোন্না ইবন সিবদিয়ের রচনা বলে যে প্রচার, এটা সঠিক হতে পারে না।[২]

আরও পরে তিনি লেখেন,

সত্য কথা হচ্ছে, চতুর্থ ইনজীলের রচয়িতা যে রসূল ইউহোন্না ইবন সিবদিয়, এখন আর বিজ্ঞজনেরা এ মতটি বিনাবাক্যে মেনে নিতে প্রস্তুত নন। অধিকাংশ গ্রন্থ সমালোচককে এ মতের বিপরীত অবস্থানেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে।[৩]

পাদ্রী বরকতুল্লাহ সাহেব তাঁর রচনায় 'চতুর্থ ইনজীলের রচিয়তা রসূল ইউহোন্না নন' এ দাবির সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এটা প্রমাণ করার প্রয়োজন কেন দেখা দিল? এর জবাবও তার নিজের যবানীতেই শুনুন,

যেসব আলেম এ ইনজীলকে ইউহোন্না ইবন সিবদিয়ের রচনা বলে বিশ্বাস করেন, সাধারণত তারা এ ইনজীলের ঐতিহাসিক দিকসমূহকে গুরুত্ব দেন না। তাদের কথা হল, চতুর্থ ইনজীলে কোন ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণিত হয়নি। এর

---

১. From Christ to Constantine P. 119 London 1936

২. 'কাদামাত ওয়া আসলিয়্যাতে আনাজীলে আরবাআ', ২য় খণ্ড, ১৩১ পৃষ্ঠা পাঞ্জাব রিলিজাস বুক সোসাইটি, ১৯৬০ খ্রি.

৩. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা।

বাণীসমূহ সবই রচয়িতার নিজস্ব, যা তিনি আল্লাহর কালিমা (মাসীহ আ.)-এর যবানীতে ব্যক্ত করেছেন।[১]

অর্থাৎ চতুর্থ ইনজীলকে হাওয়ারী ইউহোন্না ইবন সিবদিয়ের রচনা সাব্যস্ত করলে এর মৌলিকত্ব যেহেতু কঠিনভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে, তাই পাদ্রী সাহেব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, এটা বৃদ্ধ ইউহোন্নার রচনা। তার অনুসন্ধান-লব্ধ সিদ্ধান্ত হল, বৃদ্ধ ইউহোন্নাও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শিষ্য। তবে তিনি দ্বাদশ হাওয়ারীর অন্তর্ভুক্ত নন; বরং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর জীবনের শেষ দিকে তাকে সাহচর্য-ধন্য করেছিলেন।[২] ইনি একজন তরুণ, শিক্ষিত ও তাওরাত-জান্তা লোক এবং এক প্রভাবশালী, উঁচু খান্দাদের কুলপ্রদীপ ছিলেন।❖ নিজের ইনজীলে তিনি এসব বিষয়ই ব্যক্ত করেছেন।

এটাই সেই গবেষণা-লব্ধ সিদ্ধান্ত, যা অধুনা খ্রিস্ট-জগতে ব্যাপকভাবে সমাদৃত এবং এরই ভিত্তিতে তারা হাওয়ারী ইউহোন্নাকে চতুর্থ ইনজীলের রচয়িতা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করছে।

কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে এ গবেষণাও বিশেষ ওজন রাখে না। বস্তুত চতুর্থ ইনজীলের মৌলিকত্বকে অক্ষুণ্ন রাখার জযবাই তাদেরকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে বলে প্রতীয়মান হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, বার হাওয়ারীর বাইরে বৃদ্ধ ইউহোন্না নামে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কোন শিষ্য যদি থেকে থাকেন, তবে প্রথম তিন ইনজীলে তিনি অনুপস্থিত কেন? চতুর্থ ইনজীল দ্বারা তো জানা যায়, এর রচয়িতা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন ছিলেন এবং হযরত ঈসা (আ.) তাকে যারপরনাই ভালোবাসতেন। চতুর্থ ইনজীলের রচয়িতা এর অসংখ্য স্থানে নিজের নাম উল্লেখ না করে তদস্থলে লিখেছেন, 'ইয়াসূ মাসীহ যাকে মহব্বত করতেন সেই শিষ্য'। সবশেষে স্পষ্ট করেছেন যে, এর দ্বারা চতুর্থ ইনজীলের রচয়িতাকে বোঝানো উদ্দেশ্য (২১ : ২৪)।

হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা এ পর্যায়ের ছিল যে, তিনি নিজেই লিখেছেন,

'তাদের মধ্যে যাকে ঈসা মহব্বত করতেন, তিনি ঈসার বুকের দিকে ঝুঁকে খাবার খেতে বসেছিলেন' (১৩ : ২৩)।

পরে লেখেন, তিনি এভাবেই ইয়াসূ'র বুকের সাথে হেলান দিয়ে বললেন, প্রভু, সে কে? (১৩ : ২৫)।[৩]

---

১. কাদামাত ওয়া আসলিয়্যাতে ইনজীলে আরবাআ, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা।
২. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ১৩৭
৩. এস্থলে এ বিষয়টাও লক্ষ্যণীয় যে, চতুর্থ ইনজীল ছাড়া আর কোন ইনজীলে এ শিষ্যের এভাবে খাবার গ্রহণ ও প্রশ্ন করার কথা বর্ণিত হয়নি' (দেখুন মথি ২৬ : ২১; মার্ক ১৪ : ১৮; লূক ২২ : ২১)।
❖ তিনি অতি দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন। তাই তাকে বৃদ্ধ ইউহোন্না বলা হয় –অনুবাদক।

বার হাওয়ারীর মধ্যে কারওই হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের বুকে সওয়ার হয়ে খানা খাওয়ার সাহস হয়নি; কিন্তু এই শিষ্য যেহেতু অত্যন্ত আদরের ছিলেন, তাই এ রকম অবাধ আচরণ তার কাছে দোষনীয় মনে হয়নি। তো হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা যখন এ পর্যায়ের, তখন প্রশ্ন জাগে হযরত মাসীহ (আ.) তাকে বিশিষ্ট হাওয়ারীদের মধ্যে শামিল করলেন না কেন? যেখানে এহুদা এস্কারিয়োতির মত ব্যক্তি, যে কিনা ইনজীলসমূহের ভাষ্যমতে একজন চোর ছিল (ইউহোন্না ১২ : ৬) এবং যে হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামকে ধরিয়ে দিয়েছিল (লূক ২২ : ৩), বার হাওয়ারীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল, সেখানে হযরত মাসীহ (আ.)-এর এতটা অন্তরঙ্গ শিষ্য, যিনি তাঁর বুকের উপর মাথা রেখে খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন এবং হযরত মাসীহ (আ.)-এর আসমানে চলে যাওয়ার সময় যার ব্যাপারে পিতর অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন যে, হযরত মাসীহের বিরহে না জানি তার কী অবস্থা হয়, (ইউহোন্না ২১ : ২১) সেই ইউহোন্না হাওয়ারীদের মধ্যে শামিল হতে পারলেন না?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, এরই বা কী কারণ যে, প্রথম তিন ইনজীলে, যা কিনা খ্রিস্টানদের কাছে হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত, এই প্রিয়তম শিষ্য সম্পর্কে সামান্য একটু ইশারা পর্যন্ত নেই, অথচ হযরত মাসীহ (আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত অতি সাধারণ পর্যায়েরও বহু লোকের বৃত্তান্ত তাতে স্থান পেয়েছে এবং মারয়াম মগদলিনী, মার্থা, লাযার, এমনকি হযরত মাসীহ (আ.)-এর গাধীটার পর্যন্ত উল্লেখ তাতে আছে।

তাছাড়া 'ইউহোন্না হাওয়ারী' ব্যতীত 'বৃদ্ধ ইউহোন্না' নামে কোন শিষ্য যদি থেকে থাকে, তবে তাদের দু'জনের পার্থক্যটা কি ইনজীল-চতুষ্ঠয়ের রচয়িতাদের পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত ছিল না, যাতে এ নিয়ে কেউ বিভ্রান্তিতে না পড়ে? আমরা তো দেখছি হযরত মাসীহ (আ.)-এর শিষ্যদের মধ্যে ইয়াকুব নামে দু'জন লোক ছিলেন– সিবদিয়ের ছেলে ইয়াকুব ও আলফেযের ছেলে ইয়াকুব। এমনিভাবে এহুদা নামেরও দু'জন লোক ছিল– এহুদা ইবনে ইয়াকুব ও এহুদা এস্কারিয়োত। যাতে কোন রকম বিভ্রম দেখা না দেয় তাই ইনজীল-রচয়িতাগণ বিশেষ যত্নের সঙ্গে আলাদা-আলাদাভাবে তাদের উল্লেখ করেছেন (দেখুন মথি ১০ : ২; মার্ক ৩ : ১৬; লূক ৬ : ১৪, ১৬; প্রেরিত ১ : ১৩)। ইউহোন্না নামেও যদি হযরত মাসীহ (আ.)-এর শিষ্য দু'জন থাকতেন, তবে ইনজীল রচয়িতাগণ ইয়াকুব ও এহুদার মত তাদের ব্যাপারটাও স্পষ্ট করলেন না কেন?

আরও প্রশ্ন আসে, 'বৃদ্ধ ইউহোন্না' নামে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রিয় কোন শিষ্য থাকলে, হযরত মাসীহ (আ.)-এর আসমানে উঠে যাওয়ার পর তিনি কোথায় গেলেন? তাঁর শিষ্যগণ তারপরে খ্রিস্টধর্মের প্রচার-প্রসারে যেভাবে কর্মতৎপর থেকেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ প্রেরিত পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। তাতে হযরত ঈসা (আ.)-এর বিশিষ্ট শিষ্যদের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ পুস্তকেও 'বৃদ্ধ ইউহোন্না' নামের কোন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। হযরত মাসীহ (আ.) আসমানে চলে যাওয়ার পর তার ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছিল– এমনটাও বলার সুযোগ নেই। কেননা ইউহোন্নার ইনজীল রচিত হয়েছিল হযরত মাসীহ (আ.)-এর অনেক পরে। তাতে স্পষ্ট লেখা আছে, হাওয়ারীদের মধ্যে একথা প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, ইনজীল রচয়িতা ইউহোন্না কিয়ামতের আগে মারা যাবেন না (ইউহোন্না ২১ : ২৩)। সুতরাং যারা বৃদ্ধ ইউহোন্নাকে সিবদিয়ের পুত্র ইউহোন্না থেকে পৃথক ব্যক্তি মনে করেন, এ রকম সমস্ত খ্রিস্টান পণ্ডিত বলে থাকেন, বৃদ্ধ ইউহোন্না হযরত ঈসা (আ.)-এর পর বহুকাল জীবিত ছিলেন, যে কারণে পোলি ক্যার্প (Poly Carp) তার শিষ্য হতে পেরেছিল।

এসবই এমন অনস্বীকার্য সাক্ষ্য, যার নিরিখে বৃদ্ধ ইউহোন্না নামে হযরত মাসীহ (আ.)-এর কোন শিষ্য থাকার দাবি বিলকুল ভিত্তিহীন প্রতীয়মান হয়। বাকি থাকল ইউহোন্নার ইনজীলের সর্বশেষ পাঠটি, যাতে বলা হয়েছে,

'সেই সাহাবীই এইসব বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন আর এইসব লিখেছেন। আমরা জানি তার সাক্ষ্য সত্যি।' (২৪ : ২৪)

এ সম্পর্কে খ্রিস্টান পণ্ডিতদের অধিকাংশেই মনে করেন, এ বক্তব্যটি এ ইনজীলের রচয়িতার নয়; বরং পরবর্তীকালে কেউ এটা যোগ করে দিয়েছে। বাইবেলের বিখ্যাত ভাষ্যকার ওয়েষ্টকট (Westcott) বাইবেলের সমালোচনার ক্ষেত্রে খুবই সাবধানী। তিনি গোঁড়াপন্থীদের সমর্থক। কিন্তু তিনি এক্ষেত্রে লিখেছেন,

শেষের এ আয়াত দু'টি সম্পর্কে প্রতীয়মান হয় যে, এ দু'টি আসলে পাদটীকার কথা, যা ইনজীল প্রচারের আগে যোগ করে দেওয়া হয়েছিল। ২৪ নং আয়াতকে যদি ১৯ : ৩৫ নং আয়াতের সাথে তুলনা করে দেখা যায়, তবে এর থেকে এই সিদ্ধান্ত বের হয়ে আসে যে, এ সাক্ষ্যটি ইনজীল-রচয়িতার নয়। এ শব্দমালা সম্ভবত ইফিসের লোকজন যোগ করে দিয়েছিল।[১]

---

১. Quoted by B. H. Streeter, the Four Gospds P. 430, Mackmillon, New york 1961.

বর্তমান কালের বিখ্যাত লেখক বিশপ গোর (Bishop Gore)-ও এ কথার সমর্থন করেছেন।[১] আর এ কারণেই আয়াত দু'টি সিনাইটিক্সের অনুলিপিতে (Codex Sinaiticus) অনুপস্থিত।[২]

সুতরাং এ পাঠের ভিত্তিতে একথা বলার সুযোগ নেই যে, এর লেখক হযরত মাসীহ (আ.)-এর কোন শিষ্য।

উপরে বর্ণিত ইঙ্গিত ও আলামতসমূহ দ্বারা এ বিষয়টা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, চতুর্থ ইনজীলের লেখক না সিবদিয়ের পুত্র ইউহোন্না, যিনি হাওয়ারী ছিলেন আর না হযরত মাসীহ (আ.)-এর অন্য কোন উল্লেখযোগ্য শিষ্য। বরং আমাদের তো মনে হয় এর রচয়িতা হাওয়ারীগণের পরবর্তীকালের কোন ব্যক্তি, যিনি পৌল বা তার শাগরেদদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।[৩]

আর ভাষ্যকার ওয়েস্টকটের মতে এফিষের লোকজন এটিকে হাওয়ারী ইউহোন্নার সাথে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে এমন কিছু বাক্য যোগ করে দিয়েছে, যা দ্বারা এর রচয়িতাকে একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলে মনে হয়, যাতে করে গ্নষ্টিক (Gnostics) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করা সম্ভব হয়, যারা হযরত মাসীহ (আ.)-এর ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করত না। জ্ঞান-গবেষণার জগতে এ বিষয়টাকে তো এখন এক অনস্বীকার্য সত্য রূপে সামনে এসে গেছে যে, সেকালে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে বাহাস চলাকালে এই পবিত্র রচনাবলীর ভেতর সংশোধনীমূলক হস্তক্ষেপ অব্যাহতভাবে চালু থেকেছে। আধুনিককালের প্রসিদ্ধ খ্রিস্টান গবেষক প্রফেসর বি. এইস, স্ট্রিটার তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা The Four Gospels (ইনজীল চতুষ্টয়)-এর এক জায়গায় কত স্পষ্টভাবে লিখেছেন,

"সুতরাং চতুর্থ ইনজীলের মূলপাঠের ভেতর আমরা যদি এমন কোন সংযোজন দেখতে পাই, যা দ্বারা এর রচয়িতাকে সুস্পষ্টভাবে নিশানদিহি করা হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে তা যে মূল লেখকের নয়, তাও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, তবে কি এর দ্বারা এ বিষয়টা সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ হয়ে যায় না যে, এ সংযোজন ইনজীল রচনার পরবর্তীকালের কৃত এবং এ রকম সংযোজন হয়ত অন্যান্য জায়গাতেও করা হয়েছে? বস্তুত এসব সংযোজনের উদ্দেশ্য ছিল এ

---

১. See Belief in Christ P. 106

২. The Four Gospels P. 431

৩. বরং ফ্রান্সিসি এনসাইক্লোপিডিয়ায় তো এতদূর পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, ইউহোন্নার ইনজীল সবটাই পৌলের লেখা, যা তিনি হাওয়ারী ইউহোন্নার নামে চালিয়ে দিয়েছেন (দেখুন সায়্যিদ রশীদ রেজা মিসরীর লেখা বার্নাবাসের ইনজীলের ভূমিকা, কায়রো)।

ইনজীলের রচয়িতা সম্পর্কে সে কালের কিছু লোক যা অস্বীকার করত সেই সব দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিতে বাধ্য করা। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে তা নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছিল, সামনে আমরা তা সংক্ষেপে বর্ণনা করব।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে ইউহোন্নার ইনজীলে লিখিত, 'সেই সাহাবীই ... ... এইসব লিখেছেন', বাক্যটিকে এভাবে বুঝতে হবে যে, এটা ছিল একটি বিতর্কিত বিষয়কে মীমাংসা করার প্রচেষ্টা বিশেষ। এর দ্বারা এ বিষয়ে বাড়তি প্রমাণ মেলে যে, সেকালেও এ ইনজীলের রচয়িতা সম্পর্কে শোবা-সংশয় ও মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল'।[১]

সুতরাং এহেন বাতাবরণে ইউহোন্নার ইনজীল ও তাঁর পত্রাবলী যদি পৌলের কোন শিষ্য কর্তৃক লেখা হয়ে থাকে এবং পরবর্তীকালের লোকে তাতে এমন কিছু বাক্য সংযোজিত করে দেয়, যা দ্বারা মনে হবে লেখক হযরত মাসীহ (আ.)-এর একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

সে কালের সাধারণ প্রবণতা দৃষ্টে আমাদের কাছে তো এটাই সঠিক মনে হয়। তবে গোঁড়া ঈসায়ী দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণে এ ইনজীল সম্পর্কে যদি পরিপূর্ণ সুধারণা পোষণ করা হয়, তাহলে বড়জোর ড. বেকনের সুরে সুর মিলিয়ে বলা যায়, এ ইনজীল বৃদ্ধ ইউহোন্নার লেখা, কিন্তু তিনি হযরত মাসীহ (আ.)-এর সরাসরি শিষ্য নন; বরং তাঁর শিষ্যদের শিষ্য ছিলেন।[২]

আর যদি সর্বোচ্চ পর্যায়ের সুধারণা পোষণ করা হয়, তবে প্রফেসর ষ্ট্রিটারের এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা যেতে পারে যে, এ ইনজীলের রচয়িতা বৃদ্ধ ইউহোন্নাই, তবে "প্যাপিয়াস বৃদ্ধ ইউহোন্নাকে প্রভুর শিষ্য সাব্যস্ত করেছেন এবং পোলিকার্প তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, তিনি এমন এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি প্রভুকে দেখেছিলেন। তিনি জেরুজালেমে প্রভুর সাথে পরিচিত হয়ে থাকবেন (ইউহোন্না ১ : ২), তবে প্রভুর সাক্ষাত লাভ দ্বারা সম্ভবত তিনি কিছু অর্জন করতে পারেননি। কারণ তখন তিনি ছিলেন বার বছরের শিশু, যাকে তার পিতা-মাতা "উদ্ধার ঈদ"-এর দিন জেরুজালেম নিয়ে এসেছিলেন। এটাও সম্ভব যে, হযরত মাসীহ (আ.)কে শূলে চড়ানোর দৃশ্য দেখার জন্য যে লোক সমাগম হয়েছিল, সেই ভীড়ের মধ্যে এই বালকটিও ছিল, যেহেতু সেকালে এ জাতীয় দৃশ্য দেখার জন্য শিশুদের আসতে বারণ ছিল না। এ অবস্থায় ৯৫ খ্রিস্টাব্দের ভেতর সে সত্তর বছর বয়সে উপনীত

---

১. B. H. Streeter, the Four Gospels, P. 431
২. Quoted by Streeter, Four Gospels P. 443

হয়ে থাকবে। ইউহোন্নার প্রথম চিঠিটি নিঃসন্দেহে পরিণত বয়সের কোন লোকেরই লেখা, যিনি একই প্যারাগ্রাফে ভাই সম্বোধন থেকে 'বাছারা' সম্বোধনে ফিরে যেতে পারেন (১ ইউহোন্না ৩ : ১৩, ১৮)। 'বাছারা' সম্বোধনটি সত্তর বছরের কম বয়সী লোক সহজে করতে পারে না ...। সুতরাং এটা স্বীকার করে নিতে কোন অসুবিধা নেই যে, বৃদ্ধ ইউহোন্না এ ইনজীলটি ৯০ খ্রি. থেকে ৯৫ খ্রিস্টাব্দের ভেতর লিখেছিলেন, যখন তার বয়স সত্তর বছর বা তার কিছু বেশি ছিল।[১]

এই হল খ্রিস্টবাদের গোঁড়ামিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। বলা যেতে পারে এটা ইউহোন্নার ইনজীলকে জাল হওয়ার অভিযোগ থেকে বাঁচানোর সর্বশেষ চেষ্টা। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে যে জোড়াতাড়া দেওয়া হয়েছে, সে দিকে লক্ষ্য না করে যদি আমরা একে হুবহু স্বীকার করে নেই, তবুও এর থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আপনা-আপনিই বের হয়ে আসে।

এক. ইউহোন্নার ইনজীলের রচয়িতা সবদিয়ের পুত্র হাওয়ারী ইউহোন্নান নন; বরং বৃদ্ধ ইউহোন্না।

দুই. বৃদ্ধ ইউহোন্না হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের হাওয়ারী নন।

তিন. বৃদ্ধ ইউহোন্না হযরত মাসীহ (আ.)কে মাত্র একবার দেখেছিলেন, তাও বার বছর বয়সকালে। তাঁর সাহচর্যে থাকার ও তাঁর থেকে শিক্ষা গ্রহণের কোন সুযোগ তার হয়নি।

চার. বৃদ্ধ ইউহোন্না হযরত মাসীহ (আ.) সর্বশেষ দেখেছেন তাঁকে শূলে চড়ানোর সময়।

পাঁচ. তিনি জেরুজালেমের লোক ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন দক্ষিণ কেনানের বাসিন্দা।[২]

ছয়. হযরত মাসীহ (আ.)-এর পর ৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তিনি কোথায় ছিলেন? কার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন? কার সাহচর্যে থেকেছিলেন? হাওয়ারীদের সম্পর্কে তার সম্পর্ক কেমন ছিল? এসব প্রশ্নের উত্তর অজ্ঞাত।

সাত. ৯৫ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে সত্তর বছর বয়সে তিনি ইনজীল রচনা করেছিলেন এবং সর্বপ্রথম এ ইনজীলে তিনিই অবতারত্বের আকীদা বর্ণনা করেন।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৫৬

২. পাদ্রী বরকতুল্লাহ এম. এ. কাদামাত ওয়া আসলিয়্যাতে আনাজীলে আরবাআ, ২য় খণ্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা, লাহোর ১৯৬০ খ্রি.।

আট. পরবর্তীকালে এফিষের লোকেরা ইনজীলের শেষে এমন একটি বাক্য যোগ করে দেয়, যা দ্বারা বোঝা যায়, এ ইনজীলের রচয়িতা সবদিয়ের পুত্র হাওয়ারী ইউহোন্না কিংবা হযরত মাসীহ (আ.)-এর কোন প্রিয় শিষ্য।

উল্লেখিত ধারাগুলো উদ্ধারে আমাদের আন্দাজ-অনুমানের কোন ভূমিকা নেই; বরং খোদ খ্রিস্টান আলেমগণ ইউহোন্নার ইনজীলকে জাল হওয়ার অভিযোগ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে যে ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন, তাতে এসব কথাই বলা হয়েছে। এসবের আলোকে অনস্বীকার্যভাবে যেসব বিষয় প্রমাণিত হয়, আমরা নিম্নে তা তুলে ধরছি।

ক. অবতারত্ব (ঈশ্বরের মানবদেহ ধারণ)-এর আকীদাটি হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম বা তাঁর কোন হাওয়ারী থেকে বর্ণিত ও প্রমাণিত নয়।

খ. এ বিশ্বাসটিকে হযরত মাসীহ (আ.)-এর জীবনচরিতে সর্বপ্রথম এমন এক ব্যক্তি লিখেছেন, যিনি বার বছর বয়সে হযরত মাসীহ (আ.)-কে মাত্র একবার দেখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তার হয়নি।

গ. যে ব্যক্তি এ বিশ্বাসটি মানুষের সামনে এনেছেন, তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কেবল তার এই লেখাটাই পাওয়া যায়। এর বেশি তিনি কোন স্বভাব-মেজাজের লোক ছিলেন, কী চিন্তাধারা পোষণ করতেন, এ বিশ্বাসটি তার নিজের উদ্ভাবিত না কারও কাছ থেকে শ্রুত, তিনি তার জীবনকাল কোথায় কাটিয়েছেন এবং হাওয়ারীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন ছিল, এসবের উত্তর কেউ জানে না।

ঘ. তিনি এ বিশ্বাসটি ৯৫ খ্রিস্টাব্দে তার ইনজীলে দাখিল করেছেন, যখন তার বয়স হয়েছিল সত্তর বছর এবং এটা পৌলের মৃত্যুর আটাশ বছর পরের কথা।[১]

ঙ. পৌলের মৃত্যু যেহেতু এর আগেই হয়ে গিয়েছিল, আর তিনি নিজ পত্রাবলীতে অবতারত্বের আকীদাটি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, তাই প্রমাণিত হয়, পৌলই এ আকীদাটির সর্বপ্রথম উপস্থাপক; বৃদ্ধ ইউহোন্না নন।

পাপ মোচন

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত ও পরিস্ফুট হয়ে গেছে যে, অবতারত্ব বা ঈসা মাসীহরূপে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল বলে যে বিশ্বাস খ্রিস্টজগতে প্রচারিত, তা হযরত ঈসা (আ.)-এর কোন বাণী দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং

১. ঐতিহাসিকগণ আনুমানিকভাবে পৌলের মৃত্যু তারিখ বলেছেন ৬৭ খ্রিস্টাব্দে।

তাঁর কোন হাওয়ারীও এটা প্রচার করেননি। বরং সর্বপ্রথম পৌল এটা উপস্থাপন করেছেন। এবার আসুন খ্রিস্টধর্মের দ্বিতীয় বিশ্বাস অর্থাৎ পাপমোচনের বিশ্বাসটি সম্পর্কে আমরা খুঁজে দেখি এর উদ্ভাবক কে এবং কোন উৎস থেকে এটা বের হয়েছে? মি. ডেনিয়েল উইলসনের ভাষ্য অনুযায়ী এ বিশ্বাসটি হল খ্রিস্টধর্মের প্রাণ।[১] পাঠক প্রথম অধ্যায়ে পড়ে এসেছেন যে, একদিকে খ্রিস্টধর্মের শিক্ষা হল, এ বিশ্বাসটির উপরই মানুষের মুক্তি নির্ভরশীল এবং বাপ্তিস্ম ও প্রভুর নৈশভোজ জাতীয় প্রথাসমূহ এরই ভিত্তিতে উদ্ভাবিত, অন্যদিকে যে দর্শন এ বিশ্বাসটির ভিত্তিভূমি রচনা করেছে, তা বড়ই জটিল ও দুর্বোধ্য। সুতরাং পাঠক! আপনি হয়ত ধারণা করছেন, চার ইনজীলে হযরত মাসীহ (আ.)-এর বিভিন্ন উক্তি দ্বারা নিশ্চয়ই এটা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এবং তিনি ও তাঁর হাওয়ারীগণ উত্তমরূপে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন। আপনি এটা মনে করতেই পারেন এবং এর পূর্ণ অধিকার আপনার আছে। কেননা কোন ধর্ম বা মতবাদের ভিত্তি যেসব বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর স্থাপিত হয়, তা সে ধর্ম বা মতবাদের মৌল রচনাবলীতে ও তার প্রবর্তকদের লেখাজোখায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। ধর্মের প্রাথমিক গ্রন্থসমূহে তো এসব বিষয় প্রমাণের উপরই বেশি জোর দেওয়া হয়। ইসলাম ধর্মকেই ধরুন না! এর বুনিয়াদী আকীদা হল তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত। এবার কুরআন মাজীদ খুলুন। দেখবেন সমগ্র কুরআন এ বিশ্বাসগুলির ব্যাখ্যা ও এর দলিল-প্রমাণের আলোচনায় পূর্ণ।

কিন্তু খ্রিস্টধর্মের হাল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। যেসব চিন্তাধারা এ ধর্মের মূল বিষয়; বরং যে সবের কারণে এ ধর্ম অন্যান্য ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে, ইনজীলসমূহে তার কোন আলোচনা নেই। হযরত মাসীহ (আ.) ও তাঁর শিষ্যদের পক্ষ হতে তার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ত্রিত্ববাদ ও অবতারত্বের অবস্থা তো আপনি দেখলেন। পাপমোচনের বিশ্বাসটিও তথৈবচ। হযরত মাসীহ (আ.)-এর কোন উক্তি দ্বারাই এটা প্রমাণিত হয় না।

বিষয়টা উপলব্ধি করার জন্য আপনি ইনজীলের সেইসব বাক্যের উপর চোখ বুলান, যে সম্পর্কে খ্রিস্টানদের ধারণা, পাপ মোচনের বিশ্বাসটি তা থেকেই আহরিত। বাক্যগুলো নিম্নরূপ,

এক. তার একটি ছেলে হবে। তুমি তার নাম ঈসা রাখবে, কারণ তিনি তার লোকদের তাদের গুনাহ থেকে নাজাত করবেন (মথি ১ : ২১)।

---

১. Daniel Wilson, Evidences of Christianity P. 53 V. 11 London 1830

দুই. ফেরেশতা তাদের বললেন, ... আজ দাউদের গ্রামে তোমাদের নাজাতদাতা জন্মেছেন। তিনিই মাসীহ, তিনিই প্রভু (লূক ২ : ১১)।

তিন. কারণ মানুষকে নাজাত করবার জন্য সমস্ত লোকের চোখের সামনে তুমি যে ব্যবস্থা করেছ, আমি তা দেখতে পেয়েছি (লূক ২ : ৩০–৩১)।

চার. মাসীহ বললেন, ... যারা হারিয়ে গেছে তাদের তালাশ করতে ও নাজাত করতেই ইবনে আদম এসেছেন (লূক ১৯ : ১০)।

পাঁচ. মনে রেখ, ইবনে আদম সেবা পেতে আসেননি, বরং সেবা করতে এসেছেন এবং অনেক লোকের মুক্তির মূল্য হিসেবে তাদের প্রাণের পরিবর্তে নিজের প্রাণ দিতে এসেছেন (মথি ২০ : ২৮; মার্ক ১০ : ৪৫)।

ছয়. কারণ এ আমার রক্ত, যা অনেকের গুনাহের ক্ষমার জন্য দেওয়া হচ্ছে (মথি ২৬ : ২৮)।

এই হচ্ছে ইনজীলসমূহের সেই সব বাক্য, যা দ্বারা পাপমোচনের বিশ্বাসকে প্রমাণ করা হয়।[১]

পাপমোচনের বিশ্বাস প্রসঙ্গে ইনজীলসমূহে এ বাক্যাবলীর বেশি কিছু পাওয়া যায় না। মুশকিল হচ্ছে, বর্তমানকালে পাপমোচনের বিশ্বাসটি তার অতিরঞ্জিত রূপ নিয়ে এত বেশি প্রচার পেয়েছে যে, এসব বাক্য পড়ামাত্র চিন্তা-ভাবনা এ বিশ্বাসটির দিকেই ধাবিত হয়। কিন্তু আপনি যদি ন্যায়নিষ্ঠভাবে বিষয়টি যাচাই করে দেখতে চান, তবে কিছুক্ষণের জন্য প্রথম অধ্যায়ে এর যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে, অন্তর থেকে তা ঝেড়ে ফেলুন, তারপর মুক্তমনে এ বাক্যগুলো আবারও পড়ুন। এবার কি এগুলোর এই সরল-সোজা অর্থই বুঝে আসে না যে, হযরত মাসীহ (আ.) পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে নিমজ্জিত মানবমণ্ডলীকে হেদায়াত ও নাজাতের পথ দেখানোর জন্য আগমন করেছিলেন এবং যারা কুফর, শিরক ও পাপাচারে লিপ্ত হয়ে নিজেদেরকে স্থায়ী শাস্তির উপযুক্ত বানিয়ে ফেলেছিল তাদেরকে হেদায়াতের পথ দেখিয়ে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, তাতে তাবলীগী তৎপরতার অপরাধে যদি চরম দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়, এমনকি প্রাণ উৎসর্গ করতে হয় তার জন্যও তিনি প্রস্তুত ছিলেন?

"অনেক লোকের মুক্তির মূল্য হিসেবে তাদের প্রাণের পরিবর্তে নিজের প্রাণ দিতে এসেছেন" এবং "এ আমার রক্ত, যা অনেকের গুনাহের ক্ষমার জন্য দেওয়া হচ্ছে", পূর্ব থেকেই পাপমোচনের বিশ্বাসটি যদি অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে না থাকে,

---

১. দেখুন এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ২য় খণ্ড, ৬৫১, নিবন্ধ Atonement.

তবে এ উক্তি দু'টিরও পরিষ্কার অর্থ এটাই বোঝা যাবে যে, মানুষকে পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তিদান এবং তাদের পাপমোচনের উপায় সৃষ্টির জন্য যদি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে হয়, তবে হযরত মাসীহ (আ.) সেজন্যও প্রস্তুত ছিলেন এবং সেই প্রস্তুতির কথাই তিনি এভাবে ব্যক্ত করেছেন।[১]

এ বাক্যসমূহ থেকে এ দর্শন কিভাবে উদ্ভাবিত হয় যে, হযরত আদম (আ.)-এর পাপের কারণে তার ইচ্ছাশক্তি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল আর তার ফলে তাঁর নিজের ও তার আওলাদের স্বভাবের ভেতর আদি গুনাহ মিশে গিয়েছিল, যদ্দরুণ প্রতিটি দুধের শিশুও স্থায়ী শাস্তির উপযুক্ত ছিল, পরিশেষে ঈশ্বরের পুত্রসত্তা ফাঁসিতে ঝুলে সমস্ত মানুষের এই আদিপাপ নিজ কাঁধে নিয়ে নিল এবং এভাবে সমস্ত মানুষের আদিপাপ মোচন হয়ে গেল।[২]

উল্লেখিত উক্তিসমূহ দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-এর উদ্দেশ্য যদি পাপমোচনের আকীদাকে স্পষ্ট করাই হত, তবে তিনি এ দর্শনে কথিত বিষয়াবলীসহ কেন ব্যাখ্যা দান করলেন না, বিশেষত তাদের ভাষ্য মতে এটা যখন দ্বীনের একটি মৌলিক আকীদা এবং এটা বিশ্বাস করা ছাড়া নাজাত লাভ হতে পারে না?

লোকে রাত-দিন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও জাতীয় নেতাদের সম্পর্কে এ জাতীয় বাক্য ব্যবহার করে থাকে যে, 'অমুকে নিজ জাতির মুক্তির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে', কিন্তু এর দ্বারা কেউ একথা বোঝে না যে, হযরত আদম (আ.)-এর আদিপাপ জাতির কাঁধে চাপানো ছিল। আর সেই নেতা জাতির সে পাপের শাস্তি জাতির বদলে নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছে।

এ বাক্যসমূহ দ্বারা যদি ওই দর্শন বের করার অবকাশ থাকে, তবে অতটুকু কেন, আরও বের করা যেতে পারে যে, হযরত মাসীহ (আ.) সমস্ত মানুষের গুনাহ নিজ কাঁধে নিয়ে নিয়েছেন। কাজেই কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ যত গুনাহই করুক না কেন, তাদের কোন শাস্তি হবে না, অথচ শুরু থেকেই সকল চার্চ একথা রদ করে আসছে।

---

১. বাকি থাকল ইশাইয়া ৫৩ : ১-এর বক্তব্য। এ প্রসঙ্গে সেটাই বেশি উল্লেখ করা হয়ে থাকে। সে ব্যাপারে কথা হল, আলোচ্য বাক্যসমূহ অপেক্ষা তা অনেক বেশি অস্পষ্ট। তার দ্বারা আসলে কী বোঝানো হয়েছে, কাকে বোঝানো হয়েছে, তা বলা কঠিন। আর তাতে যে উপমা দেওয়া হয়েছে, তাও দুর্বোধ্য।

২. এ দর্শন যুক্তি-বুদ্ধির বিপরীত তো বটেই, খোদ বাইবেলের সুস্পষ্ট শিক্ষারও পরিপন্থী। বাইবেলে বলা হয়েছে, "যে গুনাহ করে সেই মরবে। ছেলে বাবার দোষের জন্য শাস্তি পাবে না আর বাবাও ছেলের দোষের জন্য শাস্তি পাবে না। সৎলোক তার সততার ফল পাবে আর দুষ্ট লোক তার দুষ্টতার ফল পাবে' (ইহিস্কেল ১৮ : ২০)। এতদসত্ত্বেও উল্লিখিত বাক্যসমূহ থেকে এ দর্শন আবিষ্কারের সুযোগ কোথায়?

এ কারণেই তো যে সকল খ্রিস্টান পণ্ডিত ন্যায়নিষ্ঠতার সাথে এ বাক্যসমূহ পড়েছেন তারা এর দ্বারা পাপমোচনের জটিল দর্শনের দিকে না গিয়ে বরং ওই সাদামাঠা অর্থই গ্রহণ করেছেন, যা আমরা উপরে বর্ণনা করেছি।

খ্রিস্টান-ইতিহাসের একেবারে প্রাথমিক যুগে কোয়েলেসশিস (Coelestius) -এর বক্তব্য এ রকমই ছিল।[১] তারপর সোসাইনিয়ান্স (Socinians) সম্প্রদায়ও এ বাক্যসমূহের এ ব্যাখ্যাই করেছেন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় তাদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

তারা হযরত মাসীহ (আ.)-এর জীবন ও মৃত্যুর ভেতর মুক্তির এক মহিয়ান পথপ্রাপ্তির কথাই বলত (ব্রিটানিকা, ২য় খণ্ড, ৬৫২ পৃষ্ঠা নিবন্ধ Atonement)

অ্যাবলর্ড (Abelard)-ও একথা বলতেন যে, প্রায়শ্চিত্তের অর্থ কেবল এতটুকু যে, হযরত মাসীহ (আ.)-এর জীবন ও মরণ ছিল দয়া ও সহমর্মিতার এক পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা (প্রাগুক্ত)।

উপরিউক্ত ব্যক্তিবর্গ তো উদারনীতিবাদ (লিবর‍্যালিজম)-এর আগে পাপ মোচনের বিশ্বাসকে অস্বীকার করতেন। তারপর লিবর‍্যালিজমের যুগ এবং আরও পরে আধুনিকতাবাদ (মডার্নিজম)-এর যুগে মানুষ সাধারণভাবে কোন ধ্যান-ধারণার দিকে ঝুঁকল, তা সকলেরই জানা। সে সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করছি না।

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পাপমোচন বিশ্বাসটির যে ব্যাখ্যা বর্তমানে প্রচলিত, হযরত মাসীহ (আ.)-এর কোন উক্তি দ্বারা তা প্রমাণিত নয়। তাঁর কোন বাক্য দ্বারা এর পক্ষে প্রমাণ পেশ করা যায় না। যেসব বাক্য দ্বারা প্রমাণ দেওয়া হয়েছে, তার প্রকৃত ও সরল অর্থ অন্য কিছু।

এবার আসুন হাওয়ারীদের কাছে। বস্তুত তাদের থেকেও এমন কোন বাক্য পাওয়া যায় না, যা দ্বারা এ বিশ্বাসটি প্রমাণ করা চলে। প্রথম যে ব্যক্তি এ বিশ্বাসটিকে দর্শন সহকারে পেশ করেছেন তিনি হলেন পৌল। রোমীয়দের নামে পাঠানো চিঠিতে তিনি লেখেন,

একটি মানুষের মধ্য দিয়ে গুনাহ দুনিয়াতে এসেছিল ও সেই গুনাহের মধ্য দিয়ে মৃত্যুও এসেছিল। সব মানুষ গুনাহ করেছে বলে এভাবে সকলের কাছেই মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে। মুসার শরীয়ত দেবার আগেই দুনিয়াতে গুনাহ ছিল, কিন্তু শরীয়ত না থাকলে তো গুনাহকে গুনাহ বলে ধরা হয় না। তবুও আদমের সময়

১. Augustine, On Original, Sin, Ch. 11 P. 621 V. 1

থেকে শুরু করে মুসার সময় পর্যন্ত সকলের উপরেই মৃত্যু রাজত্ব করছিল। এমনকি আল্লাহর হুকুম অমান্য করে যারা আদমের মত গুনাহ করেনি তাদের উপরেও মৃত্যু রাজত্ব করছিল। যার আসবার কথা ছিল আদম ছিলেন একদিক থেকে সেই ঈসা মাসীহেরই ছবি, কিন্তু আদমের গুনাহ যে রকম আল্লাহর বিনা মূল্যের দান সেই রকম নয়। যখন একজন লোকের গুনাহের ফলে অনেকে মরল তখন আল্লাহর রহমতের এবং আর একজন মানুষের দয়ার মধ্য দিয়ে যে দান আসল, তা সেই অনেকের জন্য আরও কত না বেশি করে উপচে পড়ল। সেই আর একজন মানুষ হলেন ঈসা মাসীহ। আল্লাহর দান আদমের গুনাহের ফলের মত নয়। কারণ একটা গুনাহের বিচারের ফলে সব মানুষকেই শাস্তির যোগ্য বলে ধরা হয়েছে, কিন্তু ধার্মিক বলে আল্লাহর গ্রহণযোগ্য হওয়ার এই যে রহমতের দান, তা অনেক গুনাহের ফলে এসেছে। একজন মানুষের গুনাহের দরুণ মৃত্যু সেই একজনের মধ্য দিয়েই রাজত্ব করতে শুরু করেছিল, কিন্তু যারা প্রচুর পরিমাণে আল্লাহর রহমত ও ধার্মিক বলে তাঁর গ্রহণযোগ্য হওয়ার দান পায় তারা সেই একজন মানুষের, অর্থাৎ ঈসার মধ্য দিয়ে জীবনের পরিপূর্ণতা নিয়ে নিশ্চয়ই রাজত্ব করবে। তাহলে একটা গুনাহের মধ্য দিয়ে যেমন সব মানুষকেই শাস্তির যোগ্য বলে ধরা হয়েছে, তেমনি একটা ন্যায় কাজের মধ্য দিয়ে সব মানুষকেই ধার্মিক বলে গ্রহণ করবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে এবং তার ফল হল অনন্ত জীবন। যেমন একজন মানুষের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে অনেককেই গুনাহগার বলে ধরা হয়েছিল, তেমনি একজন মানুষের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে অনেককেই ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হবে' (রোমীয় ৫ : ১২-১৯)।

পরে অধিকতর ব্যাখ্যা করে লেখেন,

এই কথা কি জান না যে, আমরা যারা মসীহ ঈসার মধ্যে তরিকাবন্দী নিয়েছি আমরা তার মৃত্যুর মধ্যে অংশগ্রহণ করেই তা নিয়েছি? আর সেজন্য সেই তরিকাবন্দীর দ্বারা মসীহের সঙ্গে মরে আমাদের দাফন করাও হয়েছে, যেন পিতা তার মহাশক্তি দ্বারা যেমন মসীহকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিলেন, তেমনি আমরাও যেন নতুন জীবনের পথে চলতে পারি। মসীহের সঙ্গে মরে যখন তাঁর সঙ্গে আমরা যুক্ত হয়েছি, তখন তিনি যেমন মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন ঠিক তেমনি করে আমরা তার সঙ্গে জীবিতও হব। আমরা জানি যে, আমাদের গুনাহ-স্বভাবকে অকেজো করবার জন্যই আমাদের পুরানো 'আমি' কে মসীহের সঙ্গে ক্রুশের উপরে হত্যা করা হয়েছে, যেন গুনাহের গোলাম হয়ে আর আমাদের থাকতে না হয় (রোমীয় ৬ : ৩-৬)।

এই হচ্ছে প্রায়শ্চিত্ত বা পাপমোচনের দর্শন, যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আমরা পূর্বে দিয়ে এসেছি। পৌলের আগে আর কারও কাছে এ আকীদা ও দর্শন পাওয়া যায় না। সুতরাং তিনিই এর মূল প্রবর্তক সাব্যস্ত হন।

তাওরাত অনুসরণের নির্দেশ

এতক্ষণ খ্রিস্টধর্মের মৌল আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা হল। অতঃপর এ ধর্মের বিশেষ বিশেষ কিছু বিধানের ব্যাপারেও এ বিষয়টা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ হচ্ছে যে, সে সম্পর্কে হযরত মাসীহ (আ.)-এর নির্দেশনা কী ছিল? আর পৌল তাতে কী সংশোধনী এনেছেন।

হযরত মাসীহ (আ.) তাঁর বিভিন্ন বাণীতে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তাওরাতের বিরুদ্ধাচরণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়; বরং আমি তাওরাতের সমর্থন করি। ইনজীলসমূহে তো এ পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, আমি তাওরাত রহিত করতে আসিনি। মথির ইনজীলে আছে,

এই কথা মনে করো না যে, আমি তাওরাত বা নবীদের কিতাব বাতিল করতে এসেছি। আমি সেগুলো বাতিল করতে আসিনি; বরং পূর্ণ করতে এসেছি। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আসমান ও যমীন শেষ না হওয়া পর্যন্ত, যতদিন না তাওরাত কিতাবের সমস্ত কথা সফল হয় ততদিন সেই তাওরাতের এক বিন্দু কি এক মাত্রা মুছে যাবে না (মথি ৫ : ১৭–১৮)।

আরেকবার তিনি বলেন,

তোমরা অন্য লোকদের কাছ থেকে যে রকম ব্যবহার পেতে চাও তোমরাও তাদের সঙ্গে সেই রকম ব্যবহার করো। এটাই হল তাওরাত কিতাব ও নবীদের কিতাবের শিক্ষার মূল কথা (মথি ৭ : ১২)।

এর দ্বারাও বোঝা যায় হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম মৌলিকভাবে তাওরাতকে অবশ্যপালনীয় ও সম্মানার্হ মনে করতেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তাওরাত সম্পর্কে পৌলের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল? নিম্নবর্ণিত উক্তিসমূহ দ্বারা এর জবাব পাওয়া যাবে। গালাতীয়দের নামে প্রেরিত পত্রে তিনি লেখেন,

তাহলে দেখা যায়, যারা শরীয়ত পালন করবার উপর ভরসা করে, তাদের সকলের উপর এই বদদোয়া রয়েছে। তাছাড়া এটাও পরিষ্কার যে, শরীয়ত পালন করবার জন্য আল্লাহ কাউকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন না। কারণ পাক-কিতাবের কথা মত, যাকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয় সে ঈমানের মধ্য দিয়েই জীবন পাবে। ঈমানের সঙ্গে শরীযতের কোন সম্বন্ধ নেই। শরীয়ত বরং বলে, যে লোক শরীয়ত

মত চলে সে তার মধ্য দিয়েই জীবন পাবে। শরীয়ত অমান্য করবার দরুন যে বদদোয়া আমাদের উপর ছিল, মসীহ সেই বদদোয়া নিজের উপর নিয়ে আমাদেরকে শরীয়ত থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন' (গালাতীয় ৩ : ১১-১৩)।

আরও পরে লেখেন,

ঈমান আসবার আগে শরীয়ত আমাদেরকে পাহারা দিয়ে রেখেছিল এবং যতদিন না ঈমান প্রকাশিত হল ততদিন পর্যন্ত আমাদেরকে বন্দী করে রেখেছিল। তাহলে দেখা যায় মসীহের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য এই শরীয়তই আমাদের পরিচালনাকারী, যেন ঈমানের মধ্য দিয়ে আমাদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এখন ঈমান এসে গেছে বলে আমরা আর শরীয়তের পরিচালনার অধীন নই' (গালাতীদ ৩ : ২৩-২৫)।

'তিনি তার ক্রুশের উপরে হত্যা করা শরীরের মধ্য দিয়ে সমস্ত হুকুম ও নিয়মসুদ্ধ মুসার শরীয়তের শক্তিকে বাতিল করেছেন' (ইফিষীয় ২ : ১৫)।

ইবরানীদের কাছে লেখা চিঠিতে বলেন,

এবং যখন ইমামের পদ বদলানো হয়, তখন শরীয়তও বদলাবার দরকার হয়' (ইবরানী ৭ : ১২)।

পরে লেখেন,

প্রথম ব্যবস্থাটা (তাওরাত) যদি নিখুঁত হত, তবে দ্বিতীয় ব্যবস্থার দরকার হত না' (ইবরানী ৮ : ৭)।

পরে ১৩নং আয়াতে বলেন,

আল্লাহ এই ব্যবস্থাকে নতুন ঘোষণা করে আগের ব্যবস্থাকে পুরানো বলে অচল করে দিলেন। যা পুরানো এবং অনেক দিনের বলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তা শীঘ্রই অদৃশ্য হয়ে যাবে।

পৌল তাঁর উপরিউক্ত মন্তব্যসমূহ দ্বারা তাওরাত গ্রন্থের অনুসরণগত গুরুত্বকে সম্পূর্ণ খতম করে দিয়েছেন এবং তার সমস্ত বিধান বাতিল সাব্যস্ত করেছেন।

প্রভুর নৈশ ভোজ

পূর্বের অধ্যায়ে 'প্রভুর নৈশভোজ'-এর ব্যাখ্যা গত হয়েছে। খ্রিস্টধর্মে এ উপাসনাটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রথা। কিন্তু মথি ও মার্কের ইনজীলে যেখানে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, সেখানে হযরত ঈসা (আ.) থেকে এ কাজটিকে একটি স্থায়ী

১. প্রকাশ থাকে যে, বাইবেলে সর্বত্র শরীয়ত (the Law) বলে তাওরাত কিতাবকে বোঝানো হয়েছে।

প্রথা বানিয়ে নেওয়ার কোন আদেশ উল্লেখ করা হয়নি। বস্তুত এ বিধানটি সর্বপ্রথম পৌলই চালু করেছেন (করিন্থীয় ১১ : ২৪)। লূক যেহেতু পৌলের শিষ্য তাই তিনিও এ ব্যাপারে গুরুর অনুসরণ করেছেন।

খ্রিস্টান পণ্ডিতগণও একথা স্বীকার করেছেন। সুতরাং এফ. সি বুরকিট লেখেন,

প্রভুর নৈশভোজের বৃত্তান্ত যদি আপনি মার্কের ইনজীলে পড়েন, তবে সেখানে এ কাজটিকে চালু রাখা সংক্রান্ত কোন আদেশ আপনি পাবেন না। কিন্তু মহাত্মা পৌল যখন ইয়াসূ'র এ কাজটির কথা বর্ণনা করেন, তখন তার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে এই বাক্যটি যোগ করে দেন যে, "আমাকে স্মরণ করবার জন্য তোমরা এরূপই করো"।[১]

খতনা

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম থেকেই খতনার বিধান চলে আসছে। তাওরাতে আছে,

এই ব্যবস্থায় তোমার যা করবার রয়েছে, তা এই– তুমি ও তোমার সমস্ত সন্তান বংশের পর বংশ ধরে এই ব্যবস্থা মেনে চলবে। ... ... তোমাদের প্রত্যেকটি পুরুষের খতনা করতে হবে। তা তোমার ও তোমার বংশের লোকদের মেনে চলতে হবে। ... ... এটাই হবে তোমাদের শরীরে আমার চিরকালের ব্যবস্থার চিহ্ন 'যে লোকের পুরুষাংঙ্গের সামনের চামড়া কাটা নয় তাকে তার জাতির মধ্য থেকে মুছে ফেলা হবে। কারণ সে আমার ব্যবস্থা অমান্য করেছে' (পয়দায়েশ ১৭ : ৯–১৪)।

হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, 'আট দিনের দিন ছেলেটির খতনা করাতে হবে' (লেবীয় ১২ : ৩)।

খোদ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামেরও খতনা হয়েছিল (দেখুন লূক ২ : ২১)। হযরত ঈসা (আ.) থেকে এমন কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না, যা দ্বারা এ বিধানটি রহিত হয়েছে বলে প্রমাণ করা যায়। কিন্তু এ সম্পর্কে পৌলের চিন্তাধারা জানার জন্য তার পত্রাবলী দেখুন। গালাতীয়দের নামে লেখা চিঠিতে আছে,

আমি পৌল তোমাদের বলছি, শোন, যদি তোমাদের খতনা করানোই হয়, তবে তোমাদের কাছে মসীহের কোন মূল্য নেই (গালাতীয় ৫ : ২)।

আরও পরে আছে,

---

১. F. C. Burkitt, the Christian Religion P. 148 V. 3

খতনা করানো বা না করানোর কোন দামই নেই। মসীহের মধ্য দিয়ে নতুন সৃষ্টি হয়ে ওঠাই হল বড় কথা (গালাতীয় ৬ : ১৫)।

ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ

উপরোল্লিখিত আলোচনা দ্বারা এ বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর শিষ্য ও পৌলের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। বর্তমান খ্রিস্টধর্মের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস ও বিধানাবলী হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের শিক্ষা দেওয়া নয়; বরং পৌল কর্তৃক উদ্ভাবিত। ত্রিত্ববাদ, অবতারত্ব, প্রায়শ্চিত্ত, তাওরাতের অনুসরণ প্রসঙ্গ, প্রভুর নৈশভোজ, খতনা প্রভৃতি বিষয়ের মূল প্রবর্তক তিনিই। কেবল এসব সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই যদি বলা হয় পৌলই প্রচলিত খ্রিস্টধর্মের জনক, তবে আমাদের দৃষ্টিতে একথা সম্পূর্ণ ইনসাফসম্মত। তা সত্ত্বেও এখানে এমন সব ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-সবুত পেশ করা সমীচীন মনে হচ্ছে, যা দ্বারা এ দাবির সত্যতা আরও পরিস্ফুট হবে। এজন্য আমাদেরকে পৌলের জীবন বৃত্তান্ত পড়তে হবে। যদিও পৌলের জীবন-বৃত্তান্ত সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সূত্র অতি সীমিত, তথাপি প্রেরিত পুস্তক, স্বয়ং পৌলের পত্রাবলী এবং তার ভিত্তিতে রচিত খ্রিস্টান পণ্ডিতদের বই-পুস্তক এ দাবির সপক্ষে অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ সরবরাহ করে। তা থেকে কয়েকটি আমরা নিচে উল্লেখ করছি।

১– আরব দেশ পরিভ্রমণ

পূর্বে বলা হয়েছে, পৌল প্রথমে ইহুদী ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি হযরত ঈসা মসীহ (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনার দাবি করেন। যদি বাস্তবিকই তিনি হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান এনে থাকতেন, তবে তার দাবি ছিল, তিনি নিজ দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তনের পর হযরত মাসীহ (আ.)-এর হাওয়ারী ও সেই শিষ্যবর্গের কাছে বেশি-বেশি আসা-যাওয়া করবেন, যারা সরাসরি হযরত মাসীহ (আ.)-এর থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন এবং যারা তখন খ্রিস্টধর্মের সর্বাপেক্ষা বড় আলেম ছিলেন।

কিন্তু পৌলের জীবনী পাঠে জানা যায়, তিনি নিজ চিন্তাধারাগত পরিবর্তনের অব্যবহিত পর জেরুজালেমে অবস্থিত হাওয়ারীদের কাছে যাননি; বরং চলে গিয়েছিলেন পূর্ব দামেস্কে। গালাতীয়দের কাছে লেখা চিঠিতে স্বয়ং বলেন,

আল্লাহ আমার জন্মের সময় থেকেই আমাকে নিযুক্ত করে রেখেছিলেন এবং তাঁরই রহমতে সাহাবী হওয়ার জন্য তিনি আমাকে ডেকেছিলেন। আমি যেন

অ-ইহুদীদের কাছে মসীহের বিষয়ে সুসংবাদ তাবলীগ করি, এজন্য আল্লাহ যখন তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁর পুত্রকে আমার কাছে প্রকাশ করলেন, তখন আমি কোন লোকের সঙ্গে পরামর্শ করিনি। এমনকি যারা আমার সঙ্গে সাহাবী হয়েছিলেন আমি জেরুজালেমে তাদের কাছেও যাইনি। আমি তখন আরব দেশে চলে গিয়েছিলাম এবং পরে আবার দামেস্ক শহরে ফিরে এসেছিলাম' (গালাতীয় ১– ১৫–১৭)।

আরব দেশে তিনি কেন গিয়েছিলেন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার নিবন্ধকারের যবানীতে শুনুন,

শীঘ্রই তাঁর (পৌলের) এমন কোন নিরিবিলি ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে চলে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ হল, যেখানে তিনি নতুন অবস্থান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে পারবেন। সুতরাং তিনি দামেস্কের পূর্বাঞ্চলে[১] চলে গেলেন। ... ... তার সামনে এখন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, নিজের নবলব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে শরীয়তের নতুন ব্যাখ্যা দান করা।[২]

বিখ্যাত খ্রিস্টান ঐতিহাসিক জেমস ম্যাককিনন তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা 'মাসীহ থেকে কুসতানতীন'-এর এক স্থানে লেখেন,

চিন্তাধারাগত পরিবর্তনের পর... ... তিনি আরব দেশে চলে গেলেন। দৃশ্যত তার উদ্দেশ্য তাবলীগ অপেক্ষাও বেশি ছিল নিজ নতুন বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত বিষয়াবলী সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা। তিনি জেরুজালেম যান এর তিন বছর পর। সেখানে গিয়েছিলেন ইয়াসূ মাসীহ সম্পর্কে যেসব বর্ণনা ছিল সে সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য পিতর ও প্রভুর ভাই ইয়াকুবের সঙ্গে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে।[৩]

প্রশ্ন হচ্ছে, হযরত ঈসা (আ.)-এর দ্বীনের উপর ঈমান আনার পর তিনি দীর্ঘ তিনটি বছর আলাদা জীবন কেন কাটালেন? তিনি কেন যারা সরাসরি হযরত মাসীহ (আ.)-এর থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, তাদের সাহচর্যে গিয়ে দ্বীনের তালীম গ্রহণ করলেন না? উপরের উদ্ধৃতি দু'টি থেকেই আমরা এর জবাব পেয়ে যাই, তা এই যে, তিনি আসলে হাওয়ারীগণ যাকে খ্রিস্টধর্ম বলে প্রচার করছিলেন, সেই ধর্ম গ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন না। মূলত তিনি শরীয়ত ও খ্রিস্টধর্মের এক নতুন

১. প্রকাশ থাকে যে, এখানে আরব বলে দামেস্কের দক্ষিণাঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে। সেকালে ব্যাপকার্থে তাকেও আরব বলা হত (এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ১৭ খণ্ড, ৩৮৯ পৃষ্ঠা, নিবন্ধ 'পৌল'।

২. ব্রিটানিকা, ১৭ খ্রি. ৩৮৯ পৃষ্ঠা। নিবন্ধ 'পৌল'।

৩. Jams Mackinon, From Christ to Constantine London, Longmams Green 1936 P. 91

ব্যাখ্যা দিতে চাচ্ছিলেন, যেমনটা ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার একটা নিভৃত ও শান্ত পরিবেশের দরকার ছিল, যেখানে বসে তিনি এ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে পারবেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রকৃত দ্বীনের পরিবর্তে একটি নতুন ধর্মের গোড়াপত্তন করা। আর সে জন্য তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর পবিত্র নামকে ব্যবহার করতে চাচ্ছিলেন। পৌলের জীবনীকার প্রসিদ্ধ খ্রিস্টান লেখক এফ. জে. ফকস[১] জ্যাকসন পৌলের এ কর্মপন্থার ব্যাখ্যা দান করেন যে,

পৌলের বিশ্বাস ছিল আল্লাহ তাকে একটি বিশেষ কর্মক্ষেত্র দান করেছেন। আর আল্লাহর বিষয়াবলীতে কোন নশ্বর সৃষ্টির জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত ভূমিকা রাখতে যাওয়া সমীচীন নয়, যতক্ষণ না আল্লাহর রূহ স্বয়ং তাকে পথপ্রদর্শন করবে। এ বিষয়টা মাথায় রাখলে পৌলের কর্মপদ্ধতি বোঝা সহজ হবে এবং উপলব্ধি করা যাবে যে, তিনি জীবিত ইয়াসূ মাসীহকে বোঝার জন্য তার অগ্রবর্তী হাওয়ারীদের থেকে কেন তালীম হাসিল করলেন না। আসলে তিনি এ ব্যাপারে তাদের কৃপাধন্য হওয়ার পরিবর্তে খোদাবন্দের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।[২]

কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখুন, কথাটা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত। তা এর কী প্রমাণ যে, পৌল মুহূর্তের মধ্যে পবিত্রতা ও রিসালাতের এ সুউচ্চ স্তরে পৌঁছে গেলেন? এমনই মর্যাদা হাসিল করলেন যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষামালা অর্জন করার জন্য তার কোন হাওয়ারীর শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন থাকল না এবং এমন অলৌকিক ও অভূতপূর্ব পন্থায় তিনি যদি হযরত ঈসা (আ.) থেকে তাঁর শিষ্যগণ যেসব শিক্ষা প্রচার করেছেন ও ইনজীলসমূহে যা প্রদত্ত হয়েছে, হুবহু তারই ঘোষণা দান করতেন, তাও কথা ছিল, কিন্তু ইতঃপূর্বে আপনি দেখেছেন যে, তিনি যে আকীদা-বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করেছেন, তা হযরত মাসীহ (আ.) প্রচারিত দ্বীনের সম্পূর্ণ বিপরীত ও তার সাথে সাংঘর্ষিক। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি যে সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসব আকীদা-বিশ্বাস লাভ করেছেন এবং এর মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ.)-এর রেখে যাওয়া দ্বীন রহিত হয়ে গেছে, এর অনুকূলে মজবুত কোন দলীল থাকা চাই। কিন্তু অদ্যাবধি যখন এ রকম কোন দলীল কেউ

---

১. F. J. Foakes Jackson, Life of St Paul, London, 1933 P. 129

২. মি. জ্যাকসন মূলত পৌলের একটি বক্তব্যের প্রতি ইশারা করেছেন। পৌল বলেন, আমি যে সুসংবাদ তাবলীগ করেছি তা কোন মানুষের বানানো কথা নয়। আমি কোন লোকের কাছ থেকে তা পাইনি বা কেউ আমাকে তা শেখায়নি; বরং ঈসা মসীহ নিজেই আমার কাছে তা প্রকাশ করেছিলেন।' (গালাতীয় ১ : ১১-১২)

পেশ করতে পারেনি, তখন এরূপ অমূলক দাবির ভিত্তিতে খ্রিস্টধর্মের আগাপাছতলা সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলা সঙ্গত কি?

আর যদি হযরত মাসীহ (আ.)-এর অব্যবহিত পর তাঁরই মর্জি অনুযায়ী কোন 'বৈপ্লবিক রাসূল'-এর আগমন ঘটার কথা থাকে, তবে হযরত মাসীহ (আ.) তার আগমন সম্পর্কে কোন নির্দেশনা ও ইশারা-ইঙ্গিত কেন দিয়ে গেলেন না? বরং আমরা তো দেখছি তিনি (যেমন খ্রিস্টানগণ বলে থাকেন) পঞ্চাশত্তমী ঈদের দিন[১] পাক-রূহের আগমনের সংবাদ দিয়েছিলেন, অথচ তা কোন বৈপ্লবিক ঘটনা ছিল না। কিন্তু তিনি তো পৌলের রাসূল হয়ে আসার কোন সংবাদ দিয়ে যাননি, যা পাক-রূহের আগমন অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ!

পৌলের সঙ্গে হাওয়ারীদের আচরণ

এর উপর প্রশ্ন হতে পারে, পৌলের দাবি যদি মিথ্যা হত এবং তিনি যদি খ্রিস্টধর্ম অনুসরণ করার পরিবর্তে তার বিকৃতিসাধনই করে থাকতেন, তবে হযরত ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারীগণ তাঁর সহযোগিতা করলেন কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য একটু বিস্তারিত আলোচনা দরকার। আমরা যতদূর অনুসন্ধান করে দেখেছি, পৌল হাওয়ারীদের কাছে আসামাত্রই যে নিজের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছিলেন তা নয়; বরং শুরুতে তিনি তাদের সামনে নিজেকে খ্রিস্টধর্মের একজন সাচ্চা অনুসারীরূপে তুলে ধরেছিলেন, যে কারণে হাওয়ারীগণ তাকে পূর্ণ সহযোগিতা দান করেন। কিন্তু পর্যায়ক্রমে তিনি যখন খ্রিস্টধর্মের সংস্কার করতে শুরু করে দিলেন এবং তার মৌল ধারণার উপর কুঠারাঘাত করলেন, তখন হযরত ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারীগণ তাতে আপত্তি তুললেন এবং শেষ পর্যন্ত তারা তার থেকে আলাদা হয়ে গেলেন।

আফসোস, আজ আমাদের কাছে সে যুগের সুরতহাল জানার নির্ভরযোগ্য কোন মাধ্যম নেই। যাও দু'টি সূত্র আছে, তার একটি হল পৌলের নিজের লেখা চিঠিপত্র আর অন্যটি তার শিষ্য লূকের লেখা 'প্রেরিত পুস্তক'। বলাবাহুল্য এ দু'টি পৌলীয় চিন্তা-ভাবনার ধারক হওয়ায় বাস্তবতা জানার পক্ষে নিখুঁত নয়। তথাপি আমরা এ দু'টি মাধ্যম ও অন্য কিছু ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-সবূতের আলোকে এতটুকু ঠিকই জানতে পারি যে, শেষ দিকে পৌল ও হাওয়ারীগণের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিয়েছিল। ঘটনার এ দিকটি সম্পর্কে যেহেতু ইতঃপূর্বে খুব একটা চিন্তা করা হয়নি, তাই আমরা এস্থলে একেকজন হাওয়ারীর সঙ্গে পৌলের সম্পর্ক কেমন ছিল তা কিছুটা বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখব, যাতে প্রকৃত সত্যের উন্মোচন ঘটে।

১. দেখুন প্রেরিত ২ : ১; ১ : ৮

পৌল ও বার্নাবাস

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বার হাওয়ারীর মধ্যে যিনি পৌলের সঙ্গে তার চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন ঘটার পর সর্বপ্রথম মিলিত হয়েছিলেন এবং দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত তার সঙ্গে থেকেছিলেন, তিনি হলেন বার্নাবাস। হাওয়ারীদের মধ্যে তার মর্যাদা কেমন ছিল তা প্রেরিত পুস্তকের নিম্নোক্ত পাঠ দ্বারা অনুমান করা যায়।

ইউসুফ নামে লেবির বংশের একজন লোক ছিলেন। সাইপ্রাস দ্বীপে তার বাড়ি ছিল। তাকে সাহাবীরা বার্নাবাস অর্থাৎ উৎসাহদাতা বলে ডাকতেন। তার এক খণ্ড জমি ছিল, তিনি সেটা বিক্রি করে টাকা এনে সাহাবীদের পায়ের কাছে রাখলেন' (প্রেরিত ৪ : ৩৬–৩৭)।

এই বার্নাবাসই সমস্ত হাওয়ারীর সামনে পৌলের প্রত্যয়ন করেছিলেন এবং তাদেরকে বলেছিলেন, বাস্তবিকই ইনি তোমাদের স্বধর্মীয় বনে গেছেন। এর আগ পর্যন্ত হাওয়ারীগণ পৌলের কথা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। লূক লিখেছেন,

কিন্তু তারা সবাই তাকে (পৌলকে) ভয় করতে লাগল, তারা বিশ্বাস করতে পারল না যে, শৌল (পৌল) সত্যিই একজন উম্মত হয়েছেন। কিন্তু বার্নাবাস তাকে সঙ্গে করে সাহাবীদের কাছে নিয়ে গিয়ে তাদের জানালেন, দামেস্কের পথে শৌল কিভাবে হযরত ঈসাকে দেখতে পেয়েছিলেন এবং ঈসা কিভাবে তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। আর দামেস্কে ঈসার সম্বন্ধে তিনি কিভাবে সাহসের সঙ্গে তাবলীগ করেছিলেন (প্রেরিত ৯ : ২৬–২৭)।

অতঃপর প্রেরিত পুস্তকের বর্ণনা দ্বারা আমরা জানতে পারি, পৌল ও বার্নাবাস দীর্ঘদিন পর্যন্ত একই সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে সফর করেছেন এবং একই সঙ্গে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে তৎপর থেকেছেন (দেখুন প্রেরিত ১১ : ৩০; ১২ : ২৫ এবং ১৩, ১৪ ও ১৫ পরিচ্ছেদ)। এমনকি অন্যান্য হাওয়ারীগণ তাদের সম্পর্কে এ রকম সাক্ষ্যও দিয়েছেন যে,

বার্নাবাস ও পৌল এমন যে, তারা আমাদের হযরত ঈসা মাসীহের জন্য মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন (প্রেরিত ১৫ : ২৬)।

প্রেরিত পুস্তকের ১৫ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত দেখা যায়, বার্ণাবাস ও পৌল প্রতিটি কাজে দুধ-চিনির মত মিশে থাকেন। কিন্তু পরিশেষে অকস্মাৎ অবস্থা পাল্টে যায়। বিষয়টা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এতকাল একই সঙ্গে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দিতে থাকার পর হঠাৎ করেই তাদের মধ্যে এমন তীব্র বিরোধ দেখা দিল যে, তারপর আর তারা পরস্পর মিলেমিশে কাজ করার মত সহিষ্ণুতা দেখাতে

পারলেন না। প্রেরিত পুস্তকে এ ঘটনাটি এমন আকস্মিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাঠক-মন আগে থেকে এর কোন আন্দাজ-অনুমান করতে পারে না। লূক লেখেন,

কিন্তু পৌল ও বার্ণাবাস এন্টিয়কেই রইলেন। সেখানে তারা আরও অনেকের সঙ্গে মাবুদের কালাম শিক্ষা দিতে ও তাবলীগ করতে থাকলেন। কিছুদিন পরে পৌল বার্ণাবাসকে বললেন, 'যেসব জায়গায় আমরা মাবুদের কালাম তাবলীগ করেছি, চল এখনই সেইসব জায়গায় ফিরে গিয়ে ঈমানদার ভাইদের সঙ্গে দেখা করি এবং তারা কেমনভাবে চলছে তা দেখি। তখন বার্ণাবাস ইউহোন্নাকে সঙ্গে নিতে চাইলেন। এই ইউহোন্নাকে মার্ক বলেও ডাকা হত। পৌল কিন্তু তাকে সঙ্গে নেওয়া ভালো মনে করলেন না। কারণ মার্ক পামফুলিয়াতে তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং তাদের সঙ্গে আর কাজ করেননি। তখন পৌল ও বার্ণাবাসের মধ্যে এমন মতের অমিল হল যে, তারা একে অন্যের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। বার্ণাবাস মার্ককে নিয়ে জাহাজে করে সাইপ্রাস দ্বীপে গেলেন। আর পৌল সীলকে বেছে নিলেন। তখন এন্টিয়কের ভাইয়েরা পৌল ও সীলকে মাবুদের রহমতের হাতে তুলে দিলে পর তারা রওনা হলেন। পৌল সিরিয়া ও কিলকিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়ে সমস্ত জামাতগুলোর ঈমান বাড়িয়ে তাদের আরও শক্তিশালী করে তুললেন (প্রেরিত ১৫ : ৩৫–৪১)।

প্রেরিত পুস্তকে বাহ্যত তাদের এই তীব্র মতভেদের কারণ কেবল এতটুকুই বলা হয়েছে যে, বার্ণাবাস ইউহোন্না মার্ককে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন আর পৌল তাতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে এই তুচ্ছ বিষয়টা এমন কঠিন বিরোধের কারণ হতে পারে না, বরং তাদের এ স্থায়ী বিচ্ছেদ নিশ্চয়ই মৌলিক কোন মতভিন্নতার ফল। এর সাক্ষীরূপে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে পারি।

এক. প্রেরিত পুস্তকে লূক তাদের 'মতবিরোধ' ও 'বিচ্ছেদ'কে বর্ণনা করার জন্য যে গ্রীক শব্দ ব্যবহার করেছেন, তা অস্বাভাবিক কঠিন। মিষ্টার এ. এম. ব্লেইকলক প্রেরিত পুস্তকের ভাষ্যগ্রন্থে বলেন,

এবার লূক বিশ্বস্ততার সাথে (পৌল ও বার্ণাবাস এই) সফর সঙ্গীদ্বয়ের মধ্যে দেখা দেওয়া বেদনাদায়ক বিচ্ছেদ-কাহিনী বর্ণনা করছেন। তিনি যে শব্দ ব্যবহার করেছেন (অর্থাৎ Paraxusmas) তা বড় কঠিন। ইংরেজি অনুবাদক (কিং জেমস ওয়ার্জন) শব্দটির অনুবাদে SHRP (তীব্র, প্রচণ্ড) শব্দ যোগ করেছেন, যা বিলকুল সঠিক। পৌল ও বার্ণাবাস একে অন্য থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছেন। এই পৃথক হওয়ার

কথা বোঝানোর জন্যও গ্রীক ভাষার এমন একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা অত্যন্ত কঠোর এবং সাধারণত তা ব্যবহার করা হয় না। নিউ টেষ্টামেন্টে সে শব্দটি এছাড়া আর এক জায়গাতেই (প্রকাশিত কালাম ৬ : ১৪) ব্যবহৃত হয়েছে, যেখানে আকাশমণ্ডলী ধ্বংস হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা জানানো হয়েছে।[১]

তো যে মতবিরোধ এতটাই তীব্র যে, তার জন্য অস্বাভাবিক কঠিন শব্দ ব্যবহার করতে হয়, তা কি 'মার্ককে সফরসঙ্গী বানানো হবে, না সীলকে' এই তুচ্ছ মতভিন্নতাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হতে পারে? ক্ষুদ্র বিষয়কে কেন্দ্র করে বিরোধ সৃষ্টি অসম্ভব কোন ব্যাপার নয়, কিন্তু তার জন্য তো বহু দিনের পুরানো বন্ধুত্বকে চিরদিনের জন্য বিদায় জানানো যেতে পারে না, বিশেষত যখন সে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে এমন এক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, যার মহত্ব সম্পর্কে উভয়েই একমত!

পৌলের কোন এক ভক্ত এ ঘটনায় ইশারা-ইঙ্গিতে বার্ণাবাসকেই অভিযোগের নিশানা বানিয়ে থাকেন। তিনি বলতে চান, তিনি একজন আত্মীয় (ইউহোন্না মার্ক)কে সঙ্গে নেওয়ার খাহেশে কিভাবে তাবলীগী কার্যক্রম ও পৌলের বন্ধুত্বকে[২] বিসর্জন দিলেন? বলাবাহুল্য এ ভক্ত পৌলের শিষ্য।

লক্ষ্য করার বিষয় হল, বার্ণাবাস এমনই এক ব্যক্তি, যিনি তাদের নিজেদেরই স্বীকারোক্তি অনুযায়ী চার্চের প্রাথমিক যুগে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের অন্যতম ছিলেন[৩] এবং যিনি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে নিজের সবটা পুঁজি উৎসর্গ করেছিলেন (প্রেরিত ৪ : ৩৬, ৩৭)। এ রকম একজন সম্মানী ব্যক্তি নিজ আত্মীয়ের কারণে তাবলীগের মহা দায়িত্ব বিসর্জন দিতে পারেন? এই সরল সত্য কথা কেন স্বীকার করা হচ্ছে না যে, আসলে বার্ণাবাস ও পৌলের বিরোধ ছিল চিন্তাধারাগত। যখন বার্ণাবাস দেখলেন, পৌল খ্রিস্টধর্মের মৌল আকীদা-বিশ্বাস পরিবর্তন করে ফেলছেন, তখনই তিনি তার সঙ্গ ত্যাগ করে পৃথক হয়ে যান। লূক যেহেতু পৌলের শিষ্য ছিলেন, তাই তিনি এ বিরোধের এমন এক ব্যাখ্যা দান করেন, যার আলোকে যদি অভিযোগ ওঠানো হয়, তবে তা বার্ণাবাসের উপরই গিয়ে পড়ে। আর পৌল সম্পূর্ণ বেকসুর খালাস হয়ে যান।

দুই. মজার কথা হল, পরবর্তী সময়ে পৌল কিন্তু ইউহোন্না মার্ককে নিজ সঙ্গীরূপে ঠিকই গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তিনি তীমথিয়দের নামে লেখা দ্বিতীয় পত্রে

---

১. Blaiklock, Commentory on Acts, edited by R. V. G. tosher P P. 118, 611

২. Loewenich Paul, Hislife and Work, trans, by G. E. London, 1960 Harris.

৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫০

বলেন, 'তুমি মার্ককে সঙ্গে করে নিয়ে এস, কারণ আমার কাজে তাকে খুব দরকার' (২ তীমথিয় ৪ : ১১)।

এমনিভাবে কলমীয়দের কাছে লেখা চিঠিতে বলেন,

আমার সঙ্গে বন্দী ভাই আরিষ্টার্খ আর বার্ণাবাসের আত্মীয় মার্কও তোমাদের সালাম জানাচ্ছেন। মার্কের বিষয়ে তোমরা তো আগেই হুকুম পেয়েছ যে, তিনি যদি তোমাদের কাছে আসেন, তবে তাকে আদরের সঙ্গে গ্রহণ করো (কলসীয় ৪ : ১০)।

এর দ্বারা বোঝা যায়, মার্ক ও পৌলের বিরোধ খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না, যে কারণে পৌল পরবর্তীতে নিজ সঙ্গে তার থাকাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু গোটা নিউ টেষ্টামেন্টের কোথাও কিংবা কোন ইতিহাস-গ্রন্থে পৌল ও বার্ণাবাস সম্বন্ধে পাওয়া যায় না যে, তাদের মধ্যে সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়েছিল।[১] প্রশ্ন হচ্ছে মার্ককে কেন্দ্র করেই যদি বিরোধ দেখা দিয়ে থাকে, তবে তার সাথে পৌলের সম্পর্ক ঠিক হয়ে যাওয়ার পর বার্ণাবাস ও পৌলের মধ্যকার মনোমালিন্য কেন দূর হল না?

তিন. স্বয়ং পৌলের চিঠিপত্রে আমরা বার্ণাবাসের প্রতি তার অসন্তুষ্টির কারণ অনুসন্ধান করলে তার কোথাও একথা পাই না যে, ইউহোন্না মার্কই সেই কারণ। বরং তাতে আমরা এমন একটি বাক্য দেখতে পাই, যা দ্বারা উভয়ের মধ্যকার বিরোধের মূল কারণের উপর কিছুটা আলোকপাত হয়। গালাতীয়দের কাছে লেখা এক পত্রে পৌল বলেন,

'পিতর যখন আন্তিয়খিয়া শহরে আসলেন, তখন তার মুখের উপরই আমি আপত্তি জানালাম। কারণ তিনি অন্যায় করেছিলেন। ঈমানদার ইহুদীদের যে দলটি অ-ইহুদীদের খতনা করাবার উপর জোর দেয়, তাদের কয়েকজন ইয়াকুবের কাছ থেকে আসবার আগে পিতর অ-ইহুদীদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতেন। কিন্তু যখন সেই দলের লোকেরা আসল তখন তিনি তাদের ভয়ে অ-ইহুদীদের সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে নিজেকে আলাদা করে নিলেন। এন্টিয়কের অন্যান্য ঈমানদার ইহুদীরাও পিতরের সঙ্গে এই ভণ্ডামিতে যোগ দিয়েছিল। এমনকি বার্ণাবাসও তাদের ভণ্ডামির দরুন ভুল পথে পা বাড়িয়েছিলেন" (গালাতীয় ২ : ১১–১৩)।

পৌল এ পত্রে মূলত হযরত মাসীহ (আ.)-এর আসমানে উঠে যাওয়ার কিছুকাল পর জেরুজালেম ও আন্তিয়খিয়ার খ্রিস্টানদের মধ্যে যে মতবিরোধ দেখা

---

১. এর পর পৌল কেবল এক জায়গায় (করিন্থীয় ৭ : ৬) তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে তাঁর কোন বদনাম করেননি। কিন্তু এর দ্বারাও অনুমেয় হয়, তাদের পুরানো সম্পর্ক আর ফিরে আসেনি।

দিয়েছিল সেটারই উল্লেখ করেছেন। জেরুজালেমের অধিকাংশ লোক আগে ইহুদী ছিল। পরে তারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। অপর দিকে আন্তিয়খিয়ার অধিকাংশ লোক ছিল পৌত্তলিক বা অগ্নিপূজক, যারা হাওয়ারীদের তাবলীগ ও তালীমী প্রচেষ্টায় খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। বাইবেলে প্রথমোক্ত দলকে ইহুদী খ্রিস্টান (Jewish Christian) এবং দ্বিতীয় দলকে অ-ইহুদী খ্রিস্টান (Contile Christians) বলা হয়েছে। ইহুদী খ্রিস্টানদের দাবি ছিল, খতনা করানো ও হযরত মুসা (আ.)-এর শরীয়তের সমস্ত বিধান পালন করা অবশ্য কর্তব্য। এ কারণে তাদেরকে মাখতুন (খতনাকৃত)ও বলা হয়। আর অ-ইহুদী খ্রিস্টানরা বলত, খতনা ইত্যাদি জরুরি নয়। তাছাড়া ইহুদী খ্রিস্টানগণ যেহেতু পৌত্তলিক ও অগ্নিপূজকদের যবেহকৃত পশুকে হালাল মনে করত না, তাই তারা তাদের সাথে ওঠা-বসা ও খাওয়া-দাওয়া করা পছন্দ করত না। এ ব্যাপারে পৌল ছিলেন শতভাগ অইহুদীদের সমর্থক। বরং তিনিই তাদের চিন্তাধারার প্রবর্তক ছিলেন। তিনি অ-ইহুদীদেরকে নিজের পক্ষে রাখার কৌশল হিসেবেই এ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

উপরে আমরা গালাতীয়দের নামে লেখা তার চিঠির যে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছি, তাতে তিনি পিতর ও বার্ণাবাসের নিন্দা করেছেন কেবল এ কারণেই যে, তারা আন্তিয়খিয়ায় অবস্থানকালে খতনাকারীদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন এবং পৌলের যে নতুন অনুসারীগণ খতনা ও হযরত মুসা (আ.)-এর শরীয়তের বিরোধী ছিল তাদেরকে এড়িয়ে চলছিলেন। সুতরাং পাদ্রী জে. পিটারসন স্মিথ লেখেন,

পৌল এ অপরিচিত শহরে (আন্তিয়খিয়ায়) তার পুরানো বন্ধু-বান্ধব ও জেরুজালেম থেকে আগত লোকদের সাথেই বেশি মেলামেশা করতেন। ফলে তারা অতি দ্রুত তার ভক্ত-অনুরক্ত হয়ে যায়। অন্যদিকে পিতর দ্বারা প্রভাবিত ছিল ইহুদী খ্রিস্টানগণ। এক পর্যায়ে বার্ণাবাসও অ-ইহুদী অনুসারীদেরকে এড়িয়ে চলতে শুরু করেন। এ আচরণ দেখে সেই নতুন অনুসারীদের মনে ব্যথা লাগত। পৌল এটা যথাসাধ্য সহ্য করে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি অবিলম্বেই তার মুকাবেলা করতে শুরু করেন, যদিও তা করতে যেয়ে তাকে নিজ সঙ্গীদের বিরুদ্ধাচরণ করতে হয়েছে।[১]

প্রকাশ থাকে যে, এটা বার্ণাবাস ও পৌলের পারস্পরিক বিচ্ছেদের অল্প কিছুদিন আগের ঘটনা। আন্তিয়খিয়ায় পৌলের আগমন হয়েছিল জেরুজালেমে অনুষ্ঠিত হাওয়ারীদের সম্মেলনের সামান্য পরে। হাওয়ারীদের সম্মেলন এবং

---

১. পৌলের জীবনী ও তার পত্রাবলী, পাঞ্জাব রিলিজাম বুক সোসাইটি, লাহোর ১৯৫২ খ্রি., পৃষ্ঠা ৮৮, ৮৯

পৌল ও বার্ণাবাসের বিচ্ছেদের মধ্যে বেশি দিনের ব্যবধান ছিল না। লূক উভয় ঘটনা তার প্রেরিত পুস্তকের ১৫ নং পরিচ্ছেদেই উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং একথা জোর দিয়েই বলা চলে যে, পৌল ও বার্ণাবাসের যে বিচ্ছেদের ঘটনা লূক অস্বাভাবিক কঠোর ভাষায় বর্ণনা করেছেন, তার প্রকৃত কারণ ইউহোন্না মার্ককে সফরসঙ্গী বানানো সংক্রান্ত মতভিন্নতা নয়; বরং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি গত মতভিন্নতা। পৌল তার অনুসারীদের জন্য খতনার প্রয়োজন বোধ করতেন না এবং হযরত মুসা (আ.)-এর শরীয়ত মানাকেও জরুরি মনে করতেন না। পক্ষান্তরে বার্ণাবাস ছিলেন এ ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর। তিনি বাইবেলে যেসব বিধান গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে এবং যা রহিত হওয়ারও কোন প্রমাণ নেই, তাতে কোন রকম ছাড় দিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

সুতরাং পাদ্রী জে. পিটারসন স্মিথও এ বিষয়টা উপলব্ধি করেছেন যে, পৌল ও বার্ণাবাসের মধ্যকার বিচ্ছেদ কেবল মার্কের কারণে ঘটেনি; বরং এর পেছনে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যেরও ভূমিকা আছে। তিনি লেখেন,

বার্ণাবাস ও পিতর, যারা কি না অত্যন্ত উঁচু মনের মানুষ ছিলেন, অবশ্যই নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করে থাকবেন এবং এভাবে এক পর্যায়ে সেই পরিস্থিতিরও অবসান ঘটে থাকবে। অবশ্য তা সত্ত্বেও এ অবকাশও থেকে যায়, যে তাদের মধ্যে কিছু না কিছু মনোমালিন্য হয়ত শেষ পর্যন্ত থেকে গিয়েছিল, যা পরবর্তীকালে প্রকাশ পায়।[১]

মিষ্টার স্মিথ যেন স্বীকার করে নিয়েছেন যে, পরবর্তীকালে পৌল ও বার্ণাবাসের মধ্যে যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল, তাতে চিন্তাধারার পার্থক্যেরও ভূমিকা ছিল।

জেরুজালেম কাউন্সিল

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, প্রেরিত পুস্তকের ১৫ তম পরিচ্ছেদে তো বলা হয়েছে, নেতৃস্থানীয় শিষ্যগণ জেরুজালেমে একত্র হয়ে পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, অ-ইহুদীদেরকে কেবল হযরত মাসীহ (আ.)-এর উপর ঈমান আনার দাওয়াত দেওয়া হবে। তাদেরকে হযরত মুসা (আ.)-এর শরীয়ত অনুসরণ করতে বলা হবে না। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে পৌল ছাড়া পিতর, বার্ণাবাস ও ইয়াকুবও শরীক ছিলেন। এ অবস্থায় পৌল অ-ইহুদীদের জন্য তাওরাতের খতনা ইত্যাদি বিধান অবশ্য পালনীয় না হওয়ার কথা বলতেন বিধায় পিতর ও বার্ণাবাস

---

১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৯, ৯০

তার সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হবেন এটা কী করে সম্ভব? পৌলের বিপরীতে পিতর ও বার্ণাবাসের মত যদি এই হত যে, অ-ইহুদীদের জন্যও তাওরাতের বিধান অবশ্য পালনীয়, তবে জেরুজালেমের কাউন্সিলেই তারা তা প্রকাশ করতেন এবং "অ-ইহুদীদের জন্য তাওরাতের বিধান অবশ্য পালনীয় নয়" এ মর্মে ফতোয়া জারি করতেন না।

এ প্রশ্নটি আপাতদৃষ্টিতে শক্তিশালীই মনে হয়, কিন্তু যখন জেরুজালেমের সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় এবং যখন পৌল ও বার্ণাবাস পরস্পর আলাদা হয়ে যান, সেই সময়কার পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষন করলে এ প্রশ্ন আপনা-আপনিই দূর হয়ে যায়।

এ ব্যাপারে আমরা যতদূর খতিয়ে দেখেছি, তাতে উপলব্ধি করা গেছে, জেরুজালেমের সম্মেলনে হাওয়ারীগণ অ-ইহুদীদের জন্য যে তাওরাতের বিধান অবশ্য পালনীয় নয় বলে রায় দিয়েছিলেন, তার মানে এ নয় যে, তারা চিরদিনের জন্য সেসব বিধানের আওতামুক্ত থাকবে এবং তাদের জন্য তা আদপে বিধেয়ই নয়; বরং তখনকার পরিবেশ-পরিস্থিতি চিন্তা করলে বোঝা যায়, তাওরাতের কিছু শাখাগত বিধান, যেমন খতনা ইত্যাদি হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি অ-ইহুদীদের ঈমান আনার পক্ষে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই সব শাখাগত বিধান মেনে চলতে হবে এই ভয়ে তারা খ্রিস্টধর্মের অনুসরণ থেকে বিরত থাকছিল। অল্পবিদ্য কিছু লোক তাদেরকে বুঝিয়েছিল, আখেরাতের নাজাত লাভের জন্য যেমন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উপর ঈমান আনা শর্ত, তেমনি খতনা করাসহ তাওরাতের যাবতীয় বিধান মানাও জরুরি। সেসব বিধান পালন না করলে নাজাত লাভ সম্ভব নয়। সুতরাং লূক লেখেন,

এহুদিয়া প্রদেশ থেকে কয়েকজন লোক এন্টিয়কে আসলেন এবং ঈমানদার ভাইদের এই বলে শিক্ষা দিতে লাগলেন যে, মূসার শরীয়ত মতে তোমাদের খতনা করানো না হলে তোমরা কোন মতেই নাজাত পেতে পার না (প্রেরিত ১৫ : ১)।

বলাবাহুল্য এ শিক্ষা ভুল ছিল। খতনা ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিধান যদিও হযরত মুসা ও হযরত ঈসা (আ.)-এর দ্বীনে অবশ্য পালনীয় ছিল, কিন্তু তার উপর ঈমান নির্ভরশীল ছিল না এবং তাকে নাজাত লাভের পূর্বশর্তও বলা যায় না। আপনি চিন্তা করে দেখুন, কোন অমুসলিম যদি এই কারণে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে যে, ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে খতনা করতে হবে, তবে তখন মুসলিম আলেমগণ কী পন্থা অবলম্বন করবে? তারা কি কেবল খতনা না করানোর অজুহাতে এটা স্বীকার করে নেবেন যে, সেই লোক দ্বীনে ইসলাম থেকে মাহরূম

থাকুক? বলাবাহুল্য তারা এ নীতি অবলম্বন করবেন না। এরূপ ক্ষেত্রে সেই অমুসলিমকে বলা হবে, খতনার বিধান পালনীয় বটে, কিন্তু এটা নাজাতের শর্ত নয়। কাজেই তুমি ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ গ্রহণ করে নাও। এজন্য আমরা তোমাকে খতনার জন্য বাধ্য করব না। এর মানে এ নয় যে, অমুসলিমদের জন্য খতনার বিধান রহিত করে দেওয়া হচ্ছে। বরং এর লক্ষ্য কেবল أَهْوَنُ الْبَلِيَّتَيْنِ (MinoR evil) বা মন্দের ভালোকে মেনে নিয়ে অমুসলিম ব্যক্তিকে কুফর থেকে উদ্ধার করে আনা।

বস্তুত হাওয়ারীগণ এ কর্মপন্থাই অবলম্বন করেছিলেন এবং জেরুজালেমে যখন এ বিষয়টির উপর আলোচনা হয়, তখন সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, অমুসলিমগণ যেহেতু খতনা ইত্যাদি বিধানকে নিজেদের জন্য অসহনীয় মনে করে, তাই তাদেরকে এসব বিধান পালন করা ছাড়াও খ্রিস্টধর্মে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হোক।

আমরা হাওয়ারীদের কর্মপন্থার যে ব্যাখ্যা দান করলাম, তা মোটেই ভিত্তিহীন নয়। পিতরের একটি বক্তৃতায়ও তা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি জেরুজালেমের সম্মেলনে আপন বক্তৃতায় বলেছিলেন,

'আমাদের পূর্বপুরুষেরা বা আমরা যে বোঝা বইতে পারিনি, সেই বোঝা অ-ইহুদী ঈমানদারদের কাঁধে তুলে দিয়ে কেন আপনারা আল্লাহকে পরীক্ষা করবার চেষ্টা করছেন? আমরা বিশ্বাস করি যে, হযরত ঈসার রহমতে অ-ইহুদী ঈমানদারেরা যেমন নাজাত পেয়েছে তেমনি আমরাও নাজাত পেয়েছি (প্রেরিত ১৫ : ১০-১১)।

এর পরিষ্কার অর্থ কি এই নয় যে, তিনি বলতে চাচ্ছেন, তাওরাতের কিছু শাখাগত বিধান অত্যন্ত কঠিন ছিল। আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ তা পুরোপুরি পালন করতে পারিনি। তা সত্ত্বেও আমরা মুমিন এবং আমরা নাজাতের আশাবাদী। তাহলে অ-ইহুদীগণ যদি কিছু শাখাগত বিধান পালন না করে, তবে তারা কেন মুমিন হবে না ও নাজাতের আশা করতে পারবে না?[১]

---

১. পক্ষান্তরে পিতরের যদি একথা বোঝানো উদ্দেশ্য হত যে, অ-ইহুদী খ্রিস্টানদের জন্য তাওরাতের বিধানাবলী সম্পূর্ণরূপে রহিত করে দেওয়া হোক, তবে সেগুলো ইহুদী খ্রিস্টানদের জন্যও রহিত করে দেওয়া উচিত ছিল। কেননা পিতর সেসব বিধানকে অ-ইহুদীদের জন্য যেমন সাধ্যাতীত সাব্যস্ত করেছেন, তেমনি ইহুদী খ্রিস্টানদের জন্যও সাধ্যাতীত বলেছেন। কাজেই উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই তা রহিত করা দরকার ছিল, কেবল অ-ইহুদীদের জন্য নয়।

প্রকাশ থাকে যে, জেরুজালেম সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় 'অ-ইহুদীদের জন্য তাওরাতের বিধানাবলী অবশ্য পালনীয় কিনা' তা সাব্যস্ত করা নয়; বরং 'অ-ইহুদীদেরকে তাওরাতের বিধান পালনের নির্দেশ দেওয়া হবে কিনা' সেটাই ছিল আলোচ্য বিষয়। আমরা অনুসন্ধান করে দেখেছি, তাওরাতের বিধানাবলী অবশ্যপালনীয় হওয়া নিয়ে হাওয়ারীদের মধ্যে কোন মতভেদ ছিল না। সকলেই স্বীকার করতেন, তা অবশ্য পালনীয়। কথাবার্তা চলছিল এই নিয়ে যে, অ-ইহুদীরা যেহেতু এসব বিধানের নাম শুনলে ঘাবড়ে যায় ও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ থেকে পিছিয়ে থাকে, তাই তাদেরকে কেবল মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের দাওয়াত দিয়েই ক্ষান্ত থাকা হবে কিনা। এ কারণেই যারা অ-ইহুদীদেরকে তাওরাতের বিধান মানতে বাধ্য করার পক্ষে ছিলেন, তাদের অবস্থা বর্ণনা করতে যেয়ে লূক বলেন,

'ফরীশী দলের কয়েকজন লোক ঈমানদার হয়েছিলেন। সেই ঈমানদারেরা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, অ-ইহুদীদের খতনা করানো দরকার এবং তারা যেন মূসার শরীয়ত পালন করে সেজন্য তাদের হুকুম দেওয়া দরকার (প্রেরিত ১৫ : ৫)।

এর জবাবে ইয়াকুব যখন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন, তাতে তিনি বললেন,

এজন্য আমার মতে যে অ-ইহুদীরা আল্লাহর দিকে ফিরছে তাদের কষ্ট দেওয়া আমাদের উচিত নয়। তার চেয়ে বরং আমরা তাদের কাছে লিখি যে, তারা যেন প্রতিমার সঙ্গে যুক্ত সবকিছু থেকে এবং সমস্ত রকম যিনা থেকে দূরে থাকে। আর গলা টিপে মারা পশুর গোশত এবং রক্ত যেন তারা না খায় (প্রেরিত ১৫ : ১৯-২১)।

এ সম্মেলন সর্বসম্মতিক্রমে অ-ইহুদীদের কাছে যে চিঠি লিখেছিল, তাতে বলা হয়েছিল,

পাক-রূহ আর আমরা এটাই ভাল মনে করলাম যে, এই দরকারী বিষয়গুলো ছাড়া আর কোন কিছুর দ্বারা আপনাদের উপর যেন বোঝা চাপানো না হয়। সেই দরকারী বিষয়গুলো হল, আপনারা মূর্তির কাছে উৎসর্গ করা খাবার খাবেন না, রক্ত খাবেন না, গলা টিপে মারা পশুর গোশত খাবেন না এবং কোন রকম যিনা করবেন না। এইসব করা থেকে দূরে থাকলে আপনারা ভালো করবেন– বিদায়' (প্রেরিত ১৫ : ২৮, ২৯)।

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হাওয়ারীগণ তাওরাতের বিধানাবলী চূড়ান্তরূপে রহিত করেননি; বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা করে অ-ইহুদীদেরকে সেগুলোর অনুসরণ ছাড়াই খ্রিস্টধর্মে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলেন। পাদ্রী জি. টি ম্যানলি স্পষ্টভাবেই লিখেছেন,

প্রত্যাবর্তনকালে তারা (বার্ণাবাস ও পৌল) জানতে পারলেন, অ-ইহুদীদেরকে কি কি শর্তে পরিপূর্ণরূপে চার্চে শরীক করা যায়, এ নিয়ে আজকাল খুব আলোচনা হচ্ছে। এন্টিয়কে এ রকমই নিয়ম ছিল। পৌল ও বার্ণাবাস সুসংবাদ প্রচারে যে সব সফর করছিলেন, তাতেও এ নিয়ম অনুসরণ করতেন। অ-ইহুদীদেরকেও ইহুদীদের মত চার্চে যোগদানের ও তাদের সঙ্গী হওয়ার অনুমতি দেওয়া হত। এ ব্যাপারে তাদের জন্য খতনার শর্ত ছিল না (যেমনটা ইহুদী ভক্তদের জন্য ছিল) এবং তাদের জন্য হযরত মুসা (আ.)-এর শরীয়ত পালনও বাধ্যতামূলক ছিল না। কিন্তু জেরুজালেম-চার্চের কট্টরপন্থী 'ইহুদী খ্রিস্টানগণ' এ ব্যাপারে অনমনীয় ছিলেন। তাদের মত ছিল, 'অ-ইহুদীদেরকেও তা অবশ্যই পালন করতে হবে' বলে জানিয়ে দেওয়া হোক। সুতরাং জেরুজালেমের সম্মেলনে এন্টিয়ক থেকে প্রতিনিধি দল পাঠানো হল। পৌল ও বার্ণাবাস ছিলেন তাদের নেতা। সে সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হল, অ-ইহুদী নতুন ভক্তদের উপর এ রকম কোন শর্ত আরোপ করা হবে না। তবে ইহুদী-খ্রিস্টান ও অ-ইহুদী খ্রিস্টানদের পারস্পরিক মেলামেশা এবং একত্রে খাওয়া-দাওয়া করার জন্য এ বিষয়টাকে আবশ্যিক করে দেওয়া হল যে, অ-ইহুদী খ্রিস্টানদেরকে প্রতিমার নামে উৎসর্গকৃত পশুর গোশত খাওয়া, রক্ত খাওয়া, গলা টিপে মারা পশুর গোশত খাওয়া ও যিনা করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। আর তাদেরকে মুসা (আ.)-এর শরীয়তে যে উন্নত চরিত্র শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা অনুসরণ করতে হবে।[১]

উল্লিখিত বক্তব্য, বিশেষত দাগ দেওয়া বাক্যগুলি দ্বারাও একথা ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, অ-ইহুদী খ্রিস্টানদের জন্য তাওরাতের বিধানাবলী চূড়ান্তরূপে রহিত করে দেওয়া নয়; বরং হাওয়ারীদের উদ্দেশ্য ছিল, খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের জন্য তার অনুসরণকে তাদের জন্য বাধ্যতামূলক না করা।

তো এই ছিল হাওয়ারীগণের প্রকৃত অবস্থান, যা জেরুজালেম সম্মেলনে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সম্মেলন শেষে পৌল ও বার্ণাবাস যখন এন্টিয়কে পৌঁছলেন, তখন পৌল হাওয়ারীদের সে ঘোষণা থেকে অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করলেন। তিনি শিক্ষা দেওয়া শুরু করলেন, তাওরাতের সমস্ত বিধান চূড়ান্তভাবে রহিত হয়ে গেছে। সেসব বিধান ছিল একটা অভিশাপ, যা থেকে এখন মুক্তি লাভ হয়েছে।[২] কাজেই এখন আর তা অনুসরণের কোন প্রয়োজন নেই।

---

১. জি. টি ম্যানলি, 'আমাদের পবিত্র গ্রন্থাবলী', উর্দূ অনুবাদ জে. এইস ইমামুদ্দীন ও মিসেস কে. এল. নাসির, মাসীহী ইশাআতখানা, ফিরোযপুর রোড, লাহোর, পৃষ্ঠা ২৫

২. গালাতীয় ৩ : ১৩

স্পষ্ট কথা যে, পৌলের এ দাবি গ্রহণ করলে সেটা হত খ্রিস্টধর্মকে সম্পূর্ণ ওলটপালট করার নামান্তর। আর এ কারণেই পিতর ও বার্ণাবাস পৌলের বিরোধিতা করেছিলেন। পৌল নিজেই লেখেন,

পিতর যখন আন্তিয়খিরা শহরে আসলেন তখন তার মুখের উপরেই আমি আপত্তি জানালাম, কারণ তিনি অন্যায় করেছিলেন। ঈমানদার ইহুদীদের যে দলটি অ-ইহুদীদের খতনা করাবার উপর জোর দেয়, তাদের কয়েকজন ইয়াকুবের কাছ থেকে আসবার আগে পিতর অ-ইহুদীদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতেন। কিন্তু যখন সেই দলের লোকেরা আসল তখন তিনি খতনাকৃতদের ভয়ে অ-ইহুদীদের সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে নিজেকে আলাদা করে নিলেন। এন্টিয়কের অন্যান্য ঈমানদার ইহুদীরাও পিতরের সঙ্গে এই ভণ্ডামীতে যোগ দিয়েছিল। এমনকি বার্ণাবাসও তাদের ভণ্ডামীর দরুণ ভুল পথে পা বাড়িয়েছিলেন' (গালাতীয় ২ : ১১–১৩)।

এ ঘটনার পরপরই বার্ণাবাস পৌলের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তার থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন (প্রেরিত ১৫ : ৩৫–৪১)।[১]

গালাতীয়দের নামে লেখা পত্র

অনুমান করা যায়, এ সময়ে পিতর ও বার্ণাবাস যে পৌলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, সে কারণে মূল খ্রিস্টানদের একটা বড় অংশ পৌলের বিরোধী হয়ে গিয়েছিল। এমনকি এ কারণে অ-ইহুদী খ্রিস্টানদের আবাসভূমি গালাতিয়ায় ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। এখানকার লোক পৌলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল, যে কারণে তিনি এন্টিয়কে বসে গালাতীয়দের নামে একটি চিঠি লেখেন এবং তাতে যারা অ-ইহুদীদের জন্য তাওরাতের বিধান অবশ্য পালনীয় মনে করেন, কঠোর ভাষায় তাদের সমালোচনা করেন। পৌলের এ চিঠিটি বিভিন্ন কারণে তাঁর অন্যান্য চিঠি অপেক্ষা বেশি গুরুত্ব রাখে। এক তো এ কারণে যে, এটা তারিখ হিসেবে পৌলের চৌদ্দটি চিঠির মধ্যে সর্বপ্রথম লেখা চিঠি। দ্বিতীয়ত এই সর্বপ্রথম তিনি সুস্পষ্টভাবে নিজ দৃষ্টিভঙ্গির ঘোষণা দেন। এর আগে এতটা পরিষ্কারভাবে তিনি নিজ চিন্তাধারা প্রকাশ করেননি। তৃতীয়ত এ চিঠিতে তাকে অত্যন্ত তেজিয়ান দেখা যায়। এতে তিনি তার বিরুদ্ধবাদীদেরকে বারবার লানত করেছেন। চতুর্থত এ চিঠিতেই প্রথমবারের মত তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, খ্রিস্টধর্মের শিক্ষা গ্রহণের জন্য তার কোন হাওয়ারীর শরণাপন্ন হওয়ার দরকার নেই। কেননা সরাসরি ওহীর মাধ্যমেই সে শিক্ষা তিনি লাভ করে থাকেন।

---

১. হুবহু ভাষ্যের জন্য দেখুন, এ পুস্তকেরই পৃষ্ঠা ১২০, ১২৮

পৌলের আসল রূপ জানার জন্য তার এ চিঠিটি গভীর মনোযোগের সাথে পাঠ করা অত্যন্ত জরুরি। এ কারণেই নিচে আমরা এ চিঠিটি সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা পেশ করছি।

এই তেজস্বী পত্রটি লেখার কারণ ছিল এই যে, ইহুদী ধর্মের দিক ঝোঁকা একদল খ্রিস্টান পৌল কর্তৃক গালাতিয়ার গীর্জাসমূহে পাঠানো ইনজীলের[১] উপর হামলা করেছিল। সেই ভণ্ড শিক্ষকদের শিক্ষা ছিল এই যে, পৌল যে ইনজীল প্রচার করেন, তা খ্রিস্টীয় জীবনের প্রথম কদম মাত্র। নবদীক্ষিত খ্রিস্টানদের জন্য বরকত হাসিল করার উপায় হল হযরত মুসার শরীয়তের অনুসরণ করা (৩ : ৩)। তারা পৌল সম্বন্ধে অভিযোগ তুলত, তিনি নীতিহীন ও সুবিধাবাদী লোক। নিজে তো শরীয়ত পালন করেন, কিন্তু নব দীক্ষিতদেরকে তা করতে বলেন না। তাদের আক্রমণের পন্থা ছিল এই যে, তারা পোপের প্রচার ও এখতিয়ারকে প্রশ্নবিদ্ধ ও অন্তসারশূন্য করে তোলার চেষ্টা করত। তারা বলত, ইনি মাসীহ (আ.)-এর বার শিষ্য থেকে আলাদা। তার ভিন্নমত প্রকাশের কোন অধিকার নেই। কেননা মাসীহ (আ.)-এর শিষ্যগণ সর্ব বিচারেই পৌল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সঙ্গত কারণেই গালাতীয়গণ এ রকম প্রচারণায় বেশ প্রভাবান্বিত হল। তাদের অধিকাংশই পৌলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হল ও তার থেকে দূরে সরে গেল। এভাবে বিরুদ্ধবাদীদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হল।[২]

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় এ চিঠির প্রেক্ষাপট লেখা হয়েছে নিম্নরূপ,

(গালাতীয়দের মধ্যে) অবাধ্যতা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে– এ বিষয়টা পৌল জানতে পেরেছিলেন পরে। এটা এমন কিছু হুজ্জতী লোকদের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল, যারা গালাতীয়দেরকে ধারণা দিচ্ছিল যে, পৌলের ইনজীল ইহুদী বিধানাবলীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া উচিত, যেমনটা পুরানো ও আসল হাওয়ারীদের (Apostles) শিক্ষা। এক পূর্ণাঙ্গ খ্রিস্টীয় জীবনের জন্য খতনা এবং হযরত মুসা (আ.)-এর শরীয়তের অনুসরণও জরুরি। অন্য ভাষায়, গালাতীয়দের অন্তরে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে তোলার চেষ্টা চলছিল যে, খ্রিস্টীয় ব্যবস্থার জন্য সক্ষমতা অর্জনের একমাত্র বৈধ উপায় হল তাওরাতের অনুসরণ, যা সমস্ত নবদীক্ষিত খ্রিস্টানদের জন্য জরুরী। এমনকি যারা পৌত্তলিক ধর্ম থেকে খ্রিস্টধর্মে এসেছে তাদেরও জন্য। এসব তৎপরতা যারা চালাচ্ছিল, তারা প্রাচীন চার্চের

---

১. প্রকাশ থাকে যে, খ্রিস্টানদের ভাষায় 'ইনজীল' বলে ধর্মপ্রচার বা ধর্মীয় ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়।
২. হামারী কুতুবে মুকাদ্দাসা, পৃষ্ঠা ৩৭৩

'ইহুদী খ্রিস্টান সংঘ'-এর সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তাদের ভয় ছিল, তাওরাতকে খারিজ করে দিলে চার্চের নৈতিক গুণাবলী শেষ হয়ে যাবে। তারা ইয়াকুবের দলের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল, যেমনটা প্রেরিত পুস্তকের ১৫ নং পরিচ্ছেদে এর আভাস পাওয়া যায়। বাহ্যত কোন কোন বিশিষ্টজন তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল।[১]

উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহের চিহ্নিত বাক্যসমূহ থেকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তবলী আহরণ করা যায়,

১. গালাতিয়ায় প্রাচীন চার্চের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গই ছিলেন পৌলের বিরোধী।

২. তাদের কথা ছিল, অ-ইহুদীদের মধ্যে যারা খতনা ছাড়া খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে, তারা খ্রিস্টধর্মে কেবল প্রথম কদম ফেলেছে। পূর্ণাঙ্গ খ্রিস্টীয় জীবনের জন্য খতনাসহ শরীয়তের সমস্ত বিধান মানা জরুরি।

৩. তারা বলত, খ্রিস্টধর্মের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার অধিকার শুধু হাওয়ারীদেরই আছে, পৌলের নয়।

৪. তাদের ধারণা অনুযায়ী পুরানো ও আসল হাওয়ারীদের শিক্ষা ছিল এই যে, পূর্ণাঙ্গ খ্রিস্টীয় জীবনের জন্য খতনাসহ তাওরাতের সমস্ত বিধান পালন করা অবশ্য কর্তব্য।

এর দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায়, পৌলের বিরুদ্ধে আপত্তিকারীদের মূল আপত্তি ছিল এই যে, তিনি হাওয়ারীদের বিরুদ্ধাচরণ করছেন কেন? তার তো এ অধিকার নেই। এ ব্যাপারে হাওয়ারীগণ পৌলের সঙ্গে একমত হলে তার জন্য জবাবদিহীর সোজা পথ তো এই ছিল যে, তিনি গালাতীয়দের কাছে নিজে চিঠি না লিখে হাওয়ারীদের দ্বারা লেখাতেন, যাতে তারা পৌলের মতে সমর্থন জানাতেন অথবা নিজেই লিখতেন এবং তাতে একথা স্পষ্ট করে দিতেন যে, সমস্ত হাওয়ারী আমার সহমত পোষণ করেন এবং তারা জেরুজালেম সম্মেলনে অ-ইহুদীদের জন্য খতনা ইত্যাদি জরুরি না হওয়ার ফায়সালা করেছেন। কিন্তু তিনি গালাতীয়দের নামে লেখা চিঠিতে এ রকম একটি বাক্যও বলছেন না, যা দ্বারা একথা স্পষ্ট হবে যে, আসল হাওয়ারীগণ তার সমর্থক। উল্টো তিনি দাবি করে বসেছেন যে, খ্রিস্টধর্মের তালীমের জন্য হাওয়ারীদের কাছ থেকে শিক্ষা বা সাহায্য গ্রহণের কোন প্রয়োজন আমার নেই। বরং এ শিক্ষা আমাকে সরাসরি ওহীর মাধ্যমেই দেওয়া হয়। তিনি লেখেন,

ভাইয়েরা! আমি তোমাদের জানাচ্ছি, আমি যে সুসংবাদ তাবলীগ করেছি, তা কোন মানুষের বানানো কথা নয়। আমি কোন লোকের কাছ থেকে তা পাইনি বা

১. এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ৯ খণ্ড, ৯৭০ পৃষ্ঠা, নিবন্ধ Galatians Epistle to the.

কেউ আমাকে তা শেখায়নি; বরং ঈসা মাসীহ নিজেই আমার কাছে তা প্রকাশ করেছিলেন (গালাতীয় ১ : ১১, ১২)।

বরং আরও সামনে গিয়ে তিনি পিতরকে প্রকাশ্যেই 'নিন্দাযোগ্য' এবং বার্ণাবাসকে ভণ্ডামির শিকার সাব্যস্ত করেছেন (২ : ১১–১৩)। সেই সঙ্গে সর্বশক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, তার কাছে সরাসরি ওহী আসে।

এর দ্বারা পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায়, যে পর্যায়ে তিনি গালাতীয়দের কাছে চিঠি লিখছিলেন, তখন হাওয়ারীগণ আর তার মতের সমর্থক থাকেননি। অন্যথায় প্রথম যাত্রাতেই তিনি 'হাওয়ারীগণ আমাকে সমর্থন করেন' –এই বলে সব আলোচনা-সমালোচনার অবসান ঘটাতে পারতেন।

প্রশ্ন হতে পারে, শেষ যুগের খ্রিস্টান আলেমদের মতে পৌল গালাতীয়দের নামে লেখা চিঠিটি জেরুজালেম-সম্মেলনের আগে লিখেছিলেন।[১] আর যেহেতু এ সম্মেলনের আগে হাওয়ারীদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার হয়নি, তাই পৌল চিঠিতে তাদের বরাত দান করেননি।

কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে এ ধারণা ঠিক নয় যে, গালাতীয়দের কাছে পাঠানো চিঠিটি জেরুজালেম সম্মেলনের আগে লেখা হয়েছিল। কেননা এ চিঠিতে পৌল লিখেছেন,

পিতর যখন এন্টিয়কে আসলেন, তখন তার মুখের উপরেই আমি আপত্তি জানালাম। কারণ তিনি অন্যায় করেছিলেন (বা নিন্দার উপযুক্ত ছিলেন)। (২ : ১১)

এতে পৌল এন্টিয়কে পিতরের আগমনের কথা উল্লেখ করেছেন। আর এ ঘটনা অবশ্যই জেরুজালেম-সম্মেলনের পরের, যেমন এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় আছে,

গালাতীয়তে (২ : ১১) পৌল এ সত্য স্পষ্ট করেছেন যে, জেরুজালেম-কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও অ-ইহুদীদের ব্যাপারে পিতর নিজ দোদুল্যমানতা প্রকাশ করেছেন।[২]

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এ ঘটনা জেরুজালেম-কাউন্সিলের পরেই ঘটেছিল। তাছাড়া পৌলের অধিকাংশ জীবনীকারও এটিকে জেরুজালেম-কাউন্সিলের পরের

---

১. হামারী কুতুবে মুকাদ্দাসা, পৃষ্ঠা ৩৭৩

২. ব্রিটানিকা ১৭ খণ্ড ৬৪২ পৃষ্ঠা নিবন্ধ পিতর (Peter)। প্রকাশ থাকে যে, ব্রিটানিকার নিবন্ধকার সামনে এগিয়ে এ দৃষ্টিভঙ্গি রদ করেছেন যে, গালাতীয়দের কাছে পাঠানো চিঠিটি জেরুজালেম-সম্মেলনের আগে লেখা হয়েছিল।

ঘটনা হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। লুই দেনক ও জে. পিটারসন স্মিথ এভাবেই ঘটনাগুলি বর্ণনা করেছেন।[১] এ বক্তব্যটির ধরণ-ধারণও স্পষ্ট জানান দিচ্ছে, এ ঘটনা জেরুজালেম-কাউন্সিলের পরে ঘটেছিল। কেননা পৌল পিতরকে নিন্দাযোগ্য বা অন্যায়কারী তখনই সাব্যস্ত করতে পারেন, যখন তিনি আগে তার বর্তমান কর্মপন্থার বিপরীত কিছু রায় দিয়ে থাকবেন। পিতর পূর্বে যদি অ-ইহুদীদের জন্য তাওরাতের বিধান 'অবশ্যপালনীয় না হওয়ার' মত প্রকাশ না করে থাকেন, তবে পৌল এত সহজে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন কিভাবে? কাজেই তাঁর এ বক্তব্যর পরিষ্কার অর্থ এটাই যে, জেরুজালেম-কাউন্সিলে পিতর পৌলের মত সমর্থন করেছিলেন। এখন যেহেতু তিনি সে মতের বিপরীত করছেন, তাই তাকে অন্যায়কারী বা নিন্দাযোগ্য সাব্যস্ত করছেন। সুতরাং এটা সুনিশ্চিত যে, জেরুজালেম-কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল এন্টিয়কে পিতরের আগমনের আগে। আর যেহেতু গালাতীয়দের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিতে পিতরের এন্টিয়কে আসার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেহেতু এটাও প্রমাণ হয়ে যায় যে, এ চিঠিও জেরুজালেম-কাউন্সিলের পরেই লেখা হয়েছে।

সুতরাং আমাদের দৃষ্টিতে খ্রিস্টধর্মের প্রাচীন পণ্ডিতদের মতই সঠিক, যা জি. টি ম্যানলি নিম্নরূপ বর্ণনা করেন,

পূর্বে ধারণা করা হত, পৌল তার সুসংবাদ প্রচারের তৃতীয় সফরকালে এই এলাকার (অথাৎ গালাতীয়ার) চার্চসমূহে এ চিঠিটি রোমীয়দের কাছে লেখা চিঠির কাছাকাছি সময়েই লিখেছিলেন। আর এটা প্রেরিত ১৫-এর মজলিসের পরের ঘটনা হয়ে থাকবে।[২]

ফলাফল

উপরিউক্ত আলোচনা যেসব বিষয় প্রমাণিত হয় তা নিম্নরূপ,

১. শুরুতে বার্ণাবাস ও অন্যান্য হাওয়ারীগণ মনে করেছিলেন পৌল সাচ্চা মনেই খ্রিস্টধর্মের অনুসরণ করেছেন এবং সে হিসেবেই তারা তাকে আনুকূল্য দিয়েছিলেন।

২. আর এ কারণেই বার্ণাবাস দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে থেকেছিলেন।

---

১. Paul His Life and Work by Walter Von Loewenich, trans by Gorden E Harris, London 1960 P. 72; হায়াত ওয়া খুতূতে পৌল, পৃষ্ঠা ৮৮ লাহোর ১৯৫২ খ্রি.

২. হামারী কুতুবে মুকাদ্দাসা, পৃষ্ঠা ৩৭৩

৩. অতঃপর বার্ণাবাস যে তার সঙ্গ ত্যাগ করলেন, সেটা চিন্তা-চেতনাগত পার্থক্যের কারণে।

৪. হাওয়ারীগণ জেরুজালেম-কাউন্সিলে অ-ইহুদীদের জন্য খতনাসহ তাওরাতের বিধানসমূহ চূড়ান্তরূপে রহিত করেননি। বরং এগুলো পালন ছাড়াও তাদেরকে খ্রিস্টধর্মে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলেন মাত্র। সেক্ষেত্রে এটা হত পূর্ণাঙ্গ খ্রিস্টজীবনে প্রবেশের প্রথম কদম।

৫. কিন্তু পৌল প্রচার করতে শুরু করলেন, তাওরাতের সমস্ত বিধান রহিত হয়ে গেছে এবং সে বিধান আমাদের জন্য এক অভিশাপ ছিল, যা থেকে আমাদেরকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে (গালাতীয় ৩ : ১৩)। তোমরা যদি খতনা করাও, তাতে মাসীহের দ্বারা তোমাদের কিছুমাত্র উপকার লাভ হবে না (গালাতীয় ১৫ : ১)। এ কারণে পিতর ও ইউহোন্না এন্টিয়কে তার বিরোধিতা করেন (গালাতীয় ২ : ১১)।

৬. হাওয়ারীদের এ বিরোধিতার ফলে পৌলের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অসন্তোষ দেখা দেয়। তিনি হাওয়ারীদের বিরুদ্ধাচরণ করছেন বলে লোকজন তার প্রতি ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে। এরই জবাবে পৌল গালাতীয়দের নামে চিঠি লেখেন।

৭. এ চিঠিতে তিনি হাওয়ারীদেরকে নিজের সমর্থকরূপে তুলে ধরার পরিবর্তে তাদের বিরুদ্ধাচরণের কথা উল্লেখ করেন এবং সর্বশক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, খ্রিস্টধর্মের শিক্ষা গ্রহণের জন্য হাওয়ারীদের থেকে শিক্ষা গ্রহণের কোন প্রয়োজন তাঁর নেই। কেননা সরাসরি ওহীর মাধ্যমেই তাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে (গালাতীয় ১ : ১১–১২)।

৮. এ চিঠি লেখা হয়েছিল জেরুজালেম-কাউন্সিলের পর, যা দ্বারা প্রমাণ হয়, জেরুজালেম-সম্মেলনে হাওয়ারীগণ পৌলের যে সমর্থন করেছিলেন পরে তা অব্যাহত থাকেনি। বরং তারা তার বিরোধী হয়ে গিয়েছিলেন। এ কারণেই পৌল বিরুদ্ধবাদীদের জবাবে হাওয়ারীদের সমর্থনের কথা উল্লেখ করেননি।

৯. পৌলের সমস্ত পত্র এ ঘটনার পর লিখিত, (কেননা জি. টি. ম্যানলির ভাষ্যমতে গালাতীয়দের কাছে লেখা চিঠিই পৌলের সর্বপ্রথম চিঠি)। কাজেই ত্রিত্ববাদ, অবতারত্ব (হযরত মাসীহের দেহে ঈশ্বরের আবির্ভাব), প্রায়শ্চিত্ত, তাওরাতের রহিত হওয়া প্রভৃতি যেসব আকীদা-বিশ্বাস-পৌলের পত্রসমূহে বর্ণিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে পৌলের ব্যক্তিগত চিন্তাধারা। এসব হাওয়ারীদের দ্বারা সমর্থিত নয়।

বিচ্ছিন্নতার পর

আসুন এবার অনুসন্ধান করি, পৌলের সঙ্গে মতভেদজনিত বিচ্ছিন্নতার পর বার্ণাবাস কোথায় গেলেন? প্রেরিত পুস্তক দ্বারা তো কেবল এতটুকুই জানা যায় যে, তিনি পৌলের সঙ্গ ত্যাগ করার পর ইউহোন্না মার্ককে সঙ্গে নিয়ে কুব্রুস চলে গিয়েছিলেন। প্রেরিত পুস্তক এ ছাড়া তার সম্পর্কে আর কোন তথ্য সরবরাহ করে না। খ্রিস্টানদের ইতিহাসগ্রন্থসমূহও বার্ণাবাসের পরবর্তী জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার নিবন্ধকার লেখেন,

বার্ণাবাস মার্ককে নিয়ে জাহাজযোগে কুব্রুস চলে যান, যাতে সেখানে নিজের কাজ চালু রাখতে পারেন। অতঃপর ইতিহাস তার সম্পর্কে একেবারেই ধুম্রাচ্ছন্ন।[১]

প্রশ্ন হচ্ছে, চার্চের প্রাথমিক যুগে যে বার্ণাবাস ছিলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, যিনি তার গোটা জীবন দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে ব্যয় করেছিলেন, পৌলের সঙ্গে মতভেদ ঘটার পর তিনি কি এতটুকুরও উপযুক্ত থাকলেন না যে, পৌলের (লূক প্রমূখ) শিষ্যগণ কয়েক ছত্রে হলেও তার বৃত্তান্ত উল্লেখ করে দেবেন?

এর দ্বারা আমরা এ ছাড়া আর কী বুঝতে পারি যে, বার্ণাবাস পৌলের আসল চেহারা চিনে ফেলেছিলেন। ফলে এর পর পৌল খ্রিস্টধর্মের যে বিকৃতি সাধন করেছেন, সে সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করার কাজেই তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করে থাকবেন? বলাবাহুল্য তার সে কর্ম প্রচেষ্টা এমন ছিল না, যা পৌলের কোন শিষ্য বর্ণনা করতে আগ্রহ দেখাবেন।

বার্ণাবাসের ইনজীল

এই যে যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হলাম, এটা একটা বাস্তবতা। এর প্রমাণ মেলে বার্ণাবাসের ইনজীল দ্বারা, যা ষোড়শ শতাব্দীতে পোপ 'পঞ্চম স্কট্স'-এর গুপ্ত গ্রন্থাগার থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এর প্রথম পৃষ্ঠাতেই আছে,

মহান ও কুদরতময় আল্লাহ এই শেষ যমানায় নিজ নবী ইয়াসূ মাসীহের মাধ্যমে আমাদেরকে এক মহা রহমত দ্বারা পরীক্ষা করেছেন– সেই শিক্ষা ও নিদর্শনসমূহ দান করে, যাকে শয়তান বহু লোককে গোমরাহ করার মাধ্যম বানিয়েছে। যারা ধার্মিকতার নামে মারাত্মক কুফরের প্রচার করছে, মাসীহকে আল্লাহর পুত্র বলছে, খতনা অস্বীকার করছে– যা আল্লাহর একটি স্থায়ী বিধান,

১. ব্রিটানিকা ৩য় খণ্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা, নিবন্ধ 'বার্ণাবাস'।

আর অপবিত্র মাংসাহারকে জায়েয বলছে, আমি অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে উল্লেখ করছি যে, তাদেরই কাতারে পৌলও গোমরাহ হয়ে গেছে। আর তারই কারণে আমাকে এই সত্যবাণী লিখতে হচ্ছে, যা আমি ইয়াসূ'র সঙ্গে থেকে শুনেছি ও দেখেছি, যাতে তোমরা নাজাত পাও এবং শয়তান তোমাদেরকে গোমরাহ করতে না পারে এবং আল্লাহর ব্যাপারে তোমরা ধ্বংস না হও। সাবধান, প্রত্যেক এমন লোক থেকে বেঁচে থাক, যে তোমাদের কাছে কোন নতুন শিক্ষা প্রচার করে, যা আমার এ লেখার বিপরীত। তাহলে তোমরা স্থায়ী মুক্তি লাভ করতে পারবে' (বার্ণাবাস ১ : ২-৯)।

এটাই বার্ণাবাসের সেই ইনজীল, যাকে দীর্ঘকাল যাবৎ গুপ্ত রাখার ও লুপ্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং যে সম্পর্কে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে (অর্থাৎ মহানবী সা.-এর শুভাগমনের আগের শতকে) পোপ ১ম জিলাশিউস ফরমান জারি করে দিয়েছিল, 'এটা যে ব্যক্তি পাঠ করবে, সে অপরাধী গণ্য হবে'।[১] আর এখন তো বলা হচ্ছে, এটা কোন মুসলিমের রচিত।[২]

এরপরও কি এ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে যে, প্রচলিত খ্রিস্টধর্ম পুরোটাই পৌলের নিজের প্রবর্তিত ধর্ম এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কিংবা তাঁর হাওয়ারীদের শিক্ষার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই?

পৌল ও পিতর

বার্ণাবাসের সাথে পৌলের সম্পর্ক কেমন ছিল, তা জানার পর আসুন এবার আমরা অনুসন্ধান করে দেখি পিতরের সঙ্গে পৌলের সম্পর্ক কেমন ছিল এবং পিতর কি পৌলের চিন্তাধারার সমর্থক ছিলেন, না বিরোধী? খ্রিস্টধর্মে পিতরের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশি। ক্যাথলিক চার্চ সর্বদা তাকে তাদের প্রধান নেতা স্বীকার করে আসছে। হাওয়ারীদের মধ্যে তাকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে।

প্রেরিত পুস্তক মূলত হাওয়ারীগণের কর্মতৎপরতারই বিস্তারিত বিবরণী। এর ১৫ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত পিতরের প্রায় সমস্ত কর্মতৎপরতার উপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত পিতর ও পৌলকে একই মত পোষণকারীরূপে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পরম আশ্চর্যের বিষয় হল, যে গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যই হাওয়ারীদের

---

১. দেখুন এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা, ৩য় খণ্ড, ২৬২ পৃষ্ঠা নিবন্ধ বার্ণাবাস; চেম্বার্স এনসাইক্লোপিডিয়া, ৬ খণ্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা, নিবন্ধ জিলাশিউস; 'বার্ণাবাসের ইনজীল'-এর ভূমিকা, কৃত ড. খলীল সাআদাত মিসরী মাসীহী।

২. এ রচনার শেষে আমরা বার্ণাবাসের ইনজীল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা সম্বলিত একটি নিবন্ধ জুড়ে দিয়েছি। এ ইনজীলের মৌলিকত্ব জানার জন্য তা অবশ্যই পড়ুন।

কার্যাবলী বিবৃত করা, এই পনেরতম পরিচ্ছেদের পর তা হঠাৎ করেই নীরব হয়ে যায়। এরপর থেকে গ্রন্থের শেষ (২৮নং) পরিচ্ছেদ পর্যন্ত আর কোথাও পিতরের নাম পর্যন্ত চোখে পড়ে না। ম্যাককিনন লেখেন,

জেরুজালেম সম্মেলনের পর প্রেরিত পুস্তকের ঘটনাবলীতে পিতরের কোন উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না।[১]

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে,

প্রেরিত পুস্তকে পিতরের সর্বশেষ উপস্থিতি দেখা যায় জেরুজালেম-কনফারেন্সে, যেখানে অ-ইহুদীদের ব্যাপারে তিনি খুবই উদারনীতি অবলম্বন করেছিলেন।[২]

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, পিতরের মত ব্যক্তিত্ব, যিনি কিনা 'শ্রেষ্ঠতম হাওয়ারী' উপাধিতে ভূষিত এবং প্রেরিত পুস্তকের ১৫ তম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রতিটি পৃষ্ঠাতেই যার সরব উপস্থিতি বিদ্যমান, হঠাৎ করেই তিনি এতটা গুরুত্বহীন হয়ে গেলেন কেন যে, পরে কোথাও তার নামটি পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে না?

এ প্রশ্নের উত্তরও গালাতীয়দের কাছে প্রেরিত পৌলের চিঠিটির সেই ভাষ্যতেই পাওয়া যায়, যা পেছনে একাধিকবার উদ্ধৃত হয়েছে। বলা হয়েছে,

পিতর যখন এন্টিয়ক শহরে আসলেন, তখন তার মুখের উপরেই আমি আপত্তি জানালাম, কারণ তিনি অন্যায় করেছিলেন (বা তিনি নিন্দার উপযুক্ত ছিলেন)।

(গালাতীয় ২ : ১১)

পূর্বেই বলা হয়েছে, এটি জেরুজালেম কাউন্সিলের অব্যবহিত পরের ঘটনা। এর দ্বারা কি স্পষ্ট বোঝা যায় না যে, জেরুজালেম-কাউন্সিল পর্যন্ত পিতর যেহেতু পৌলের কোন রকম বিরুদ্ধাচরণ করেননি, তাই পৌলের শিষ্য লূক তার রচিত প্রেরিত পুস্তকে এ সময় পর্যন্ত তার কার্যাবলী বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এ কাউন্সিলের পর পিতর যখন এন্টিয়কে গেলেন এবং সেখানে পৌলের মনগড়া চিন্তাধারার কারণে তার সঙ্গে মতভেদ দেখা দিল, তখন লূক তার সম্পর্কে কিছু লেখা বন্ধ করে দিলেন।

উপরিউক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের আলোকে এই ধারণা পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে যে, এন্টিয়কে পৌলের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দেওয়ার পর বার্ণাবাসের মত পিতরও তার সঙ্গ পরিত্যাগ করেছিলেন এবং তিনিও প্রকৃত খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পৌলের থেকে স্বতন্ত্র কোন দল গঠন করেছিলেন, পৌলের আরেকটি পত্রে এর সমর্থন মেলে। করিন্থীয়দের কাছে পাঠানো চিঠিতে তিনি লেখেন,

---

১. From Christ to Constamtime P. 116
২. এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ১৭ খণ্ড, ৬৪২ পৃষ্ঠা, নিবন্ধ 'পিতর'।

আমার ভাইয়েরা! তোমাদের সম্বন্ধে ক্লোয়ীর বাড়ির লোকদের কাছে এই খবর পেলাম যে, তোমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ রয়েছে। আমি এই কথা বলতে চাইছি যে, তোমাদের মধ্যে কেউ বলে, আমি পৌলের দলের, কেউ বলে, আমি আপল্লোর দলের, কেউ বলে, আমি পিতরের দলের, আবার কেউ বলে আমি মসীহের দলের (করিন্থীয় ১ : ১১–১২)।

এর দ্বারা পরিষ্কার জানা যায়, পিতর তখন আলাদা দল গঠন করেছিলেন, যা পৌলের দল থেকে ভিন্ন এবং উভয় দলের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ চলছিল। এনসাইক্লোপিডিয়ার নিবন্ধকারও চিঠিটির উপরিউক্ত বক্তব্য দ্বারা একই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। তিনি লেখেন,

১–করিন্থীয় ১ : ১২-এর ভাষ্য দ্বারা বোঝা যায়, করিন্থিসে পিতরের একটি দল গড়ে উঠেছিল।[১]

জেরুজালেম কাউন্সিলের পর পিতর সম্পর্কে ব্যস এতটুকু কথাই পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য, এর আলোকে অনুমান করা কঠিন নয় যে, পৌল যে রদবদল ও বিকৃতি সাধন করছিল তা থেকে প্রকৃত খ্রিস্টধর্মকে রক্ষা করার জন্য পিতর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আফসোস, আমাদের কাছে খ্রিস্টধর্মের সে কালীন ইতিহাস সম্পর্কিত যে তথ্য-উপাত্ত আছে, তা সবই পৌলের ভক্তবৃন্দের লেখা। সঙ্গত কারণেই তা দ্বারা পিতর অতঃপর কোথায় গেলেন এবং তিনি কী কার্যক্রম চালিয়েছিলেন সে সম্পর্কে কোন আলো পাওয়া যায় না।

কেউ বলেন, তিনি এশিয়া মাইনরেরই বিভিন্ন এলাকায় থেকেছেন এবং বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন বাবালয়ূন অঞ্চলে। আইরিনিউস, ক্লিমেন্ট, এস্কান্দারী, টেরটুলিয়ান প্রমূখের মতে তিনি রোমে অবস্থান করছিলেন। আর অরিজেন, ইউসিফুস ও জেরোমের ধারণা তিনি এন্টিয়কেই থেকে গিয়েছিলেন। তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। টেরটুলিয়ানের মতে সম্রাট নিরু তাকে শহীদ করে দিয়েছিলেন। অরিজেন বলেন, তাকে উল্টোমুখে ঝুলিয়ে শূলে দেওয়া হয়েছিল (ব্রিটানিকা ১৭ খণ্ড, ৬৪২–৬৪৩ পৃষ্ঠা, নিবন্ধ 'পিতর')।

পিতরের পত্রাবলী

এস্থলে প্রশ্ন হতে পারে, বাইবেলের নিউটেষ্টামেন্টে পিতরের যে দু'টি পত্র আছে, তাতে দেখা যায় পিতর এমন দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছেন, যা পৌলের দৃষ্টিভঙ্গিরই অনুরূপ; বরং দ্বিতীয় পত্রে তো এ পর্যন্ত লিখেছেন যে,

---

১. ব্রিটানিকা, ১৭ খণ্ড, ৬৪২ পৃষ্ঠা, নিবন্ধ 'পিতর'।

'এই একই কথা আমাদের প্রিয় ভাই পৌলও আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানে তোমাদের কাছে লিখেছেন' (২- পিতর ৩ : ১৫)।

এটা কি নির্দেশ করে না যে, পৌল ও পিতরের চিন্তাধারা একই ছিল এবং তাদের মেধ্য কোন মতভেদ ছিল না?

এর উত্তর হল, এ পত্র দু'টি সম্পর্কে খোদ খ্রিস্টান গবেষকগণ মত প্রকাশ করেছেন যে, এ দু'টিকে হাওয়ারী পিতরের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা ঠিক নয়, বরং হয় এ দু'টির লেখক পিতর নামক অন্য কোন ব্যক্তির অথবা কেউ নিজের পক্ষ থেকে লিখে হাওয়ারী পিতরের নামে চালু করে দিয়েছে। প্রথম পত্রটি সম্পর্কে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার নিবন্ধকার লেখেন,

বহু সমালোচক প্রমাণ করেছেন, এ পত্রের বিষয়বস্তু এমন সব ঘটনা সম্বলিত, যা পিতরের মৃত্যুর পরে ঘটেছিল, যেমন পত্রের ১ : ৬; ২ : ১২; ৪ : ১২-১৯ ও ৫ : ৯-এ খ্রিস্টানদের উপর আপতিত বিভিন্ন বিপদাপদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, সে সময় খ্রিস্টান জাতি কঠিন ও ভয়াবহ পরীক্ষার ভেতর দিয়ে দিন পার করছিল। তাদেরকে নানা রকম নিন্দা ও দুর্নাম কুড়াতে হচ্ছিল ...। এসব পরিস্থিতি ট্রজনের কাছে লেখা পত্রে বেল্লিনি (Bellini) যেমনটা উল্লেখ করেছেন হুবহু তার মতই। সুতরাং এ প্রমাণের আলোকে বলা হয়েছে এ চিঠি সেই কালের সাথেই সম্পৃক্ত এবং এটা পিতরের মৃত্যুর বহুকাল পরে লেখা।

অতঃপর ব্রিটানিকার নিবন্ধকার এ পত্রটি পিতরের না হওয়ার সপক্ষে আরও দলিল-প্রমাণ পেশ করেছেন।[১]

আর দ্বিতীয় পত্রটির বৃত্তান্ত তো প্রথমটি অপেক্ষাও যাচ্ছেতাই। এর অবস্থা তুলে ধরতে গিয়ে ব্রিটানিকার নিবন্ধকার লেখেন,

যেভাবে পিতরের প্রথম চিঠিখানিকে ক্যাথলিক পত্রাবলীতে বাইবেলের তালিকায় সর্বপ্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে, তেমনি এ দ্বিতীয় পত্রখানিকে স্থান দেওয়া হয়েছে সবশেষে। আলেকজান্দ্রিয়ায় এটিকে তৃতীয় শতাব্দীতে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। সেখান থেকেই এটি কনস্টান্টিনোপলের চার্চ কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু রোমে চতুর্থ শতাব্দীর আগে এটি স্বীকৃতি পায়নি। আর সিরিয়ার চার্চ তো এটিকে মেনে নিয়েছে অনেক পরে ষষ্ঠ শতাব্দীতে।

এ পত্রের মৌলিকত্ব সম্পর্কে আপত্তি অনেকগুলি। সম্মিলিতভাবে সেসব আপত্তির ওজন অনেক, যে কারণে 'এটি যে পিতরের লেখা' -এ দাবিকে সাধারণভাবে ভ্রান্ত মনে করা হয়েছে। আপত্তিগুলো নিম্নরূপ-

১. ব্রিটানিকা ১৭ খণ্ড, ৬৪৬ পৃষ্ঠা, নিবন্ধ Peter, First Epistle to the.

১. সর্বপ্রথম যিনি এটাকে পিতরের লেখা বলে প্রচার করেছেন, তিনি হলেন অরিজেন (Origen), অথচ তিনি নিজেই এর মৌলিকত্ব সম্পর্কে বিতর্ক থাকার কথা স্বীকার করেছেন।

২. এর ভাষা, বর্ণনাশৈলি ও দৃষ্টিভঙ্গি পিতরের প্রথম চিঠির সাথে তো মেলেই না, গোটা নিউটেষ্টামেন্ট থেকেও সম্পূর্ণ আলাদা।

৩. 'চরিত্রহীনতা' ও 'মিথ্যা শিক্ষা'-এর যে অবস্থা এতে তুলে ধরা হয়েছে, স্পষ্টই বোঝা যায় তা পিতর উত্তর কালের সাথে সম্পৃক্ত।

৪. এহুদার অংশীদারিত্ব এর মৌলিকত্বকে আরও বেশি সন্দেহযুক্ত করে তুলেছে।

৫. চিঠির ৩ : ১৬ পদে পৌলের পত্রাবলীকে ঐশীবাণী রূপে স্বীকার্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর দ্বারাও প্রতীয়মান হয় এটি দ্বিতীয় শতাব্দীর আগের লেখা নয়। অসম্ভব নয় এটি মিসরে লেখা হয়েছে এবং সর্বপ্রথমে সেখানেই এটা লোকসম্মুখে প্রকাশ পেয়েছে। অথবা ডিসম্যানের ধারণা মোতাবেক এটা এশিয়া মাইনরেও লেখা হতে পারে।[১]

ব্রিটানিকার এ উদ্ধৃতি দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, খ্রিস্টান গবেষক ও বিজ্ঞজনরাই এ পত্রটিকে পিতরের লেখা বলে মানতে রাজি নন। সুতরাং এসব পত্রের ভিত্তিতে একথা বলা চলে না যে, পিতর চিন্তা-চেতনায় পৌলের সমর্থক ছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে চিন্তাগত কোন বিরোধ ছিল না।

ইয়াকুব ও পৌল

হযরত মাসীহ (আ.)-এর সময়ে ইয়াকুব নামের লোক ছিলেন তিনজন।

ক. আলফেয়ের ছেলে ইয়াকুব। তাকে ছোট ইয়াকুবও বলা হয়। তার উল্লেখ পাওয়া যায় কেবল শিষ্যদের তালিকায় (মথি ১০ : ৪) অথবা সেইসব নারীদের সঙ্গে যারা ক্রুশের নিকট সমবেত হয়েছিল। সেখানে তার কেবল নামই বর্ণিত হয়েছে (মার্ক ১৫ : ৪)। এছাড়া নিউটেষ্ট্যামেন্টের আর কোথাও তার সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি।

খ. সবদিয়ের পুত্র ইয়াকুব। ইনি ছিলেন হাওয়ারী ইউহোন্নার ভাই (মথি ১০ : ২)। হযরত মাসীহ (আ.)-এর আসমানে গমনের কিছুকাল পরই রাজা হিরোদ

১. এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ১৭ খণ্ড, ৬৪৭ পৃষ্ঠা, নিবন্ধ Peter, Second Epistle of। জেমস ম্যাককিননও এসব পত্রকে সন্দেহযুক্ত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

তাকে তরবারী দ্বারা শহীদ করে দিয়েছিল (প্রেরিত ১২ : ২)। কাজেই পৌলের সঙ্গে জীবনে তার বিশেষ যোগাযোগ হয়ে ওঠেনি এবং জেরুজালেম-সম্মেলনের আগেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন।

গ. ছুতার মিস্ত্রী ইউসুফের পুত্র ইয়াকুব, ইনজীলে যাকে হযরত মাসীহ (আ.)-এর ভাই বলা হয়েছে (মথি ১৩ : ৫৫)। ইনজীলসমূহের বর্ণনা দ্বারাই জানা যায়, ইনি হযরত মাসীহ (আ.)-এর জীবদ্দশায় তাঁর প্রতি ঈমান আনেননি (দেখুন মার্ক ৩ : ২১; ইউহোন্না ৭ : ৫)। অথবা বড়জোর শেষ মুহূর্তে ঈমান এনেছিলেন কিংবা সেই সময়, যখন হযরত মাসীহ (আ.) পুনর্জীবিত হওয়ার পর তাদেরকে দেখা দিয়েছিলেন, যেমনটা পৌল বলে থাকেন (১– করিন্থীয় ১৫ : ৭)। প্রেরিত পুস্তকের বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা বোঝা যায়, তাকে জেরুজালেম-চার্চের প্রধান নিযুক্ত করা হয়েছিল। আর এ কারণেই জেরুজালেম-সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন (প্রেরিত ১৫ : ১৯)। যদিও জেরুজালেম-সম্মেলনে তিনিই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন যে, অ-ইহুদীদের খ্রিস্টধর্মে প্রবেশের জন্য তাওরাতের খতনা ইত্যাদি বিধান পালন জরুরি হবে না, কিন্তু প্রায় সমস্ত খ্রিস্টান-পণ্ডিত এ ব্যাপারে একমত যে, তাঁর এ সিদ্ধান্ত ছিল সাময়িক কালের জন্য। বস্তুত তিনি তাওরাতের বিধানাবলী অবশ্যপালনীয় হওয়ার একজন কঠোর প্রবক্তা। মিষ্টার ম্যাককিনন জেরুজালেম-কাউন্সিলের বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে যেয়ে লেখেন,

মৌলবাদী গ্রুপ যদিও তখন এই উদারনৈতিক কৌশল সমর্থন করেছিল, কিন্তু তারা এতে সন্তুষ্ট ছিল না। এমনকি ইয়াকুব খতনার দাবি থেকে সরে আসলেও ইহুদী-খ্রিস্টান ও অইহুদী-খ্রিস্টানদের অবাধ মেলামেশার ব্যাপারে বিধিনিষেধ বহাল রাখার পক্ষে ছিলেন। তার এ অবস্থানের প্রভাব এত বেশি ছিল যে, পিতর, এমনকি বার্ণাবাসকে পর্যন্ত অ-ইহুদীদের সাথে পানাহার করা হতে নিবৃত্ত থাকতে হয়।[১]

ম্যাককিনন অন্যত্র ইয়াকুব সম্পর্কে লেখেন,

ইউসিফুসের সংক্ষিপ্ত নোট ও হেজেসিসের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা এ বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইয়াকুবের শক্ত ও অনড় ভূমিকা এবং তাওরাতের বিধিনিষেধ ইহুদীদের মন জয় করে নিয়েছিল।[২]

মজার ব্যাপার হল, জেরুজালেম কাউন্সিলের পর প্রেরিত পুস্তকে ইয়াকুবের কথা মাত্র এক জায়গাতেই এসেছে এবং তারও বিষয়বস্তু এই যে, তাওরাতের

---

১. From Christ to Constamtime P. 95
২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১৯।

বিরুদ্ধাচরণের কারণে ইয়াকুব পৌলকে প্রায়শ্চিত্ত করতে আদেশ করছেন এবং তাকে পুরোপুরিভাবে তাওরাতের অনুসরণ করতে বলছেন (প্রেরিত ২১ : ১৭–২৬)।

এর দ্বারা অন্ততপক্ষে এতটুকু বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, পৌল পরবর্তীকালে যেসব চিন্তাধারা অবলম্বন ও প্রচার করছিলেন ইয়াকুব তার সাথে একমত ছিলেন না। বাকি থাকল ইয়াকুবের নামে প্রচলিত পত্রের ব্যাপারটি। তো এ সম্পর্কে জেমস ম্যাককিনন বলেন,

এ চিঠির লেখক যে ইয়াকুব, দলিল-প্রমাণ তা সমর্থন করেন না।[১]

ইউহোন্না ও পৌল

হাওয়ারীদের মধ্যে পিতর ও বার্ণাবাসের পর সর্বদিয়ের পুত্র ইউহোন্নাই ছিলেন সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান। ম্যাককিননের ভাষ্যমতে তাকে চার্চের তিন স্তম্ভের অন্যতম মনে করা হত। কৌতুহলের বিষয় হল, পিতর ও বার্ণাবাসের মত ইউহোন্নাও জেরুজালেম-সম্মেলনের পর প্রেরিত পুস্তক থেকে হঠাৎ করেই গায়েব হয়ে গেছেন। এরপর আর তার কোন বৃত্তান্ত জানা যায় না। জেমস ম্যাককিনন লেখেন,

পিতরের মত ইউহোন্নাও জেরুজালেম-কনফারেন্সের পর প্রেরিত পুস্তকের বিবরণ থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেছেন। অথচ তিনি ছিলেন এ সম্মেলনের তিন স্তম্ভের একটি। তিনি জেরুজালেমকে বিদায় জানিয়ে কোথায় প্রচারকার্য চালিয়েছেন, তা আমরা জানতে পারি না।[২]

এর দ্বারাও সুস্পষ্টভাবেই এ অনুমান প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, জেরুজালেম কাউন্সিলের পর পিতর বা বার্ণাবাস যখন পৌলের প্রতি নারাজ হয়ে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন, সে সময়ই ইউহোন্নাও তার সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যান। খুব সম্ভব তিনিও আসল খ্রিস্টধর্মের প্রচারকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। আর এ কারণেই পৌলের শিষ্যগণ জেরুজালেম-কাউন্সিলের পর তাকে আলোচনায় রাখার উপযুক্ত মনে করেনি।

বাকি থাকল ইউহোন্নার ইনজীল ও তার নামে প্রচলিত সেই পত্রাবলীর ব্যাপার, যা নিউটেষ্ট্যামেন্টে স্থান পেয়েছে। তো এ সম্পর্কে পূর্বে আমরা বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা করেছি এবং তাতে প্রমাণ হয়েছে যে, এর রচয়িতা

---

১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২০
২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১৮

হাওয়ারী ইউহোন্না নন, বরং বৃদ্ধ ইউহোন্না, যেমন অধিকাংশ আধুনিক খ্রিস্টান পণ্ডিত এ ব্যাপারে একমত।[১]

অন্যান্য হাওয়ারী

এ তো গেল সেই সকল হাওয়ারীর বৃত্তান্ত, যাদের কথা 'প্রেরিত পুস্তক' কিংবা নিউটেষ্ট্যামেন্টের অন্যান্য পুস্তকে কোনও না কোনওভাবে বর্ণিত হয়েছে। হযরত মাসীহ (আ.)-এর আরও যে সকল শিষ্য ছিলেন, তাদের বৃত্তান্ত তো আরও বেশি পর্দাবৃত। তাদের সম্পর্কে তো এতটুকুও প্রমাণিত নয় যে, পৌলের সঙ্গে তাদের সাক্ষাত হয়েছিল কি না। জেমস ম্যাককিনন লেখেন,

বার হাওয়ারীর মধ্যকার অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ইয়াসূ মাসীহের পর কী করেছিলেন, 'সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য পেশ করা সম্ভব নয়। গল (Gaule) থেকে ইণ্ডিয়া পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে তাদের এক-একজনের কর্মব্যস্ত থাকার কথা বিভিন্ন বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়ে থাকে। ইউসিবিস বলেন, থোমা পারস্য চলে গিয়েছিলেন। সেকালে উত্তর ইণ্ডিয়ার কিছু অংশও পারস্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে থোমা রচিত প্রেরিত-এর বর্ণনা হল, তিনি মিসর ও ভারত সাগরের পথে সোজা ইণ্ডিয়া চলে গিয়েছিলেন। এমনিভাবে বরথলময়ও ভারতে চলে গিয়েছিলেন (বরথলময়ের প্রেরিত)। আন্দ্রিয় গিয়েছিলেন কৃষ্ণ সাগরের উত্তরে অবস্থিত ককেশাস অঞ্চলে। থদ্দেয় (অর্থাৎ এহুদা থদ্দেয়) এডিস্সা (EDISSA)-এর বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন, যেখানকার রাজা ইয়াসূ মাসীহের সঙ্গে পত্র-যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি রাজার বহু প্রজাকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন।

সামনে গিয়ে ফিলিপ ও অন্যদের সম্পর্কেও এ ধরণের বর্ণনা উদ্ধৃত করার পর বিদগ্ধ গ্রন্থকার লেখেন,

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এসব বর্ণনা নির্জলা কল্পকাহিনী। এতটুকু সম্ভব যে, থোমা ও বরথলময় হয়ত হিন্দুস্থান গিয়েছিলেন, কিন্তু হিন্দুস্থানের বিশেষ কোন অঞ্চলকে তাদের কর্মক্ষেত্র সাব্যস্ত করাটা হবে সন্দেহপূর্ণ কাজ।[২]

ফলাফল

আমরা এতক্ষণ হযরত মাসীহ (আ.)-এর বার হাওয়ারী সম্পর্কে যে অনুসন্ধানমূলক আলোচনা করলাম, তা দ্বারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে–

১. এ পুস্তিকার 'ইউহোন্নার ইনজীলের স্বরূপ' শীর্ষক আলোচনাটি পড়ুন।

২ From Christ to Constamtime P. 121

ক. বার হাওয়ারীর মধ্যে দু'জন জেরুজালেম-কাউন্সিলের আগেই ইন্তেকাল করেছিলেন। তারা সবদিয়ের পুত্র ইয়াকুব (প্রেরিত ১২ : ২) ও এহুদা এস্কারিয়োত (প্রেরিত ১ : ১৮)।

খ. সাতজন হাওয়ারী এমন, যারা হযরত মাসীহ (আ.)-এর আসমানে চলে যাওয়ার পর কোথায় কি করেছিলেন, সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তারা হলেন আলফেয়ের পুত্র ইয়াকুব, থোমা, বরথলময়, এহুদা থদ্দেয়, অন্দ্রিয়, ফিলিপ ও মথি।

গ. বাকি তিন হাওয়ারীর মধ্যে পিতর ও বার্ণাবাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করেছি যে, তারা জেরুজালেম-কাউন্সিলের পর পৌলের সাথে দৃষ্টিভঙ্গিগত তীব্র বিরোধের ফলে তার থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন। এখন অবশিষ্ট থাকেন কেবল সবদিয়ের পুত্র ইউহোন্না। তার সম্পর্কে পূর্বে আমরা লিখে এসেছি যে, জেরুজালেম কাউন্সিলের পর পিতর ও বার্ণাবাসের মত তিনিও হঠাৎ করে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তার সম্পর্কে কোথাও কোন আলোচনা পাওয়া যায় না।

এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ফলে যে বিষয়টা আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়, তা এই যে, পৌল যতক্ষণ পর্যন্ত খ্রিস্টধর্মকে বিকৃত করার কোন পদক্ষেপ নেননি, হাওয়ারীগণ ততক্ষণ পর্যন্তই তাকে সমর্থন করেছেন। জেরুজালেম কাউন্সিলের পর যেই না তিনি তার নিজস্ব ধ্যান-ধারণার প্রচার শুরু করেছেন এবং গালাতীয়দের নামে লেখা চিঠিতে (যা কিনা পৌলের সর্বপ্রথম পত্র) সেই সব ধ্যান-ধারণায় অনড় থাকার ঘোষণা দিয়ে দেন, তখন হাওয়ারীগণ সচকিত হয়ে ওঠেন এবং তারা তার সঙ্গ ত্যাগ করেন।

এ কারণেই প্রেরিত পুস্তকে জেরুজালেম-কাউন্সিল পর্যন্ত পৌলকে তাদের সাথে যে দুধ-চিনির মত একাত্ম দেখানো হয়েছে, তা দৃষ্টে যদি কেউ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, হযরত মাসীহ (আ.)-এর শিষ্যগণ ত্রিত্ববাদ, অবতারত্ব ও প্রায়শ্চিত্তের আকীদায় পৌলের সমর্থক ছিলেন, তবে সেটা চরম ভুল হবে। প্রকৃতপক্ষে পৌলই এসব আকীদার উদ্ভাবক। এর সাথে হযরত মাসীহ (আ.) ও তাঁর শিষ্যগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও রকমেরই সম্পর্ক নেই।

পৌলের বিরোধীগণ

এ প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। তা এই যে, বাস্তবিকই যদি পৌল খ্রিস্টধর্মে জোড়াতালি দিয়ে একটি নতুন ধর্মের গোড়াপত্তন

করে থাকেন, যার অবকাঠামো হযরত মাসীহ (আ.)-এর শিক্ষামালা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, তবে এর কোন কার্যকর ও বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করা হল না কেন? এটা কেমন কথা যে, পৌলের ভ্রান্ত চিন্তাধারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ল আর প্রকৃত খ্রিস্টধর্ম সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেল?

ইতিহাসের পৃষ্ঠাসমূহে আমরা এর উত্তর খুঁজতে গেলে পরিষ্কার দেখতে পাই, খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসে প্রথম তিন শতকে পৌল ও তার চিন্তাধারা প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। সেকালে পৌল-বিরোধীদের সংখ্যা ও তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি পৌলের প্রভাব-প্রতিপত্তি অপেক্ষা কোনও অংশে কম ছিল না। কিন্তু ঘটনাক্রমে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে খ্রিস্টধর্ম যখন বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রধর্ম সাব্যস্ত হল, তখন পৌল-সমর্থকগণ রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হল। তখন তারা বিরুদ্ধবাদীদের উপর দমন-নিপীড়ন তো চালালই, যে সব তথ্য-উপাত্ত তাদের মতামত প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হতে পারত তাও সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলার চেষ্টা করল। এরই ফলশ্রুতিতে বিশ্বে পৌলের চিন্তাধারা ক্রমবিস্তার লাভ করতে থাকল এবং পর্যায়ক্রমে প্রকৃত খ্রিস্টধর্মের নাম-নিশানা মুছে গেল।

প্রথম তিন শতাব্দীতে পৌলের বিরুদ্ধাচরণ যে অত্যন্ত জোরদারভাবে করা হয়েছিল নিম্নের দৃষ্টান্তগুলি দ্বারাই তা উপলব্ধি করা যেতে পারে।

এক. পৌলের বিরুদ্ধাচরণ ঠিক তখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল, যখন তিনি জেরুজালেম-কাউন্সিলের সিদ্ধান্তসমূহকে তাঁর উদ্দেশ্য হাসিলের মাধ্যম বানিয়ে তাওরাতকে সম্পূর্ণরূপে রহিত করে ফেলার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তখন গালাতিয়ার জনগণ তার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে তার বিখ্যাত গালাতীয় শীর্ষক চিঠিটি লেখেন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার বরাতে আমরা প্রমাণ করে এসেছি যে, পৌলের যারা বিরোধিতা করেছিলেন, তাদের দাবি ছিল, তিনি হাওয়ারীদের শিক্ষা থেকে মানুষকে দূরে সরাচ্ছেন। এ বিরুদ্ধবাদীগণ প্রাচীন চার্চের 'ইহুদী-খ্রিস্টান' গ্রুপের সাথে সম্পৃক্ত ছিল আর তাদের নেতৃত্বে ছিলেন জনা কয়েক বিশিষ্ট ব্যক্তি।[১]

দুই. পৌলের চিঠি পৌঁছার পর এ বিরোধিতা মোটেই হ্রাস পায়নি; বরং তার তীব্রতা দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মিষ্টার জেমস ম্যাককিনন লেখেন,

এটা মনে করা ভুল যে, পৌল বা ইউহোন্নার ইনজীল রচয়িতার চিন্তা-চেতনা হাওয়ারীদের অব্যবহিত উত্তরকালে ধর্মীয় বিশ্বাসের সর্বাপেক্ষা বিকশিত ও

১. দেখুন এ রচনারই পৃষ্ঠা ১৩৩, ১৩৪ ব্রিটানিকা ৯ খণ্ড, ৯৭১ পৃষ্ঠা-এর বরাতে।

শক্তিশালী মানদণ্ড হয়ে উঠেছিল। যদিও একথা ঠিক যে, পৌল সে কালের মন-মস্তিষ্ককে ক্রমাগত প্রভাবিত করে যাচ্ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত চতুর্থ ইনজীলের আকীদা-বিশ্বাস পরবর্তীকালের চার্চসমূহের উপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু এটাও একটা বাস্তবতা যে, প্রাথমিক ক্যাথলিক চার্চের নীতিধর্ম পৌলিয় চিন্তা-ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে চলছিল। সুতরাং দ্বিতীয় শতাব্দীতে যেমন ইউহোন্নার ইনজীলে[১] বিশ্বাসী লোকজন পাওয়া যেত, তেমনি তার বিরুদ্ধবাদীদেরও দেখা যেত। তবে পৌল খ্রিস্টবাদের যে ধারণা পেশ করেছিলেন, হাওয়ারীদের আমলে তা বিশেষ গুরুত্ব পায়নি।[২]

তিন. দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে আইরিনিউস, হিপোলিট, এপিফানিউস ও অরিজেন একটি দলের কথা উল্লেখ করে থাকেন, যাদেরকে নাসরানী (Nazarine) ও এবিওনিটস (Ebionites) নামে আখ্যায়িত করা হয়। মিষ্টার জে. এম. রবার্টসন তাদের সম্পর্কে লেখেন,

তারা মসীহের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করত এবং তারা পৌলকে রসূল (প্রেরিত) বলে মানত না।[৩]

আর এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার নিবন্ধকার আইরিনিউসের উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেন,

তাদের বিশ্বাস ছিল যে, মাসীহ একজন মানুষ ছিলেন, যাকে মুজিযা দেওয়া হয়েছিল। পৌল মূসা (আ.)-এর ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন একথা তারা স্বীকার করত না। তারা মূসা (আ.)-এর শরীয়তের বিধানাবলী ও প্রথাসমূহ, এমনকি খতনার বিধানকেও প্রযত্ন সহকারে পালন করত।[৪]

চার. তারপর তৃতীয় শতাব্দীতে পল অব সামুসাটা (Paul of Samosate) -এর চিন্তাধারাও প্রায় এ রকমই ছিল। ইনি ২৬০ খ্রি. থেকে ২৭২ খ্রি. পর্যন্ত এন্টিয়কের বিশপ ছিলেন।[৫] অনুমান করা যায় এর প্রভাব কত বিস্তৃত হবে! এ কারণেই দেখা যায় চতুর্থ শতাব্দীতে লুসিয়ান ও আরিউস স্বতন্ত্র চিন্তাধারারূপে এর সমর্থনে কাজ করেছেন।

---

১. পূর্বে গত হয়েছে যে, ইউহোন্নার ইনজীল রচয়িতা চিন্তা-চেতনায় পৌলের সমর্থক ছিলেন।
২. From Christ to Constantine, Ch. V. 11
৩. J. M. Robertson, History of Christianity London 1913 P. 3
৪. ব্রিটানিকা ৭ম খণ্ড, ৮৮১ পৃষ্ঠা।
৫. বিস্তারিত জানার জন্য এ পুস্তকেরই ১৫২ পৃষ্ঠা ও তার টীকা দেখুন।

পাঁচ. চতুর্থ শতাব্দীতে আরিউস (Arius)-এর অনুসারী গোষ্ঠী ত্রিত্ববাদের বিরুদ্ধে গোটা খ্রিস্টান জগতে মহা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তখন এ নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা যে কী তুঙ্গে ছিল প্রাচীন ইতিহাস দ্বারা তা অনুমান করা যায়। বিখ্যাত খ্রিস্টান পণ্ডিত থিয়োডর্ট লেখেন,

প্রতি নগর ও পল্লীতে এ নিয়ে কলহ-বিবাদ শুরু হয়ে গেল। ধর্মের প্রতিটি আকীদাই ছিল বিতর্কের বিষয়বস্তু। এটা এমনই এক বেদনাদায়ক ইতিহাস, যে জন্য অশ্রু বর্ষণ করা উচিত। চার্চের উপর তখনকার আঘাত অতীতের মত বহিঃশত্রুর পক্ষ হতে ছিল না; বরং যারা ছিল একই রাষ্ট্রের নাগরিক, একই ছাদের তলের বাসিন্দা এবং একই মেঝেতে যারা বসত, তারাই কিনা একে অন্যের বিরুদ্ধে রণহুংকার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারা বর্শাঘাতে পরস্পরকে বিদ্ধ করেনি বটে, কিন্তু রসনাঘাতে একে অন্যকে জখম করেছিল।[১]

সেন্ট অগাষ্টাইন On the trinity গ্রন্থে যেই বিস্তারিত আলোচনার সাথে আরিউসকে রদ করেছেন, তা দ্বারাও অনুমান করা যায় যে, আরিউসের দল কতটা প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল এবং তার অনুসারী সংখ্যা কত বেশি ছিল।

ছয়. অতঃপর ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট কুসতানতীন নিকিয়া নামক স্থানে যে সম্মেলন ডেকেছিলেন, তাতেও আরিউসের মতবাদ খণ্ডন করা হয়। কিন্তু সে সম্পর্কে জেমস ম্যাককিনন লিখছেন,

একথা বলা কঠিন যে, সে সম্মেলনে খ্রিস্টানদের সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি যোগদান করেছিল। পশ্চিমাঞ্চল থেকে কম লোকই তাতে অংশগ্রহণ করেছিল। সর্বসাকুল্যে তিনশ' বিশপ উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের অধিকাংশই ছিলেন রোমান।[২]

পরন্তু সে সম্মেলনে আরিউসের চিন্তাধারা সম্পর্কে এক মিনিটের জন্য ঠাণ্ডা মাথায় বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়নি। থিওডর্ট লেখেন,

কনফারেন্সে আরিউসের চিন্তাধারা পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গেই তা ছিড়ে টুকরা-টুকরা করে ফেলা হয় এবং সেই মুহূর্তেই তাকে মিথ্যা ও ভ্রান্ত বলে ফায়সালা দিয়ে দেওয়া হয়।[৩]

---

১. Theodoret quoted by Jemes Mackinon, from Christ to Constantine Ch. 1V.

২. From Christ to Constantine.

৩. প্রাগুক্ত।

এর ফলাফল কী দাঁড়াল, তা ম্যাককিননের ভাষাতেই শুনুন।

এথানাসিউসের পার্টির অনুকূলে যেহেতু রাজকীয় শক্তি ও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল তাই সহজেই তা জয়লাভ করল। সেই সঙ্গে জয়যুক্ত হল ধর্মীয় বাক স্বাধীনতায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও দমন-পীড়ন এবং স্বাধীন মত প্রকাশের উপর কঠোর দণ্ডবিধানের ন্যায়নীতিহীন উন্মাদনা।

জেমস ম্যাককিনন অতঃপর বিস্তারিতভাবে এ বিষয়টাও উল্লেখ করেছেন যে, উক্ত সম্মেলনের ফায়সালার পরও জনগণের মধ্যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত দ্বন্দ্ব-কলহ চলতে থাকে। বিশেষত পূর্বাঞ্চলীয় খ্রিস্টানগণ কোন অবস্থাতেই নিকিয়া কাউন্সিলের ফায়সালা মানতে প্রস্তুত ছিল না। অবশ্য রাষ্ট্রীয় দমন-নিপীড়নের ফলে তারা ক্রমে নিস্তেজ হয়ে যেতে থাকে এবং এক পর্যায়ে বিরুদ্ধবাদীরা সম্পূর্ণ নীরব হয়ে যায়।

এ আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, খ্রিস্টধর্মের প্রথম তিন শতাব্দীতে পৌলীয় চিন্তাধারার বিরুদ্ধমত ছিল প্রবল এবং সে মতের অনুসারী সংখ্যাও ছিল প্রচুর। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রশক্তির ক্রমাগত দমন-নিপীড়নের ফলে তারা সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়।

সাম্প্রতিককালের খ্রিস্টান পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে পৌলীয় মতবাদ

এবার আমরা সাম্প্রতিককালের খ্রিস্টান বিদগ্ধজনদের কিছু ভাষ্য উদ্ধৃত করব, যা দ্বারা আপনি বুঝতে পারবেন, পৌলকে প্রচলিত খ্রিস্টধর্মের জনক কেবল আমরাই বলছি না; বরং যে সকল খ্রিস্টান চিন্তাবিদ ও গবেষক নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বাইবেল পাঠ করেছেন, তারাও এটা সমর্থন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

এক. এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় পৌলের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে,

চিন্তাশীল লেখকদের একটি গোষ্ঠী, দৃষ্টান্ত স্বরূপ যাদের মধ্যে ডব্লিউ রেড (W. Wrede)-এর নাম উল্লেখযোগ্য, যদিও কোনওভাবেই পৌলকে অস্বীকার করেন না, কিন্তু তথাপি তারা এ কথার উত্তর দিতে গিয়ে বলেন,

খ্রিস্টধর্মে ব্যাপক রদবদল ঘটানোর দায়ে পৌলকে এ ধর্মের দ্বিতীয় জনক বলা যায়। তারা বলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি সেই 'চার্চ কেন্দ্রিক' খ্রিস্টবাদের প্রবর্তক, যা হযরত ইয়াসূ মাসীহের আনীত দ্বীন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তারা বলে থাকেন, হয় ইয়াসূ মাসীহের অনুসরণ কর, নয়ত পৌলের। যুগপৎ উভয়ের অনুসরণ করা যেতে পারে না।

তারা এ কথার উপর জোর দিয়ে থাকেন যে, পৌলীয় ধর্ম কেবল পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও মুক্তিদাতার অনন্ত অস্তিত্ব সম্পর্কে কল্পনাশ্রয়ী ধ্যান-ধারণাকেই শামিল করে না, বরং ইয়াসূ মাসীহ সম্পর্কে পৌলের যাবতীয় আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি– যাকে তিনি পাপমোচন ও নাজাতের পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য করেন– ইয়াসূ মাসীহের শিক্ষার সঙ্গে সাংঘর্ষিক, যে শিক্ষা তিনি আল্লাহ ও মানুষের প্রকৃত সম্পর্ক সম্বন্ধে পেশ করেছিলেন।[১]

দুই. পৌলের প্রসিদ্ধ জীবনীকার ওয়ালটার ভোন লুই উইঙ্ক Walter von Loewinch লেখেন,

পল ডি লিগার্ডে (Paul de Legarde) বলেন, পৌল– যিনি বাস্তবিকই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর ছিলেন এবং নিজ চিন্তাধারাগত রূপান্তরের পরও তিনি মূলত একজন ফরীশী (গোঁড়া ইহুদী)-ই ছিলেন– ইয়াসূ ও ইনজীল সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান ছিল না। সুতরাং একথা কোনভাবেই কর্ণপাতযোগ্য নয় যে, যারা ঐতিহাসিকভাবে শিক্ষিত সমাজ, পৌল নামক এই ব্যক্তিকে তাদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

আজও পৌলীয় উত্তরাধিকারের দরুণ চার্চ ভীষণভাবে জটিলতা-জর্জরিত। পৌলই চার্চে ওল্ড টেষ্ট্যামেন্টকে ঢুকিয়েছেন এবং তার প্রভাবে ইনজীল সর্বপ্রকারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এই পৌলই তো ইহুদী কুরবানীর দৃষ্টিভঙ্গিকে তার যাবতীয় আচার-উপচারসহ খ্রিস্টধর্মে আমদানি করেছেন। তিনিই ইহুদীদের গোটা ঐতিহাসিক চিন্তাধারা আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। এসব কীর্তিকলাপ তিনি প্রাচীন চার্চের দায়িত্বশীলদের ঘোর বিরোধিতার মধ্যেই সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। অবশ্য সেই বিরুদ্ধবাদীরাও সকলে ইহুদীই ছিলেন, যদিও তাদের চিন্তা-ভাবনা পৌলের মত অতটা ইহুদী মানসিকতায় আচ্ছন্ন ছিল না। তাছাড়া তারা একটি 'সংশোধিত ইসরাঈলী ধর্মকে' আল্লাহ-প্রেরিত ইনজীলও সাব্যস্ত করত না।

তিন. লি. গার্ডের উপরিউক্ত বক্তব্য উল্লেখ করার পর লুই উইঙ্ক লেখেন,

আধুনিককালে পৌল-বিরোধীদের অধিকাংশেই লিগার্ডে যেমনটা বলেছেন, খুব দ্রুত এ সকল দৃষ্টিকোণ থেকেই চিন্তা করছেন। এখনও বহু লোক ইয়াসূ ও পৌলের মধ্যে বিদ্যমান বৈপরিত্যের উপর জোর দিচ্ছেন। তারা ইয়াসূ মাসীহের খালেস ও প্রকৃত শিক্ষামালাকে সম্পূর্ণরূপে বিকৃত করে ফেলার জন্য এই ব্যক্তিকেই দায়ী করেন।[২]

---

১. ব্রিটানিকা, ১৭ খণ্ড, ৩৯৫ নিবন্ধ পৌল।

২. Winch, Paul, His Life and Work trans. by G. E. Harris, london p. 5

চার. খোদ লুই উইংক যদিও পৌলের একজন ঘোর সমর্থক, কিন্তু তিনি হোস্টন স্ট্যুয়ার্ট চেম্বারলেনের (Houston Stewart Chamberlain) নিম্নোক্ত মতকেও সমর্থন করেন যে,

তিনি (পৌল) খ্রিস্টধর্মকে জোড়াতালি দিয়ে ইহুদী ধর্ম থেকে আলাদা একটি আকৃতি দান করেছেন। ফলে তিনি ইয়াসূ'র নামে প্রতিষ্ঠিত চার্চসমূহের জনক বনে গেছেন।[১]

আরও সামনে গিয়ে লুই উইংক বলেন,

পৌল না হলে খ্রিস্টধর্ম ইহুদী ধর্মের একটি শাখা হয়ে যেত এবং এটা কোন বৈশ্বিক ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করত না।[২]

এসব কি একথার দ্ব্যর্থহীন স্বীকারোক্তি নয় যে, পৌল খ্রিস্টধর্মকে এক বৈশ্বিক ধর্মে পরিণত করার আগ্রহেই হযরত মাসীহ (আ.)-এর আনীত দ্বীনকে পরিবর্তন করে ফেলেছেন? লুই উইংকের মতে এটা ছিল পৌলের প্রশংসাজনক কীর্তি। কিন্তু আমাদের নিকট এটাই সেই কাজ, যাকে তাহরীফ বা ধর্মের বিকৃতি সাধন বলে।

পাঁচ. মিষ্টার ম্যাককিনন, এ রচনায় যার বরাত বারবার এসেছে, একজন বিদগ্ধ খ্রিস্টান ঐতিহাসিক। তাকে কোনওক্রমেই পৌলবিরোধী বলা যায় না। অথচ তিনি সুস্পষ্টভাবেই স্বীকার করছেন,

পৌলের চিন্তাধারা সম্পূর্ণই তার নিজস্ব। তার চিন্তাধারা যে ইয়াসূ মাসীহের চিন্তাধারার সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ –একথা দলিল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাওরাত সম্পর্কে ইয়াসূ'র যে ধারণা, তা মোটেই পৌলের ধারণার অনুরূপ নয়। এ হিসেবে পৌলের এ দাবি অনধিগম্য যে, তিনি নিজ শিক্ষা ইয়াসূ মাসীহ থেকে সরাসরি ওহীর মাধ্যমে লাভ করেছেন।[৩]

ছয়. পৌলের আরেক জীবনীকার হলেন জ্যাকসন, যিনি পৌলের একজন সমর্থকও বটে। তিনি পৌলবিরোধীদের চিন্তাধারা বর্ণনা করার পর সবশেষে স্বীকার করেছেন যে,

পৌল না হলে খ্রিস্টধর্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম হত। আর ইয়াসূ না হলে তো খ্রিস্টধর্মের অস্তিত্বই হত না।[৪]

সাত. ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা থেকে The Nazarene Gospel Restored নামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে, যা যৌথভাবে রবার্ট গ্র্যাভ্স

১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬
২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭১
৩. Jams Mackinon, from Christ To Constantine PP. 91-92
৪. Foakes Jachson the life of Paul, London 1933, P. 18

(Robert Graves) ও জোশু পেডরো (Joshua podro) রচনা করেছেন। শেষোক্তজন এক প্রসিদ্ধ বিশপের পুত্র। বইটির ভূমিকায় পৌল সম্পর্কে বিস্তারিত ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাতে প্রমাণ করা হয়েছে যে, পৌল হযরত ঈসা (আ.)-এর ধর্মকে মারাত্মকভাবে নষ্ট করে ফেলেছেন। আর এ কারণে হযরত ঈসা (আ.)-এর আসল হাওয়ারীগণ তার প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন।[১]

এতক্ষণ আমরা খ্রিস্টান ধর্মজ্ঞদের যে উদ্ধৃতিসমূহ পেশ করলাম, তা 'বিপুল ভাণ্ডার থেকে এক মুঠো নমুনা' তুল্য। পৌলের সমালোচক ও বিরুদ্ধবাদীদের উক্তি ও মতামতসমূহ জমা করা হলে নিঃসন্দেহে একটা বৃহৎ কলেবরের গ্রন্থ তৈরি হতে পারে। উপরিউক্ত উদ্ধৃতি ক'টি পেশ করার উদ্দেশ্য ছিল কেবল এতটুকু দেখানো যে, খোদ খ্রিস্টান বিগদ্ধজনদের মধ্যেও এমন অসংখ্যজন আছেন, যারা প্রচলিত খ্রিস্টবাদের মূল প্রবর্তক যে হযরত ঈসা (আ.) নন; বরং পৌল একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

আশা করি উপরে বর্ণিত দলিল-প্রমাণ ও সাক্ষী-সাবুদ একজন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির সামনে এই বাস্তবতা পরিস্ফুট করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে যে, বর্তমান খ্রিস্টধর্ম হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রকৃত শিক্ষার সাথে কোন রকম সম্পর্ক রাখে না। এ ধর্ম পুরোপুরিই পৌলের সৃষ্টি। এ হিসেবে এ ধর্মের নাম খ্রিস্টধর্ম না হয়ে পৌলবাদ হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

বার্ণাবাসের ইনজীল

এ বিষয়টা তো জ্ঞানজগতে এখন আর কোন গুপ্ত কথা নয় যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর যে ইনজীল নাযিল হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে গেছে। ইনজীল নামে যে গ্রন্থ এখন প্রচলিত, তা মূলত হযরত ইসা (আ.)-এর জীবনচরিত, যা বিভিন্ন ব্যক্তি সংকলন করেছেন এবং তাতে তার শিক্ষামালা থেকে অনেক কিছুই সন্নিবেশিত হয়েছে।

ইতিহাস দ্বারা জানা যায়, হযরত ঈসা (আ.)-এর বিভিন্ন শিষ্য ও হাওয়ারী এ রকম আরও ইনজীল লিখেছিলেন। লূক তার ইনজীলের শুরুতে লিখেছেন,

'আমাদের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটেছে, তা যারা প্রথম থেকে নিজের চোখে দেখেছেন ও আল্লাহর সুসংবাদ তাবলীগ করেছেন তারা আমাদের কাছে সবকিছু জানিয়েছেন আর তাদের কথা মতই সেই সব বিষয়গুলো পরপর লিখেছেন (লূক ১ : ১–২)।

১. See the Nazarene Gospel Restored Cassl 1953 PP. 19-21

কিন্তু খ্রিস্টান সম্প্রদায় সেসব ইনজীলের মধ্যে মাত্র চারটিকে নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন, যা যথাক্রমে মথি, মার্ক, লূক ও ইউহোন্নার সাথে সম্পৃক্ত। বাকি ইনজীলগুলো হয় হারিয়ে গেছে, নয়ত বর্তমান আছে বটে, কিন্তু খ্রিস্টানগণ তার মৌলিকত্ব অস্বীকার করে।

তবে আজ থেকে প্রায় আড়াইশ' বছর আগে একখানি ইনজীল উদ্ধার হয়েছে, যা হাওয়ারী বার্ণাবাসের সাথে সম্পৃক্ত। গ্রন্থখানি উদ্ধার হলে খ্রিস্টান জগতে মহা হৈ চৈ পড়ে যায়। কেননা তাতে এক তো এমন বহু কথা আছে, যা দ্বারা খিস্টধর্মের প্রাসাদটাই ধ্বসে যায়। দ্বিতীয় তাতে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক নামও স্পষ্টভাবে লেখা আছে।

তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত বহু খ্রিস্টান বিদগ্ধজন ও ইতিহাসবিদ এ গ্রন্থখানিকে তাদের গবেষণা ও আলোচনা-পর্যালোচনার বিষয়বস্তু বানিয়ে নিয়েছেন। ওদিকে খ্রিস্টান ধর্মগুরুগণ দাবি করে বসেছেন, এটা বার্ণাবাসের প্রকৃত ইনজীল নয়; বরং এর লেখক কোন মুসলিম ব্যক্তি, যিনি খ্রিস্টধর্মকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে এটিকে বার্ণাবাসের নামে চালু করে দিয়েছেন।

এ বিষয়ে মরহুম সায়্যিদ রশীদ রিযা মিসরীর একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ ছাড়া আর কোন মুসলিমের কোন লেখা আমার নজরে আসেনি। হযরত মাওলানা রহমাতুল্লাহ কিরানবী (রহ.) তার বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ ইজহারুল হকে বার্ণাবাসের ইনজীলটির কথা অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। এই লেখক অতি সম্প্রতি ইজহারুল হকের উর্দূ তরজমার উপর টীকা-টিপ্পনী সংযোজনের কাজ শেষ করেছে। এ সময় বার্ণাবাসের ইনজীল এবং সে সম্পর্কিত বিভিন্ন লেখাজোখা পড়ার সুযোগ হয়েছে। সেই পড়াশোনারই সারাৎসার আমি এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে পেশ করছি। আশা করি জ্ঞানবান্ধব মহলের অন্তরে আকর্ষণ সৃষ্টি করবে।

আমরা সর্বপ্রথম 'বার্ণাবাসের ইনজীল'-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরব এবং সে প্রসঙ্গে তার কয়েকটি স্তবকও পেশ করব। তারপর ঈষৎ বিস্তৃত আলোচনার সাথে প্রমাণ করার চেষ্টা করব এটি বার্ণাবাসের আসল ইনজীল, না জাল। প্রসিদ্ধ চার ইনজীল থেকে বার্ণাবাসের ইনজীল বিভিন্ন দিক থেকে ব্যতিক্রম। কিন্তু চারটি পার্থক্য এমন, যা বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী।

১. এ ইনজীল হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম নিজের ঈশ্বর হওয়া বা ঈশ্বর-পুত্র হওয়ার বিষয়টাকে পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার করেছেন।

২. এ ইনজীলে হযরত ঈসা (আ.) জানিয়েছেন যে, সেই 'মাসীহ' বা 'মাসিয়্যা'-এর আগমনের সুসংবাদ ওল্ড টেষ্ট্যামেন্টের কিতাবসমূহে দেওয়া

হয়েছে, তার লক্ষ্যবস্তু আমি নই। বরং তা দ্বারা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বোঝানো হয়েছে, যিনি আখেরী যমানায় প্রেরিত হবেন।

৩. বার্ণাবাস জানিয়েছেন, হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামকে শূলে চড়ানো হয়নি; বরং এহুদা এস্কারিয়োতের আকৃতি পরিবর্তন করে তাঁর মত বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ফলে ইহুদীরা তাকেই মাসীহ মনে করে শূলে দিয়েছিল। আর হযরত মাসীহ (আ.)কে আল্লাহ তাআলা আসমানে তুলে নিয়েছিলেন।

৪. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর যে পুত্রকে যবেহ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তিনি হযরত ইসহাক (আ.) নন, বরং তিনি ছিলেন হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম।

বার্ণাবাসের ইনজীলে মহানবী (সা.)-এর নাম

নিচে আমরা বার্ণাবাসের ইনজীল থেকে কয়েকটি স্তবক তুলে ধরছি, যাতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের যবানী মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। আমাদের সামনে ইনজীলের আরবী ও উর্দূ তরজমা রয়েছে। উর্দূ তরজমাটি একজন মুসলিম আলেমের করা আর আরবী তরজমাটি করেছেন ড. খলীল সাআদাত, যিনি একজন খ্রিস্টান বিদগ্ধজন।

(١) لستُ أهلاً أن احلّ رباطات جرموق أو سيور حذاء رسول الله الذى تسمونه مسيًا الذى خلق قبلى ويأتى بعدى ٤٢ : ١٤

১. 'আল্লাহর রাসূল, যাকে আপনারা মাসীহ বলছেন, আমি তার মোজার বাঁধন বা জুতার ফিতা খোলারও যোগ্যতা রাখি না। তাঁর সৃষ্টি আমার সৃজনের পূর্বে এবং আবির্ভাব আমার পরে (৪২ : ১২)।

(٢) ولما رأيته امتلأت عزاء قائلاً يا محمد ليكن الله معك وليجعلنى أهلاً أن أحلّ سير حذائك

২. 'আর যখন তাকে প্রত্যক্ষ করলাম, আমার হৃদয় স্বস্তিতে ভরে গেল। আমি বললাম, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ আপনার সঙ্গে থাকুন আর আমাকে আপনার জুতার ফিতা খোলার যোগ্যতা দান করুন' (৪৪ : ৩০)।

(٣) اجاب التلاميذ يا معلّم من عَسىٰ أن يكون ذلك الرجل الذى تتكلم عنه الذى سيأتى إلى العالم؟ أجاب يسوع بابتهاج قلب : انّه محمد رسول اللّٰه (١٦٣ : ٧-٨)

৩. শিষ্যগণ বললেন, ওগো মুর্শিদ! সেই মানুষ কে হবেন যার সম্পর্কে বলছেন আপনি, কে তিনি, যিনি জগতে আসবেন? ঈসা হৃদয়ের পূর্ণ আনন্দ নিয়ে জবাব দিলেন, তিনি মুহাম্মদ, আল্লাহর রাসূল' (১৬৩ : ৭–৮)।

(٤) ألحق أقول لكم متكلما من القلب انى اقشعر لأن العالم سيدعونى إلٰهًا وعلى ان اقدم لاجل هٰذا حسابًا لعمرو اللّٰه الذى نفسى واقفة فى حضرته انى رجلٌ فانٍ كسائر الناس (٥٢ : ١٠-١٣)

৪. 'অবশ্যই আমি তোমাদের বলছি, আমি অন্তর হতে উচ্চারণ করছি যে, আমি ভয়ে কাঁপতে থাকব। কেননা জগত আমাকে খোদারূপে আহ্বান করবে এবং এ বিষয়ে আমাকে সুস্পষ্ট জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহর শপথ, যার সামনে আমার আত্মা দণ্ডায়মান, আমি অন্য সব মানুষেরই মত একজন মরণশীল মানুষ' (৫২ : ১০–১৩)।

এ ইনজীল যেভাবে পাওয়া গেল

প্রাচীন খ্রিস্টীয় রচনাবলীতে বার্ণাবাসের ইনজীলের উল্লেখ পাওয়া যায় একখানি বিলুপ্ত গ্রন্থ হিসেবে। ১৭০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রাশিয়া-রাজের উপদেষ্টা ক্রেমার আমষ্টারডামের এক গ্রন্থাগার থেকে এ ইনজীলের একটি কপি লাভ করেন। তার ভাষা ছিল ইতালিয়ান এবং তাতে লেখা ছিল, এটি হাওয়ারী বার্ণাবাসের লিখিত ইনজীল। তখন পর্যন্ত কেবল এতটুকুই জানা গিয়েছিল যে, ক্রেমার ইটালিয়ান সে কপিটি আমষ্টার্ডামের পদস্থ কোন ব্যক্তির কাছ থেকে পেয়েছিলেন, যিনি সেটিকে অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ মনে করতেন। ক্রেমার প্রিন্স এওজিনকে সে কপিটি উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। অতঃপর ১৭৩৮ খ্রিস্টাব্দে সেটি অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার রাজকীয় গ্রন্থাগারে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। এখনও পর্যন্ত পাণ্ডুলিপিটি সেখানেই আছে।

অতঃপর অষ্টাদশ শতকের শুরুদিকে হেড্‌লি থেকে ড. হেলম্যান বার্ণাবাসের ইনজীলের অন্য একটি কপি হস্তগত করেন। সেটি ছিল স্প্যানিশ ভাষায়। বিখ্যাত

প্রাচ্যবিদ জর্জ সেল এ কপিটিই লাভ করেছিলেন। তিনি তার কৃত কুরআন মাজীদের তর্জমায় তা থেকে বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করেছেন।

জর্জ সেল স্প্যানিশ কপিটিতে যে নোট লেখেন, তা দ্বারা বোঝা যায়, এটি উপরোল্লিখিত ইটালিয়ান কপিটিরই স্প্যানিশ অনুবাদ, যা মোস্তফা ডি আরান্দে নামক জনৈক উররুগানী মুসলিম ব্যক্তি করেছেন। মোস্তফা আরানদেই শুরুতে একটা ভূমিকাও লিখেছেন, যাতে তিনি ইতালিয়ান কপিটি কিভাবে হস্তগত হল তা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন, ভূমিকাটির সারমর্ম নিম্নরূপ,

'আনুমানিক ষোড়শ' শতাব্দীর শেষ দিকে বিশপ ইরানিয়াসের লেখা কিছু চিঠি ল্যাটিন রাহিব (খ্রিস্টান সন্যাসী) ফ্রামারিনোর হস্তগত হয়। তার একটিতে পৌলের[১] কঠিন সমালোচনা করা হয়েছিল। তাতে আরও লেখা ছিল, বার্ণাবাসের ইনজীলে পৌলের স্বরূপ ভালোভাবে উন্মোচন করা হয়েছে। ইরানিয়াসের এ চিঠি পড়ার পর থেকেই ফ্রামারিনো বার্ণাবাসের বাইবেলের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং তিনি তার সন্ধানে লেগে পড়েন।

কিছুকাল পর সেকালের পোপ পঞ্চম সিক্সটাস (Sixtus)-এর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। একদিন তিনি পোপের সঙ্গে তার গ্রন্থাগারে প্রবেশ করলেন। সেখানে পোপের ঘুম এসে যায় এবং তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। সেই অবকাশে ফ্রামারিনো গ্রন্থাগারের বই-পুস্তকে নজর বুলাতে শুরু করলেন। সৌভাগ্যই বলতে হবে, সর্বপ্রথম যে পুস্তকের উপর তার হাত পড়ল, সেটি ছিল ইটালিয়ান ভাষায় লেখা বার্ণাবাসের ইনজীল, দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি যার সন্ধান করে বেড়াচ্ছিলেন। সেটি পেয়ে তিনি বেজায় আনন্দিত হলেন। সুযোগ হাতছাড়া করলেন না। তিনি সেটি কাপড়ের ভেতর লুকিয়ে নিয়ে আসলেন।'

এই পূর্ণ বিবরণ মোস্তফা আরানদের বরাতে প্রাচ্যবিদ সেল তার 'কুরআন তরজমা'-এর ভূমিকায় উদ্ধৃত করেছেন। সেলের কাছে যে স্প্যানিশ কপিটি ছিল, সেটি এখন লুপ্ত। কেবল এতটুকু জানা যায় যে, ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে সে কপিটি ড. হিউইট (Hewitt)-এর হস্তগত হয়েছিল। তিনি নিজ বক্তৃতাসমূহে বলেছেন, দু'টি স্থানে মামুলি পার্থক্য ছাড়া ইতালিয়ান ও স্প্যানিশ কপিদ্বয়ে উল্লেখযোগ্য কোন প্রভেদ নেই।

সারকথা, বর্তমানে দুনিয়ায় কেবল সেই ইটালিয়ান কপিটিই সংরক্ষিত আছে। সেখান থেকেই ড. মিনকাহোস সেটি ইংরেজি থেকে আরবী ভাষান্তর করেন। এ আরবী তরজমাটি মরহুম সায়্যিদ রাশীদ রিযা মিসরী ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে একটি

১. পৌল হলেন খ্রিস্টানদের সর্বপ্রধান নেতা। তার চৌদ্দটি চিঠি বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত।

সংক্ষিপ্ত ভূমিকাসহ প্রকাশ করেন। ড. খলীল সাআদাতই এ ইনজীলের পরিচ্ছেদসমূহে আয়াত নম্বর বসান। মূল কপিতে এ নম্বর ছিল না। তিনি শুরুতে একটা দীর্ঘ মুখবন্ধও লিখেছেন এবং তাতে এ ইনজীল হস্তগত হওয়ার উপরিউক্ত ঘটনা বিবৃত করেছেন। তারপর তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, এ ইনজীল এমন কোন ইহুদীর লেখা, যিনি প্রথমে খ্রিস্টান ছিলেন, তারপর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

আরবী তরজমাটি ভারতবর্ষে পৌঁছলে মৌলভী মোহাম্মদ হালীম আনসারী রাওদালাবী তার উর্দূ তরজমা করেন, যা ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[১]

এই হল বার্ণাবাসের ইনজীলের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। এবার আমরা খতিয়ে দেখব, সত্যিই কি এ ইনজীল বার্ণাবাসের রচিত, না কি খ্রিস্টানদের দাবি মত কোন মুসলিম ব্যক্তির রচনা। আমরা যতদূর অনুসন্ধান করেছি, তাতে আমাদের কাছে এতটুকু প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, এর সূত্র-ক্রমের বিশ্বস্ততা বাইবেলের অন্য কোন পুস্তক অপেক্ষা কম নয়; বরং তদপেক্ষা অনেক বেশি।

বরং এমন কিছু দলিল-প্রমাণ আমাদের সামনে এসেছে, যার ভিত্তিতে আমরা মানতে বাধ্য যে, এটি মূলত হাওয়ারী বার্ণাবাসেরই লেখা।

বার্ণাবাসের ইনজীলের মৌলিকত্ব যাচাই

বার্ণাবাসের ইনজীলের প্রকৃত অবস্থা ও তার মৌলিকত্ব যাচাই করতে হলে প্রথমে জানতে হবে বার্ণাবাস কে? হাওয়ারীদের দৃষ্টিতে তিনি কেমন ছিলেন? এবং তার আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা কী ছিল? তাঁর পরিচয় সম্পর্কে লূকের প্রেরিত পুস্তকে আমরা একটি স্তবক পাই, যা নিম্নরূপ–

ইউসুফ নামে লেবির বংশের একজন লোক ছিলেন। সাইপ্রাস দ্বীপে তার বাড়ি ছিল। তাকে সাহাবীরা বার্ণাবাস অর্থাৎ উৎসাহদাতা (বা উপদেশের পুত্র) বলে ডাকতেন। তার এক খণ্ড জমি ছিল; তিনি সেটা বিক্রি করে টাকা এনে সাহাবীদের পায়ের কাছে রাখলেন' (প্রেরিত ৪ : ৩৬–৩৭)।

এর দ্বারা একটি বিষয় তো এই জানা যায় যে, হাওয়ারীদের মধ্যে বার্ণাবাস উচ্চ মর্যাদার লোক ছিলেন। এ কারণেই হাওয়ারীগণ তার নাম রেখে দিয়েছিলেন

১. কেউ এসব তরজমা দেখতে চাইলে, আরবী তরজমাটি করাচী স্টেট ব্যাংক লাইব্রেরীতে এবং উর্দূ তরজমাটি 'মজলিসে ইলমী, মেরী দীদার টাওয়ার করাচী'-এর গ্রন্থাগারে দেখতে পারেন।
(কবি আফজাল চৌধুরী ইংরেজি থেকে এর বাংলা অনুবাদ করেছেন, যা বাংলাদেশ কো-অপরেটিভ বুক সোসাইটি প্রকাশ করেছে –অনুবাদক)।

বার্ণাবাস (বা উপদেশের পুত্র)। দ্বিতীয়ত জানা গেল, তিনি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজের পার্থিব সবটা পুঁজি দ্বীনের প্রচার কার্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

এছাড়া বার্ণাবাসের একটা বিশেষত্ব এই যে, তিনিই সমস্ত হাওয়ারীর সাথে পৌলকে পরিচিত করেছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, যেই শৌল কাল পর্যন্ত আমাদের শত্রু ছিল, আমাদেরকে সর্বপ্রকারে দুঃখ-কষ্ট দিচ্ছিল, আজ হঠাৎ করেই আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু ও আমাদের ধর্মেরই এক সাচ্চা অনুসারী বনে যেতে পারে। কিন্তু এই বার্ণাবাসই সর্বপ্রথম সমস্ত হাওয়ারীর সামনে তার তাসদীক করলেন এবং তাদেরকে বললেন, বাস্তবিকই ইনি তোমাদের ধর্ম কবুল করেছেন, সুতরাং পৌল সম্পর্কে লূক লেখেন,

শৌল (অর্থাৎ পৌল) জেরুজালেমে এসে উম্মতদের সঙ্গে যোগ দিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তারা সবাই তাকে ভয় করতে লাগল। তারা বিশ্বাস করতে পারল না যে, শৌল সত্যিই একজন উম্মত হয়েছেন। কিন্তু বার্ণাবাস তাকে সঙ্গে করে সাহাবীদের কাছে নিয়ে গিয়ে তাদের জানালেন, দামেস্কের পথে শৌল কিভাবে হযরত ঈসাকে দেখতে পেয়েছিলেন এবং ঈসা কিভাবে তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। আর দামেস্কে ঈসার সম্বন্ধে কিভাবে তিনি সাহসের সঙ্গে তাবলীগ করেছিলেন (প্রেরিত ৯ : ২৬-২৭)।

এরপর প্রেরিত পুস্তক দ্বারাই আমরা এ কথাও জানতে পারি যে, পৌল ও বার্ণাবাস দীর্ঘদিন পর্যন্ত একে অন্যের সঙ্গে সফর করেছেন এবং সম্মিলিতভাবে খ্রিস্টধর্মের প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব আনজাম দিয়েছেন। দেখুন (প্রেরিত ১১ : ৩০; ১২ : ২৫ এবং ১৩, ১৪, ১৫ নং পরিচ্ছেদ)।

কিন্তু এক পর্যায়ে পৌল ও বার্ণাবাসের মধ্যে প্রচণ্ড মতভেদ সৃষ্টি হয়ে যায়, যা আমরা এ পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত করেছি। সেখানে আমরা এটাও প্রমাণ করেছি যে, তাদের সে বিরোধ ছিল চিন্তাধারাগত, যার মূল কারণ ছিল এই যে, পৌল প্রকৃত খ্রিস্টধর্মকে রদবদল করে একটি নতুন ধর্মের গোড়াপত্তন করতে চাচ্ছিলেন এবং সেই লক্ষ্যেই তিনি কাজ করে যাচ্ছিলেন, যা বার্ণাবাস বিলক্ষণ টের পেয়ে ফেলেছিলেন। এখানে সে কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আগ্রহী পাঠক সেখানে দেখে নিতে পারেন। যা হোক তা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বার্ণাবাস খোলাখুলিভাবেই পৌলের বিরোধিতা শুরু করে দিয়েছিলেন।

প্রিয় পাঠক! দ্বিতীয় অধ্যায়ের সেই আলোচনাকে মাথায় রেখে এবার বার্ণাবাসের ইনজীলের কাছে আসুন। এর বিলকুল শুরুতে বার্ণাবাস কী বলছেন দেখুন,

ايّها الاعزّاء ان اللّٰه العظيم العجيب قد انتقدنا فى هذه الايام الاخيرة بنبيه يسوع المسيح برحمة عظيمه للتعليم والأيات التى اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوىٰ مبشرين بتعليم شديد الكفر داعين المسيح ابن اللّٰه ورافضين الختان الذى امر اللّٰه به دائمًا مجوّزين كل لحم نجس الذين ضل فى عدادهم ايضا بولس الذى لا اتكلم عنه الّا مع الاسى وهو السببُ الذى لاجله اسطر ذلك الحق الذى رأيته وسمعته اثناء معاشرتى يسع لكى تخلصوا ولا يضلكم الشيطان فتهلكوا فى دينونة اللّٰه وعليه فاحزروا كل احد يبشركُم بتعليم جديد مضادٌ لما اكتبه لتخصلوا خلاصًا ابديًّا برنباس ١ : ٢-٩)

বন্ধুগণ! মহান বিস্ময়কর আল্লাহ সাম্প্রতিক দিনগুলিতে আমাদেরকে তাঁর নবী ইয়াসূ মাসীহের মাধ্যমে আমাদেরকে একটি মহা রহমত দ্বারা পরীক্ষা করেছেন– সেই শিক্ষা ও নিদর্শনসমূহের দ্বারা যাকে শয়তান বহু লোককে পথভ্রষ্ট করার মাধ্যম বানিয়েছে, যারা তাকওয়ার দাবি করছে, অথচ প্রচার করছে গুরুতর কুফর। তারা মাসীহকে আল্লাহর পুত্র বলে, খতনা করতে অস্বীকার করে, অথচ আল্লাহ তা স্থায়ীভাবে পালনের হুকুম করেছেন। আর তারা সব রকম অপবিত্র গোশতকে হালাল বলে। পৌলও সেই (বিভ্রান্ত) লোকদেরই একজন, যার সম্পর্কে আমি আফসোস করা ছাড়া কিছু বলতে পারি না। তারই কারণে আমি সেই সত্যবাণী লিখছি, যা আমি ইয়াসূ মাসীহের সঙ্গে থাকাকালে শুনেছি ও দেখেছি, যাতে তোমরা নাজাত পাও এবং শয়তান তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে না পারে, যদ্দরুণ তোমরা আল্লাহর বিচারাদালতে ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমরা এর ভিত্তিতে এমন সব ব্যক্তি থেকে সাবধান থেক, যারা তোমাদের কাছে কোন নতুন কথা প্রচার করে, যা আমার এ লেখার পরিপন্থী। তা হলে তোমরা অনন্ত মুক্তি লাভ করতে পারবে (বার্ণাবাস ১ : ২–৯)।

এর দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আদৌ অযৌক্তিক নয় যে, পৌলের সঙ্গে চিন্তাধারাগত বিরোধ দেখা দেওয়া ও তার ভিত্তিতে তার সঙ্গ পরিত্যাগ করার পর বার্ণাবাস– যিনি দীর্ঘদিন হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের সাহচর্যে

কাটিয়েছিলেন হযরত মাসীহ (আ.)-এর একটি জীবনচরিত লিখে থাকবেন এবং তাতে পৌলীয় চিন্তাধারার সমালোচনা করে সত্য-সঠিক আকীদা-বিশ্বাস তুলে ধরবেন।

এ পর্যন্ত আমরা যা আরজ করেছি, তার সারমর্ম হল- খোদ বাইবেলে বার্ণাবাসের যে কৃতিত্ব বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে পৌলের সঙ্গে তার যে মতবিরোধ উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রেক্ষাপটে বার্ণাবাস যদি এমন কোন ইনজীল লিখে থাকেন, যাতে পৌলের চিন্তাধারা রদ করা হবে এবং যা হবে প্রচলিত খ্রিস্টীয় আকীদা-বিশ্বাসের বিপরীত, তবে তাতে অসম্ভবের কিছু নেই।

এ বিষয়টা যদি আপনি যথাযথভাবে উপলব্ধি করে থাকেন, তবে তার অর্থ, বর্তমান বার্ণাবাসের ইনজীলকে বার্ণাবাসেরই লেখা হিসেবে গণ্য করার পথ সুগম হয়ে গেল এবং সে পথ থেকে একটি বড় বাধার অপসারণ ঘটল। কেননা সাধারণের আর বিশেষত খ্রিস্টানদের অন্তরে এ গ্রন্থ সম্পর্কে একটি বড়- সম্ভবত সর্বাপেক্ষা বড় খটকা এ কারণেই সৃষ্টি হয়ে থাকে যে, এর ভেতর এমন বহু বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়, যা পৌলের সূত্রে আমাদের কাছে পৌঁছা ধ্যান-ধারণার পরিপন্থী। তারা যখন দেখেন এ গ্রন্থের বহু বক্তব্য চার ইনজীল ও প্রচলিত খ্রিস্টীয় চিন্তাধারার বিপরীত তখন তারা কোনওক্রমেই এটিকে বার্ণাবাসের লেখা বলে মানতে রাজি হন না। এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানার নিবন্ধকার এ ইনজীলের উপর পর্যালোচনা করতে গিয়ে লেখেন,

আমাদের কাছে এমন কোন সূত্র নেই, যা দ্বারা বার্ণাবাসের ইনজীলে প্রকৃতপক্ষে কী সব বিষয় লেখা ছিল তা জানতে পারব। তথাপি এ নামে ইটালিয়ান ভাষায় একটি বড়-সড় পুস্তক আজকাল পাওয়া যাচ্ছে, যা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত এবং তাতে তাসাওউফের এক শক্তিশালী উপাদান বিদ্যমান। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে লন্স ডিল ও লরা সেটি সম্পাদনা করেছিলেন। তাদের ধারণা, এটি খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করেছিল এমন কোন ব্যক্তির লেখা এবং সম্ভবত এটি ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে কখনও লেখা হয়েছে (এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা, ৩য় খণ্ড, ২৬২ পৃষ্ঠা, নিবন্ধ 'বার্ণাবাস')।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, বিজ্ঞ নিবন্ধকার এ গ্রন্থটির অনির্ভরযোগ্য হওয়ার প.ক্ষ সারগর্ভ কোন প্রমাণ পেশ না করে; বরং প্রথম যাত্রাতেই মন্তব্য ছেড়ে দিয়েছেন যে, 'যা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত'। আর এ কথাটিকে যথেষ্ট সন্তোষজনক প্রমাণ গণ্য করে পরবর্তী আলোচনা অর্থাৎ এর লেখক কে এবং কখন লেখা হয়েছে, তার উত্তর দিতে শুরু করেছেন। এর কারণ এ ছাড়া কিছুই নয় যে, পৌলীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও আকীদা-বিশ্বাস এবং তার বর্ণিত ঘটনাবলী মানুষের মন-

মস্তিষ্কে পাকাপোক্তভাবে ঠাঁই করে নিয়েছে। ফলে যে গ্রন্থে তার বিপরীত কোন কথা বলা হয়েছে, তাকে তারা কোন হাওয়ারীর লেখা বলে কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না।

কিন্তু উপরে আমরা যা আরজ করেছি, তার আলোকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বার্ণাবাসের কোন লেখায় যদি পৌলের আকীদা ও চিন্তাধারার বিপরীত কিছু বর্ণিত হয়ে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই আর এ কারণে তাকে জাল রচনা বলে উড়িয়ে দেওয়ারও কোন যুক্তি নেই। কেননা উপরোল্লিখিত আলোচনা দ্বারা এটাও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, পৌল ও বার্ণাবাসের মধ্যে চিন্তাধারাগত ভিন্নতা ছিল, যে কারণে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন।

এই মৌলিক বিষয়টা একটু খোলাসা এ কারণেই করতে হল যে, বার্ণাবাসের ইনজীলের মৌলিকত্ব যাচাই করতে গিয়ে যে ভ্রান্ত ও অমূলক ধারণা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মাথায় ঢুকে পড়ে সেটা যাতে দূর হয়ে যায়।

এবার আসুন অনুসন্ধান করে দেখি বাস্তবিকই বার্ণাবাস কোন ইনজীল লিখেছিলেন কি? আমরা এ বিষয়ে যতদূর পড়াশোনা করেছি, তাতে বার্ণাবাস যে একটি ইনজীল লিখেছিলেন, সে বিষয়ে কোন দ্বিমত পাইনি। খ্রিস্টানদের প্রাচীন রচনাবলীতে বার্ণাবাসের ইনজীল সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায়। ইজহারুল হক গ্রন্থে (১ম খণ্ড, ২৩৪) এক্‌সিহোমোর (Ecce Homo) বরাতে যে অবলুপ্ত গ্রন্থসমূহের তালিকা দেওয়া হয়েছে, তাতে বার্ণাবাসের ইনজীলের নামও রয়েছে। আমেরিকানা (৩য় খণ্ড, ২৬২ পৃষ্ঠা)-এর 'বার্ণাবাস' নিবন্ধেও এটা স্বীকার করা হয়েছে।

বার্ণাবাসের ইনজীল যেহেতু অন্যান্য ইনজীলের মত চালু হতে পারেনি, তাই নিরপেক্ষ কোন গ্রন্থ দ্বারা এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে সন্ধান নেওয়া সম্ভব নয়। তথাপি চার্চের ইতিহাসে এমন একটি ঘটনা পাওয়া যায়, যা দ্বারা এ ইনজীলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমরা কিছুটা আলো পেয়ে যাই এবং এতটুকু জানতে পারি যে, বার্ণাবাসের ইনজীলে খ্রিস্টানদের আকীদা-বিশ্বাসবিরোধী কিছু বক্তব্য ছিল। ঘটনাটি হল, খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে (অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের বহু আগে) প্রথম গেলাসিয়াস (Gelasius) নামে একজন পোপ গত হয়েছেন। তিনি তার আমলে একটি ডিক্রি জারি করেন, যা গেলাসিয়ান ডিক্রি (Gelasiun Eecree of 496) নামে খ্যাত। সে ডিক্রিতে তিনি কয়েকটি গ্রন্থ পাঠের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। তার মধ্যে এই বাইবেল অন্যতম (দেখুন এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা ৩য় খণ্ড, ২৬২ পৃষ্ঠা নিবন্ধ বার্ণাবাস; চেম্বার্স এনসাইক্লোপিডিয়া ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা নিবন্ধ Gelasius এবং ড. খলীল সাআদাত মিসরী কৃত বার্ণাবাসের ইনজীলের ভূমিকা)।

যদিও কোন কোন খ্রিস্টান পণ্ডিত গেলাসিয়াসের যে ডিক্রিকেও জাল ও অনির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন (দেখুন এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, নিবন্ধ 'গেলাসিয়াস') কিন্তু তার সপক্ষে কোন প্রমাণ আমরা জানতে পারিনি। এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকার নিবন্ধকারগণ তার মৌলিকত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। আর নিয়মানুসারে সেটাই বেশি গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন হচ্ছে গেলাসিয়াস বার্ণাবাসের ইনজীল পাঠের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি কেন করলেন? বিশেষভাবে এ কথাটি মাথায় রাখতে হবে যে, সাধারণ খ্রিস্টান চিন্তাধারাবিরোধী দলসমূহকে দমন করার ব্যাপারে পোপ গেলাসিয়াসের বিশেষ খ্যাতি আছে। নিশ্চয়ই তিনি যখন দেখলেন, এ ইনজীলে সাধারণ খ্রিস্টীয় আকীদা-বিশ্বাসবিরোধী অনেক কথা আছে এবং তা দ্বারা তার অসমর্থিত কোন কোন দল উপকৃত হয়, তখনই তিনি আদেশ জারি করলেন, এ বই কেউ পাঠ করতে পারবে না। এ ঘটনা দ্বারা এই ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে, বার্ণাবাসের ইনজীল সাধারণ খ্রিস্টীয় চিন্তাধারার বিপরীত ছিল।

এ পর্যন্ত আমরা যা-কিছু বললাম, তা ছিল গ্রন্থখানির বহির্গত, কিন্তু এর সাথে সংশ্লিষ্ট এমন সব আলামত-ইঙ্গিত, যা দ্বারা এর মৌলিকত্বের প্রতি কিছুটা রশ্মিপাত হয়। অতঃপর আমরা এ গ্রন্থের অন্তর্গত ইঙ্গিত-আলামত নিয়ে আলোচনা করব এবং নিজ মৌলিকত্ব সম্পর্কে এটি নিজে কি সাক্ষ্য-সাবুদ বহন করে তা খতিয়ে দেখব।

এ কিতাবের মৌলিকত্ব প্রমাণিত না হলে তো এটাই বলতে হবে যে, এটি কোন মুসলিম ব্যক্তির রচিত। অধিকাংশ খ্রিস্টান বিদগ্ধজন সেটাই দাবি করেন। সে ক্ষেত্রে এটি রচনার উদ্দেশ্য হবে বার্ণাবাসের নাম ব্যবহার করে মানুষকে খ্রিস্টধর্মের প্রতি আস্থাহীন করে তোলা। কিন্তু এ গ্রন্থে এমন কিছু বিষয় পাওয়া যায়, যা স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয় যে, এটি কোন মুসলিমের লেখা নয়।

এক. প্রথম কথা তো এই যে, এ গ্রন্থে এক ডজনেরও বেশি জায়গায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং কোনও কোনও স্থানে তো লম্বা-লম্বা পরিচ্ছেদ তাঁরই গুণ-গরিমার আলোচনায় পূর্ণ। দেখুন ৩৬ : ৬; ৩৯ : ১৪; ৪২ : ৯; ৪৪ : ১৯; ৫২ : ১১; ৫৪ : ৯; পরিচ্ছেদ ৭২; ৯৬ : ৮; ৫৭ : ১৭; ১৬৩ : ৮; ১৩৬ : ১৫; ১৭৬ : ৭; ২২০ : ১৭। এবার চিন্তা করুন, যে ব্যক্তি এত বড় প্রতিভাবান ও এত বেশি পাঠ্যাভাসের অধিকারী হন যে, বার্ণাবাসের ইনজীল-হেন গ্রন্থ লিখে তাকে কোন হাওয়ারীর নামে ছেড়ে দেওয়ার সাহস রাখেন, কি আশ্চর্য তিনি এ রকম একটা মোটা কথাও বুঝতে

পারেন না যে, শেষ নবীর নাম এত বেশি বেশি উল্লেখ করলে মানুষ সন্দেহে পড়ে যাবে? কোন মামুলি বোধসম্পন্ন লোকও তো এ রকম ভুল করতে পারে না। জালিয়াত-প্রতারকদের স্বভাবই হল বেফাঁস খোলামেলা কথা এড়িয়ে যাওয়া, যাতে কারও মনে সন্দেহ সৃষ্টি হতে না পারে। এরূপ ক্ষেত্রে লেখকের জন্য সহজ পথ ছিল মহানবী (সা.)-এর পবিত্র নাম দু'-এক জায়গায় উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়ে যাওয়া। বরং আরও উত্তম ছিল ইউহোন্নার ইনজীলে পারাক্লীত নামে যে ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তা হুবহু উল্লেখ করে পারাক্লীতের স্থলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম লিখে দেওয়া। বার্ণাবাসের ইনজীল পড়ে দেখুন, বুঝতে পারবেন এর লেখক যে বাইবেলের গভীর জ্ঞান রাখতেন কেবল তাই নয়, তিনি অত্যন্ত ধীমান ও হুঁশিয়ারও ছিলেন। এটা কি সম্ভব যে, নিজ ধর্মকে সঠিক প্রমাণের জোশে এ রকম চোখের সামনে পড়ে থাকা বিষয়েও তিনি অন্ধ হয়ে যাবেন এবং এমন একটা স্থূল বিষয়ও তার নজর এড়িয়ে যাবে?

দুই. এ ইনজীলের রচয়িতা কোন মুসলিম হলে বারবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামোল্লেখ দ্বারা নিশ্চয় তাঁর উদ্দেশ্য হবে কুরআন মাজীদের সেই আয়াতকে সঠিক প্রমাণ করা, যাতে জানানো হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) সরাসরি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম নিয়ে তার শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এ অবস্থায় তাঁর উচিত ছিল এ গ্রন্থের প্রতিটি স্থানে কিংবা অন্ততপক্ষে একটি স্থানে তাঁর নাম 'আহমদ' উল্লেখ করা। কেননা কুরআন মাজীদের যে আয়াতের সমর্থন তিনি যোগাতে চাচ্ছেন, তাতে এ নামেরই উল্লেখ রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ

'এবং আমি সেই রাসূলের সুসংবাদদাতা (রূপে প্রেরিত হয়েছি), যার নাম হবে আহমাদ' (সাফফ : ৬)। অথচ আমরা দেখছি এ গ্রন্থের প্রতিটি স্থানেই তাঁর মুহাম্মাদ' নামটি লেখা হয়েছে। একটি জায়গাতেও 'আহমাদ' লেখা হয়নি।

তিন. এ গ্রন্থে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে, ওল্ড টেষ্ট্যামেন্টের কিতাবসমূহে যেই মাসীহ বা মাসিয়্যার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, তার লক্ষ্যবস্তু আমি নই; বরং মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (৯৭ : ১৪)।

এ গ্রন্থের লেখক কোন মুসলিম ব্যক্তি হলে তার একথা লেখার কোন প্রয়োজন হত না। কেননা এটা ইসলামী আকীদা নয়। তাছাড়া এটা লেখার ফলে অহেতুক সংশয় সৃষ্টিরও অবকাশ থাকে।

কেউ কেউ বলেন, এর লেখকের উদ্দেশ্য মূলত কাউকে ধোঁকায় ফেলা ছিল না; এটি আসলে কল্পনাশ্রয়ী (EMAGINATORY) রচনা। লেখক এর দ্বারা মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে হযরত মাসীহ (আ.)-এর জীবন চরিত কেমন হওয়া উচিত সেটাই দেখাতে চেয়েছেন।

এ ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু বার্ণাবাসের ইনজীল পড়ার পর এ ধারণাও অপসৃত হয়ে যায়। কেননা প্রথমত এরূপ ক্ষেত্রে লেখক নিজ নাম প্রকাশ করতে পারতেন এবং তা করাই সমীচীন ছিল। তা না করে তিনি এটিকে বার্ণাবাসের লেখা বলে প্রচার করলেন কেন? তাছাড়া এ গ্রন্থের বহু কথা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী এবং তার গ্রহণযোগ্য কোন ব্যাখ্যাও বুঝে আসে না। যেমন−

১. ২০৯ : ৪; ২১৫ : ১৩ ও ২১৯ : ৭-এর আয়াতসমূহে এমন কতিপয় ফেরেশতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী সাহিত্য যার সাথে মোটেই পরিচিত নয়, যেমন মীখাঈল, রিফাঈল ও আওরীল।

২. ২১৯ ও ২২০ নং পরিচ্ছেদে আছে, হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামকে আসমানে তুলে নেওয়া হলে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে দরখাস্ত করলেন, আমাকে একবার ফের দুনিয়ায় যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক, যাতে আমি আমার মা' ও শিষ্যদের সঙ্গে সাক্ষাত করে আসতে পারি। সুতরাং আল্লাহ তাআলা নিজ ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন এবং তিনি নিজ মা' ও শিষ্যদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে আবার আসমানে চলে গেলেন।

এ ঘটনাও ইসলামী বিশ্বাসের পরিপন্থী। আজ পর্যন্ত আমাদের নজরে এমন কোন মুসলিম পড়েনি, যে হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের আসমানে চলে যাওয়ার পর পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসার বিশ্বাস পোষণ করে।

৩. ৩১ : ৫নং আয়াতে হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যে−

اعطوا اذاً ما لقيصر لقيصر وما لِلّٰه لِلّٰه

'তাহলে সীজারের যা প্রাপ্য−সীজারকে আর আল্লাহর যা প্রাপ্য আল্লাহকে দিয়ে দিন'।

ধর্ম ও রাজনীতির এই ভাগ-বাটোয়ারা সম্পূর্ণরূপেই অনৈসলামিক নীতি। ইসলামের উলামায়ে কেরাম শুরু থেকেই এ দৃষ্টিভঙ্গি রদ করে আসছেন।

৪. ১০৫ : ৩ নং আয়াতে আসমানের সংখ্যা বলা হয়েছে নয়টি; যদিও কোন-কোন জ্যোতির্বিদ এ ধারণা পোষণ করেছেন, কিন্তু মুসলিমদের মধ্যে 'সাত'

সংখ্যাই প্রসিদ্ধ। কুরআন মাজীদেও প্রত্যেক জায়গায় সাত আসমানের কথাই বলা হয়েছে। এ গ্রন্থে এ জাতীয় আরও বহু ধারণা পাওয়া যায়, যা সাধারণ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত। অন্ততপক্ষে মুসলিমদের কাছে অপরিচিত তো বটেই। এহেন অবস্থায় এ গ্রন্থকে কোন মুসলিম ব্যক্তির কল্পনাশ্রয়ী কোশেশ বলে চালানো সহজ নয়।

এই হল সেইসব আলামত-ইঙ্গিত, যার বর্তমানে এ গ্রন্থকে কোন মুসলিমের রচনা সাব্যস্ত করা মুশকিল এবং করলে তা হবে যুক্তি-বুদ্ধির পরিপন্থী। এবার আমরা এমন কিছু আলামতও পেশ করতে চাই, যা দ্বারা এটির জাল হওয়ার ধারণা জন্মায় এবং অধিকাংশ খ্রিস্টান পণ্ডিত ও পাশ্চাত্যবাসী সেগুলোকে দলিল হিসেবে পেশ করে থাকেন।

এক. আমরা পূর্বে আরজ করেছি, খ্রিস্টসমাজের কাছে এটির জাল হওয়ার সর্বাপেক্ষা বড় আলামত এটাই যে, এতে বর্ণিত আকীদা-বিশ্বাস প্রসিদ্ধ চার ইনজীলে বর্ণিত দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু আলোচনার শুরুতে আমরা বিস্তারিত আলোচনার সাথে প্রমাণ করে এসেছি যে, বার্ণাবাসের ইনজীলে সাধারণ খ্রিস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত কোন কথা থাকলে তাতে অবাক মানার কিছু নেই এবং কেবল এতটুকু বিষয় এ গ্রন্থের জাল হওয়ার পরিচায়ক হতে পারে না।

দুই. দ্বিতীয় আলামত হল, এ গ্রন্থের বহু জায়গায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। অথচ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম সাধারণত কোন ভাবী নবী সম্পর্কে সুসংবাদ দান করলে সেক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে নাম না বলে তাঁর আকার-আকৃতি ও গুণাবলী উল্লেখ করে থাকেন এবং তাও ইশারা-ইঙ্গিত ও উপমা-উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে। বাইবেলের কোথাও ভাবী কোন নবী বা ব্যক্তির নাম বর্ণিত হয়নি।

কিন্তু তাদের একথা ঠিক নয় যে, বাইবেলে কোন ভাবী ব্যক্তির নাম বর্ণিত হয়নি। অবশ্যই হয়েছে এবং তার সংখ্যাও কিছু কম নয়। যেমন ইশাইয়া পুস্তকে আছে, হযরত ইশাইয়া আলাইহিস সালাম তার উম্মতদের লক্ষ্য করে বললেন,

দীন-দুনিয়ার মালিক নিজেই তোমাদের কাছে একটা চিহ্ন দেখাবেন। তাহল, একজন অবিবাহিতা সতী মেয়ে গর্ভবতী হবে আর তাঁর একটি ছেলে হবে; তার নাম হবে ইম্মানুয়েল (ইশাইয়া ৭ : ১৪)।

খ্রিস্টানগণ বলে থাকেন, এ ভবিষ্যদ্বাণীটি হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে। এ কারণেই ইনজীলসমূহে এ বাণীটি উল্লেখ করে হযরত মাসীহ

আলাইহিস সালামের সত্যতার পক্ষে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে (মথি ১ : ২৩ এবং লূক ১ : ৩১, ৩৪)। যদিও বাইবেলের ভাষ্যকারগণ এ বিষয়ে বড় পেরেশান যে, হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের এক নাম ইম্মানুয়েলও ছিল কি না? কিন্তু এর দ্বারা অন্ততপক্ষে এতটুকু বিষয় তো প্রমাণিত হয়ে গেল যে, বাইবেলে কোন মহান ভাবী ব্যক্তির নাম নিয়েও সুসংবাদ জানানো হয়েছে। এমনিভাবে জবুর গ্রন্থে আছে,

'কেন অস্থির হয়ে চেঁচামেচি করছে সমস্ত জাতির লোক? কেন লোকেরা মিছামিছি ষড়যন্ত্র করছে? মাবুদ ও তার মাসীহর বিরুদ্ধে দুনিয়ার বাদশাহরা এক সঙ্গে দাঁড়াচ্ছে আর শাসনকর্তারা করছে গোপন বৈঠক' (যবুর ২ : ১–২)।

খ্রিস্টানদের মতে এ ভবিষ্যদ্বাণীটিতে মাসীহ বলে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে বোঝানো উদ্দেশ্য। (দেখুন অক্সফোর্ড বাইবেল কানকোডান্স [concordance], লন্ডন ২৩৬ পৃষ্ঠা) এ ভবিষ্যদ্বাণীতেও সুস্পষ্ট উপাধি বর্ণিত হয়েছে। বরং দানিয়াল পুস্তকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উপাধির সাথে সাথে তার নবুওয়াতকালের পরিমাণও উল্লেখ করা হয়েছে–

'বাষট্টি গুণ সাত বছর পরে মাসীহকে হত্যা করা হবে এবং তার কিছুই থাকবে না' (দানিয়াল ৯ : ২৬)।

তাছাড়া ইশাইয়া ৮ : ১ ও ইয়ারমিয়া ২৩ : ৫ শ্লোকেও ভাবী ব্যক্তিবর্গের নাম বর্ণিত হয়েছে। এসব উদ্ধৃতি দ্বারা এতটুকু বিষয় তো পুরোপুরিই প্রমাণিত হয় যে, কোন ভবিষ্য ব্যক্তি যদি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হন, তবে কখনও কখনও ভবিষ্যদ্বাণীতে তার নামও জানিয়ে দেওয়া যায়। উপরিউক্ত উদাহরণগুলি তো ছিল বাইবেলের। ইসলামী হাদীস ভাণ্ডারে হযরত মাহদী (রাযি.)-এর নামোল্লেখ পূর্বক সুসংবাদ জানানো হয়েছে যে, আখেরী যামানায় তাঁর আবির্ভাব ঘটবে।

এবার আপনি চিন্তা করুন, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যদি শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম উল্লেখ করে থাকেন, তাতে আশ্চর্যের কী আছে? বিশেষত তিনি যখন বিভিন্ন দিক থেকে অন্যান্য আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নবী, নবুওয়াত ও রিসালাতের সিলসিলা যার পর্যন্ত পৌঁছেই শেষ হয়ে যাবে এবং যার নবুওয়াতকে বিশেষ কোন জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সারা বিশ্বের সকলের জন্য ব্যাপক করে দেওয়া হবে? এ রকম নবী সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীকে কেবল আকার-আকৃতি ও গুণাবলী বর্ণনার মধ্যে সীমিত রাখার পরিবর্তে তার নাম-ধামসহ সুসংবাদ দেওয়াই বেশি যুক্তিযুক্ত নয়?

তিন. বার্ণাবাসের ইনজীলের মৌলিকত্ব সম্পর্কে খটকার তৃতীয় কারণ এই যে, এর বর্ণনাশৈলী অন্য ইনজীলসমূহ থেকে আলাদা। কিন্তু আমাদের মত হল, বর্ণনাশৈলীর পার্থক্য সম্পর্কে এতটা দ্রুত ফায়সালা দিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। অদ্যাপি বার্ণাবাসের ইনজীলের কোন হিব্রু বা রোমান কপি পাওয়া যায়নি। সে রকম কোন কপি পাওয়া গেলে অন্যান্য ইনজীলের সাথে তুলনা করা যেত। তরজমাসমূহ দ্বারা বর্ণনাশৈলীর তুলনা করা সতর্কতার পরিচায়ক নয়। অধিকন্তু তরজমাসমূহের দ্বারা রচনাশৈলীর যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয় যে, তার ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে।

দ্বিতীয়ত বার্ণাবাসের ইনজীল ও অন্যান্য ইনজীলের মধ্যে শৈলীগত কোন প্রভেদ যদি বাস্তবিকই থাকে, তবুও তা দ্বারা জালিয়াতির পক্ষে প্রমাণ খাড়া করা যায় না। কেননা প্রত্যেক লেখকেরই লেখনশৈলী ভিন্ন হয়ে থাকে। এটা কি বাস্তব নয় যে, ইউহোন্নার ইনজীল যে শৈলীতে রচিত তা অন্য তিন ইনজীল থেকে লক্ষ্যণীয়ভাবে আলাদা? সমস্ত খ্রিস্টান পণ্ডিতই এটা স্বীকার করেন। পাদ্রী জি. টি ম্যানলী বাইবেল সম্পর্কে তার বিখ্যাত গ্রন্থে বলেন,

তথাপি এ ইনজীল (ইউহোন্নার ইনজীল) প্রশ্নবিদ্ধ হয়েই আছে। কেননা সর্বস্বীকৃত ইনজীলসমূহ থেকে এটি বিভিন্ন দিক থেকেই আলাদা। (কিন্তু আমাদের কথা হল) যাবতীয় পার্থক্য সত্ত্বেও চতুর্থ ইনজীলকে যদি আমরা তার আপন সৌন্দর্যাবলীর আলোকে লক্ষ্য করি, তবে একথা কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না যে, এর রচয়িতা হয় নিজেই একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন অথবা কোন প্রত্যক্ষ্যদর্শীর বর্ণনা ও বিবরণই নিজ কলমে তুলে ধরেছেন (হামারী কুতুবে মুকাদ্দাসা, লাহোর, পৃষ্ঠা ৩৪৮)।

তাছাড়া নিউ টেষ্ট্যামেন্টের ভাষ্যকার আর. এ. নাক্স নিজ ভাষ্যগ্রন্থের শুরুতে 'ইউহোন্নার ইনজীল'-এর বর্ণনাশৈলী সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। (দ্র. নিউ টেষ্ট্যামেন্ট কমেন্ট্রি লন্ডন ১৯৫৩ খ্রি., ১ম খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠা)। সুতরাং বর্ণনাশৈলীর পার্থক্য সত্ত্বেও ইউহোন্নার ইনজীলকে যদি নির্ভরযোগ্য বলা যায়, তবে বার্ণাবাসের ইনজীলকে কেন বলা যাবে না? এ ইনজীলকে কেন শৈলীগত পার্থক্যের অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করা হবে?

চার. বার্ণাবাসের ইনজীলের মৌলিকত্ব সম্পর্কে কারও কারও সন্দেহের একটা কারণ এই যে, তাজাল্লীর ঘটনায় হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম যেই পাহাড়ে চড়েছিলেন, এ গ্রন্থের ৪২ : ১৯ নং আয়াতে তার নাম বলা হয়েছে 'তাবূর পর্বত',

অথচ সে পাহাড়টির নাম যে 'তাবূর' তা ইনজীল চতুষ্ঠয়ের অনেক পরে নিরূপিত হয়েছে।

বলাবাহুল্য, এ ব্যাপারটা 'বার্ণাবাসের ইনজীল'-এর মৌলিকত্বকে আদৌ প্রশ্নবিদ্ধ করে না। কেননা এটা তো হতেই পারে যে, চার ইনজীলের লেখকগণ জানা না থাকার কারণে কিংবা অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় পাহাড়টির নাম উল্লেখ করেননি। কিন্তু বার্ণাবাস উল্লেখ করে দিয়েছেন। এ জাতীয় প্রভেদ তো খোদ চার ইনজীলের মধ্যে এন্তার রয়েছে। তাহলে তো প্রশ্ন সেখানেও হতে পারে।

পাঁচ. 'বার্ণাবাসের ইনজীল'-এর মৌলিকত্ব সম্পর্কে একটি ওজস্বী প্রশ্ন তুলেছেন ড. খলীল সাআদাত। তিনি এর আরবী তরজমার মুখবন্ধে বলেন, এ গ্রন্থের ৮২ : ১৮ নং আয়াতে একটি বাক্য নিম্নরূপ–

حتى انّ سنّة اليوبيل التى تجيئ الأن كل مأة سنة سيجعلها مسيا كلّ سنة فى كُلّ مكان

'এমনকি জুবিলী বছর, যা কিনা এখন প্রতি শত বছরে আসে, 'মাসিয়া' তাকে প্রতিটি স্থানের জন্য বাৎসরিকে পরিণত করবেন।'

এতে যে জুবিলীর কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা এক ইহুদী উৎসবের কথা বোঝানো হয়েছে। সে সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'এখন তা প্রতি শত বছরে আসে', অথচ এ উৎসব হযরত মুসা (আ.)-এর বহুকাল পর পর্যন্তও প্রতি পঞ্চাশ বছরের সূচনায় উদযাপিত হত। 'লেবীয়' পুস্তক এর ২৫ : ১১' আয়াতে এর জন্য পঞ্চাশ বছরের মেয়াদই বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর চার্চের ইতিহাসে কেবল ১৩৫০ খ্রি.-ই এমন একটি বছর, যখন পোপ অষ্টম বোনিফাসিস (Bonifatius) এ জুবিলীর মেয়াদ বৃদ্ধি করে প্রতি শতাব্দীর শুরুতে উদযাপনের আদেশ জারি করেন। কিন্তু পরে আর এ আদেশ পালিত হয়নি। কেননা ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম যে জুবিলী উদযাপিত হয়, তাতে চার্চ-প্রচুর অর্থ-সম্পদ লাভ করেছিল। এ কারণে পোপ ষষ্ঠ ক্লিমেন্স ১৩৫০- খ্রিস্টাব্দে হুকুম জারি করেন যে, এ উৎসব প্রতি পঞ্চাশ বছরে উদযাপন করতে হবে। তারপর পোপ ষষ্ঠ এরবানুস ১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দে এ দূরত্বকে আরও হ্রাস করে প্রতি তেত্রিশ বছরে এ উৎসব পালনের হুকুম জারি করেন। তারপর পোপ দ্বিতীয় পৌল আরও কমিয়ে প্রতি পঁচিশ বছরে পালনের হুকুম দেন। এ বিবরণ দ্বারা জানা গেল, জুবিলীর পূর্ণ ইতিহাসে কেবল ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালটাই এমন গত হয়েছিল, যখন প্রতি শত বছরে

একবারই এ উৎসব উদযাপনের হুকুম দেওয়া হয়েছিল। এ হিসেবে বার্ণাবাসের ইনজীল রচয়িতা এ সময়ের লোক হবেন বলে মনে করা খুবই যৌক্তিক।

অতঃপর ড. খলীল সাআদাত নিজেই এর জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, এ ইনজীল পাঠ করলে ভালোভাবেই অনুমান করা যায়, এর রচয়িতা ওল্ড টেষ্ট্যামেন্টের আগাগোড়া সবগুলো পৃষ্ঠা মন্থন করে ফেলেছিলেন। তিনি এ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এ অবস্থায় এটা কি করে সম্ভব যে, একজন সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকেও যা সম্ভব নয়, সে রকমের একটা ভুল তার মত লোক করে বসবেন? সুতরাং অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, এস্থলে মূল কপিতে 'একশ' নয়; বরং 'পঞ্চাশ' অঙ্কই ছিল। কিন্তু কোন অনুলেখক ভুলক্রমে কিছু হরফ হ্রাস করে শব্দটিকে 'শত' বানিয়ে ফেলেছে। আর এটা এ কারণে ঘটতে পেরেছে যে, ইটালিয়ান ভাষায় 'পঞ্চাশ' ও 'শত'-এর লিখনরূপ খুবই কাছাকাছি। ফলে এ জাতীয় ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া আমাদের দৃষ্টিতে এটাও সম্ভব যে, চতুর্দশ শতাব্দীর কোন পাঠক এ বাক্যটি টীকা হিসেবে লিখে দিয়েছিল, যা ভুলক্রমে মূলপাঠের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। বাইবেলে এ জাতীয় সংযোজন বহু ঘটেছে। মুসলিম ও খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায়ের গবেষকই এটা স্বীকার করেছেন। উদাহরণত পয়দায়েশ পুস্তকের ১৩ : ৮; ৩৫ : ২৭ ও ৩৭ : ১৪ নং স্তবকসমূহে একটি বসতির নাম লেখা হয়েছে হেবরোন। অথচ হযরত মুসা (আ.)-এর আমলে বস্তিটির নাম হেবরোন নয়; বরং 'কিরিয়ৎ অর্ব' ছিল। বনী ইসরাঈল যখন হযরত ইউশা (আ.)-এর আমলে ফিলিস্তিন জয় করে, তখনই এর নাম রাখা হয় হেবরোন। সুতরাং 'ইউশা' পুস্তকে বলা হয়েছে,

অনাকীয়দের মধ্যে অর্ব নামে একজন ক্ষমতাশালী লোকের নাম অনুসারে হেবরোনকে আগে 'কিরিয়ত অর্ব' বলা হত' (ইউশা ১৪ : ১৫)।'

এটা তো একটা মাত্র উদাহরণ। হযরত মাওলানা রহমাতুল্লাহ কীরানবী (রহ.) বাইবেল থেকে এ রকম বহু উদাহরণ পেশ করেছেন (দ্র. ইজহারুল হক, ১ম খণ্ড, ২য় অধ্যায়, ২য় পরিচ্ছেদ)।

এসব উদাহরণের ব্যাপারে খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ বলেন, পরবর্তীকালে কেউ এসব শব্দ টীকা হিসেবে লিখেছিল, যা ভুলক্রমে মূলপাঠের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। বার্ণাবাসের ইনজীলের আলোচ্য স্থানেও এই একই কথা বলা যায়।

ছয়. বার্ণাবাসের ইনজীল সম্পর্কে ষষ্ঠ প্রশ্ন তোলা হয়েছে এই যে, এর বহু চিন্তাধারা চতুর্দশ শতকের প্রসিদ্ধ কবি দান্তের সাথে মিলে যায়। বোঝা যায় এর লেখক দান্তের সমকালীন ছিলেন।

কিন্তু এ প্রশ্নের দুর্বলতা সুস্পষ্ট, যা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। দু'জন লোকের কথাবার্তা ও চিন্তাধারায় কোন রকম মিল পাওয়া গেলে তা দ্বারা এটা অপরিহার্য হয়ে যায় না যে, তাদের একজন অন্যজন থেকে তা গ্রহণ করেছেন, অন্যথায় আল্লামা রশীদ রেযা মিসরীর কথা অনুযায়ী স্বীকার করে নিতে হবে তাওরাতের সমস্ত বিধান হামূরাবীর বিধান থেকে ধার করা। যদি এটা মানতে কষ্ট হয় যে, প্রত্যেকের চিন্তাধারা একান্তই আপনার, যদিও ঘটনাক্রমে উভয়ের মধ্যে মিল রয়েছে, তবে এটা কেন সম্ভব হতে পারে না যে, দান্তেই তার চিন্তাধারা বার্ণাবাসের বাইবেল থেকে ধার করেছেন?

সাত. ড. খলীল সাআদাত আরেকটি প্রশ্ন তুলেছেন এই যে, এর কোন কোন আলোচনা দার্শনিকসুলভ। চার ইনজীলের ধরণ এ রকম নয়।

কিন্তু আমরা এর উত্তর দিয়ে ফেলেছি। অর্থাৎ ধরণ-ধারণ ও শৈলীগত পার্থক্যকে জালিয়াতির দলিল বানানো যায় না। ইউহোন্নার ইনজীলকেই দেখুন না, তার কাব্যিক ঢং ও উপমা-উৎপ্রেক্ষাপূর্ণ বর্ণনাভঙ্গি বাকি তিন ইনজীল থেকে কতইনা আলাদা। তার অনেক কথা তো এমন, অদ্যাপি যার মর্ম উদঘাটন করা যায়নি। অথচ তা সত্ত্বেও সমস্ত খ্রিস্টান ইউহোন্নার ইনজীলকে নির্ভরযোগ্যই মনে করে।

আট. আমাদের দৃষ্টিতে বার্ণাবাসের ইনজীল সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা শক্ত আপত্তি এই হতে পারে যে, নির্ভরযোগ্য কোন সূত্রে এ গ্রন্থ আমাদের কাছে পৌঁছেনি। যে ব্যক্তি এ গ্রন্থকে ব্যাপক প্রচার দিয়েছেন, তার সম্পর্কে আমাদের জানা নেই তিনি কী রকমের লোক ছিলেন এবং তিনি বাস্তবিকপক্ষে এর কপিটি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন? আর দীর্ঘকাল যাবৎ এ কপি কোথায় কোথায় ও কার-কার কাছে ছিল?

আমাদের দৃষ্টিতে এসব প্রশ্ন খুবই যৌক্তিক ও সঠিক। যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলোর সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া না যাবে, ততক্ষণ এ গ্রন্থকে নিশ্চিতভাবে নির্ভেজাল সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়।

কিন্তু হুবহু এই একই রকমের প্রশ্ন তো বাইবেলের প্রতিটি পুস্তক সম্পর্কেই রয়েছে, যার সন্তোষজনক উত্তর আজও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সুতরাং যারা বাইবেলকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন, বার্ণাবাসের ইনজীলকে অনির্ভরযোগ্য ঠাওরানোর কোন বৈধতা অন্তত তাদের নেই।

আলোচনার শুরুতে আমরা লিখে এসেছি যে, এই দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য এ গ্রন্থকে নিশ্চিতভাবে খাঁটি ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ করা নয় এবং

আমরা নিশ্চিতভাবে এটিকে কোন ঐশী ও আসমানী কিতাব মনেও করি না। আমাদের দাবি এটাও নয় যে, এতে যা-কিছু লেখা আছে সবই খাঁটি কথা। বরং আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য কেবল এতটুকু প্রমাণ করা যে, এর নির্ভরযোগ্যতা বাইবেলের অন্য কোন পুস্তক অপেক্ষা কোন অংশ কম নয়। বাইবেল যেমন অনির্ভরযোগ্য পন্থায় আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, এ গ্রন্থও আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে একই রকম পন্থায়। বার্ণাবাসের ইনজীলের সূত্র পরিক্রমা যেমন ক্রেমার বা সন্যাসী ফ্রামারিনো পর্যন্ত পৌছে শেষ হয়ে যায়, তেমনি তাওরাতেরও সূত্রক্রম কোনও রকমে জোড়াতালি দিয়ে অতীন্দ্রিয়বাদী হিলকিয়ে পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। রাজা ইউসিয়ার আমল পর্যন্ত এর কোন হদিসই ছিল না। জোশিয়ার আমলে অতীন্দ্রিয়বাদী হিলকিয়ে হঠাৎ করেই দাবি করে বসেন যে, মন্দির পরিষ্কার করতে গিয়ে তিনি তাওরাত পেয়ে গেছেন আর কোন রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই তার এ দাবি মেনে নেওয়া হয় (দেখুন ২– বাদশাহনামা ২২ : ৩–২০)।

এই একই অবস্থা ওল্ডটেষ্ট্যামেন্টের অন্যান্য পুস্তকেরও, তার অধিকাংশ সম্পর্কে তো এতটুকুও জানা যায় না যে, তা কে লিখেছেন এবং কোন আমলে লেখা হয়েছে।

ওল্ট টেষ্ট্যামেন্টের ব্যাপার তো অনেক পুরানো। খোদ ইনজীল চতুষ্ঠয়েরও তো একই অবস্থা। সেগুলোরও না কোন সনদ (প্রাপ্তিসূত্র) আছে আর না হদিস আছে যে, তা সত্যিই হাওয়ারীগণ বা তাদের শিষ্যগণ কর্তৃক লিখিত। বড়-বড় খ্রিস্টান পণ্ডিত এগুলোর মৌলিকত্ব প্রমাণের জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করেছেন, কিন্তু আন্দাজ-অনুমানের বেশি কিছু বলতে সক্ষম হননি। শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বে এগুলোর কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে খ্রিস্টান পণ্ডিতদের অসংখ্য উক্তি রয়েছে। নিচে আমরা তা থেকে কেবল একটাই উদ্ধৃত করছি, যা দ্বারা ইনজীল-চতুষ্ঠয়ের স্বরূপ আপনি বুঝতে পারবেন। মিষ্টার বি. এইচ. স্ট্রিটার চার ইনজীল সম্পর্কে তার প্রসিদ্ধ রচনা Four Gospels গ্রন্থে বলেন,

নিউ টেষ্ট্যামেন্টের রচনাবলীকে এলহামী (ঐশী) গ্রন্থরূপে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এটা কি এমন কোন চার্চীয় ঘোষণা ছিল, যে সম্পর্কে বড়-বড় চার্চের দায়িত্বশীলগণ ঐকমত্য প্রকাশ করেছিলেন? আমাদের এটা জানা নেই। আমরা কেবল এতটুকুই জানি যে, ১৮০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এন্টিয়ক, এফিষ ও রোমে ইনজীল চতুষ্ঠয়ের এ মর্যাদাপ্রাপ্তি ঘটেছিল (ফোর গসপেল্স, নিউইয়র্ক, পৃষ্ঠা ৭)।

অর্থাৎ ১৮০ খ্রিস্টাব্দের আগে এ ইনজীলসমূহের কোন হদিস মেলে না। ষ্ট্রিটার যে বলেছেন, ১৮০ খ্রিস্টাব্দে এন্টিয়ক, এফিষ ও রোমে এ চার ইনজীলকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল, এরও ভিত্তি হচ্ছে উগনাশিস ও ক্লিমেন্‌সের পত্রাবলী, যাতে এসব ইনজীলের বরাত দেওয়া আছে। কিন্তু এসব পত্র সম্পর্কেও তো অনেক প্রশ্ন ও সংশয়-সন্দেহ রয়েছে। মাওলানা কীরানবী (রহ.) ইজহারুল হক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে তা প্রমাণ করেছেন।

এতো গেল চার ইনজীলের সনদ (প্রাপ্তিসূত্র)-এর হাল। বাকি থাকল এর অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য-সাবুদ। তো এ বিষয়ে বাইবেলের অবস্থা বার্ণাবাসের ইনজীল অপেক্ষা ঢের অবর্ণনীয়। কেননা তাতে অগণ্য বৈপরীত্য ও ভুল-ভ্রান্তি আছে।

সুতরাং আমরা যা নিবেদন করতে চাচ্ছি তার সারকথা এটাই যে, মুসলিমদের যে সমীক্ষা-নীতি সে দৃষ্টিতে বার্ণাবাসের ইনজীল এমন কোন গ্রন্থ নয়, যার উপর নিশ্চিতভাবে আস্থা রাখা যাবে। কিন্তু সে বিচারে কেবল বার্ণাবাসের ইনজীল কেন, সম্পূর্ণ বাইবেলই তো বিশ্বাসের অনুপযুক্ত।

আর যদি খ্রিস্টানদের সমীক্ষা-নীতি অনুযায়ী বিচার করা হয়, যা বাইবেলকে কেবল গ্রহণযোগ্যতাই নয় ঐশী ও আসমানী কিতাবেরও মর্যাদা দান করেছে, তবে বার্ণাবাসের ইনজীলও অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য এবং সেই একই মর্যাদার সাব্যস্ত হয়। সুতরাং যারা বাইবেলকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন, বার্ণাবাসের ইনজীলকে প্রত্যাখ্যান করার কোন বৈধতা তাদের থাকতে পারে না। বরং এ গ্রন্থের মৌলিকত্ব নির্দেশে ভিতর-বাইরের যত সাক্ষ্য-সাবুদ ও আলামত-ইঙ্গিত আছে, ততটা বাইবেলের কোন পুস্তকের কদাচ থেকে থাকবে।

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ

সমাপ্ত